
দুই
গল্প



চার্লস্ ডিকেন্স্

(১৮১২—১৮৭০)

দুই নগরের গল্প

(চার্লস্ ডিকেন্স)

অনুবাদ—

শিশির সেন গুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ক্লাসিক প্রেস

মাসিক বসুমতীতে ধারা-প্রকাশিত

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
ক্লাসিক প্রেস,
৩।১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬১
প্রচ্ছদ—
ব্রজরায় চৌধুরী
মুদ্রক—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
"মুদ্রণী"
৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
বাঁধাই—
তৈফুর আলি মিঞা
১০১, বৈঠকখানা রোড

মূল্য চার টাকা।

শ্রীরমেশকুমার ঘোষালকে—

অকৃত্রিম অনুরাগে

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ীর
অন্যান্য রচনা

প্রবন্ধ

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ
জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

অনুবাদ

জোহান বয়ারের—গ্রেট হাঙ্গার
—পাওয়ার অফ্ এ লাই
রোমানিকের —কিসলিয়াকফ্
জেন অস্টেনের —দর্পিতা
সুডারম্যানের —লিলির প্রেম
শিশির সেনগুপ্তের উপন্যাস
—সূর্য তপস্যা
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ীর
'—পিনোসিয়ো

সে এক আশ্চর্য ক্রান্তিকাল। সময়ের আলো-আঁধারিতে ইতিহাসের গোধূলি। আশ্বাসে-নৈরাশ্যে খণ্ডিত। জ্ঞানের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল অবিদ্যার। বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিধার। মনে হোত, ভবিতব্য উপহার সাজিয়ে বসে আছে মানব-যাত্রীদের জন্য। যেন ভবিষ্যতের তিমিরান্ধকার স্থচীভেদ্য। স্বর্গনরকের কিনারা নেই। অথচ সেকালে-একালে পার্থক্য ছিল না কণা মাত্র। কেবল যুগধর্মী সমালোচকেরা সে যুগের আতিশয্যকে বোঝাতে বিশেষণ জুড়তেন সবিস্তারে।

তখন ইংলণ্ডের মসনদে এক চওড়া চোয়াল রাজা আর তাঁর সাদামাটা রাণী। ফ্রান্সের সিংহাসনেও তেমনি এক চওড়া চোয়াল রাজা। কিন্তু তাঁর রাণীটি পরমাস্থন্দরী। দুই দেশেই সমাজের বড়বাবুরা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতেন। কোন ভাবনা নেই। সব ঠিক হ্যায়।

সতেরোশ' পঁচাত্তর সালের কথা। তখন ইংলণ্ডের লোকের বিশ্বাস ছিল দৈববাণীতে। বিশ্বাস ছিল ভূত প্রেত দৈত্য দানোতে। তারা মানত অপদেবতার ভর। ক্রীশ্চান পুরোহিতেরা বুজরুকি আর ভেলকি দেখিয়ে লোককে ইহলোকের না হোক পরলোকের খবর দিত। আর পৃথিবীর খবরের মধ্যে একটি ছিল সামান্য জরুরী। আমেরিকায় বসতি করা ইংরেজ প্রজাদের খবর। অপদেবতা আর ভেলকি ছাপিয়ে সেই নগণ্য সংবাদটুকু শুধু সপারিষদ রাজা নয় আপামর প্রজাদেরও দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

ফরাসীরা ধর্মাধর্ম নিয়ে তত মাথা ঘামাত না। রাজা কাগজের নোট ছাপিয়ে দরাজ হাতে ছড়িয়ে দিতেন। আর প্রজারা মহানন্দে উচ্ছন্নে যাবার রাস্তা দেখত। এখানেও লোকের আত্মার মঙ্গলের ভার ছিল

পুরোহিতদের উপর। একশ' হাত দূরে এক পুরোহিতের মিছিল দেখেও বৃষ্টির মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসেনি—এই অপরাধের শাস্তিতে হাত কেটে জিব টেনে উপড়ে নেওয়া হত। গীর্জার এই শাস্তি লোকে নির্বিবাদে মেনেও নিত। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা ছিল পুরোহিতদের অসম্মানের সাজা। হয়ত বা এই সব অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবাদেই ইতিহাসের কাঠুরে ভাগ্যবিধাতা ফ্রান্স নরওয়ের অরণ্যে বৃহৎ বনস্পতিদেব কঙ্কালে গড়ে তুলেছিল এমন এক ভবিতব্যের কাঠামো যা ভাবলেও গা শিউবে ওঠে। হয়ত বা সুন্দরী প্যারিসের গা-লাগা কোন চাষার জমিতে মুরগী-শূযোরের খামাবের ধারে রোদে-জলে পোড়া একখানা দু'চাকা গাড়ীকে কিষাণ মৃত্যু এক মহা দুর্দিনের জন্য জিইয়ে রাখছিল। কিন্তু সেই কাঠুরে ও চাষার নিঃশব্দ অবিরাম কাজের হদিস রাখেনি কেউ। সে মহা বিপ্লবের পদধ্বনিতে যারা জেগে সচকিত হচ্ছিল তারা কেউ সাড়া দিত না। যে সাড়া দেবে তাকে ত লোকে বলবে পাষণ্ড ধর্মদ্রোহী বেইমান।

আইন শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না ইংলণ্ডে। খাস রাজধানীতে সশস্ত্র গুণ্ডার দল প্রতি রাত্রে রাহাজানি করত। পথে লুঠপাটেব বিরাম ছিল না। বাড়ীতে আসবাবপত্র রেখে বাইবে যাবার উপায় ছিল না। [illegible] সব-কিছু জমা রেখে তবে নিশ্চিন্তে লোকে বিদেশ যেত। দিনে [illegible]রের এক জন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী বন্ধু, রাতের আঁধাবে তিনি এক কুখ্যাত গুণ্ডা। তাঁর এক পরিচিত ব্যবসায়ী তাঁকে গা-আঁধারী আলোয় চিনে ফেলার অপরাধে, গুলী খেযে মরে পড়ে রইল রাস্তায়। সাত জনে এক জেলের প্রহরীকে ঘিরে ফেলায, প্রহরী তিন জনকে গুলী করে মারে। তার পর বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় বাকি চার জনে প্রহরীকে মেরে নিশ্চিন্তে মেল-ব্যাগ লুঠ করে নিয়ে পালায়। জেলের ভিতর কয়েদীদের সঙ্গে প্রহরীদের নিত্য খুনোখুনি। বড়ো বড়ো অভিজাত আসরে লোকের গলা থেকে হীরে মুক্তো টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যায়

ঘাটপাড়দের দল। গীর্জার শান্ত-পবিত্র আবহাওয়ায় লুঠের মালের বখরা নিয়ে বচসা শেষে খুনে নিষ্পত্তি হয়। পুলিশ গুলি করে ডাকাতদের। তারা পালটা জবাব দেয়। এমনি চলে দিনের পর দিন। এই সব নোংরা জঘন্যতা নিয়ে কেউ-ই মাথা ঘামায় না। শুধু এক জনের কাজের বিরাম থাকে না। সে জল্লাদ। লম্বা সারিতে ফাঁসীর দড়ি সাজিয়ে সে নানা শ্রেণীর অপরাধীকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দেয়। মঙ্গলবারে ধরা পড়া সিঁদেল চোরের ফাঁসী হয় শনিবারে। নিউ গেটের মুখে মানুষ পোড়ে। ওয়েস্টমিনিষ্টার হলের বাইরে পোড়ে নানা পুস্তিকা ইস্তাহার। আজ যেখানে এক সাংঘাতিক খুনীর ফাঁসী হল, কাল সেখানে ফাঁসীতে মরল এক সিঁদেল চোর।

এ সব সতেরোশ' পঁচাত্তর সালের শেষাশেষি ঘটনা। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে ইতিহাসের কারিগর অস্ত্রে শাণ দিয়ে কাঠামো তৈরী করে। বিপ্লবীর মৃত্যু করে সর্বনাশের উদ্যোগপর্ব। আর দুই দেশের দুই চওড়া চোয়াল রাজা আর তাদের বোরা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করে যায় বিধিদত্ত ক্ষমতার আত্মপ্রবঞ্চনায়। এমনি করে বৃহৎ-ক্ষুদ্র মিলিয়ে এক বিরাট মানব-পরিবার অমোঘ নিয়তির টানে এগিয়ে চলে ইতিহাসের ক্রান্তিকালে।

২

শেষ নভেম্বরের শুক্রবার রাতে যে লোকটি ডোভার রোড ধরে পদব্রজে পাহাড়ের চড়াই পার হচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এই ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সামনে ডাকগাড়ী ধীরগতিতে পাহাড়ের পথ বেয়ে উপরে উঠছিল। অন্য দু'জন যাত্রীর সঙ্গে তিনিও যে কর্দমাক্ত পার্বত্যপথে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সে হাঁটার আনন্দে নয়। এই পার্বত্য চড়াই পথ, এই

কাদা ভাঙা আর ডাকগাড়ীর গুরুভারে ঘোড়ারা ইতিপূর্বে তিন বার বিদ্রোহী হয়ে গতি বন্ধ করেছিল। একবার ফেরার জন্য রুখেও উঠেছিল। কিন্তু বলগা আর চাবুকে তারা আবার শাসন মানতে শিখেছে। নিকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যেও যে হিসেবী বুদ্ধি আছে এই ঘটনায় তা আর একবার বোঝা গেল যেন।

ভাবী কাদা ঠেলে ডাকগাড়ী এগোচ্ছে শম্বুকগতিতে। ঘোড়ার দল মাথা নামিয়ে লেজ ঝাপটে কাদা ভাঙছে কঠিন পরিশ্রমে। এক একবার যখন হোঁচট লাগছে, বোধ হচ্ছে যেন তাদের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেল। যত বার গাড়োয়ান বাশ টেনে গাড়ী থামাচ্ছে তারা মাথা ঝাঁকিয়ে এমন উচ্চ হ্রেষা তুলছে যে যাত্রীরা চকিত হয়ে উঠছে আশঙ্কায়। ঘোড়ারা যেন প্রতিবাদে আওয়াজ তুলছে—এই দুর্গম পথে আমরা আর ভাবী ডাকগাড়ী বইতে পারব না।

গিরিকন্দরে সঞ্চিত উষ্ণ বাষ্প অরণ্যপথ আবৃত করে উপরে উঠে আসছে। যেন কোন নিঃসঙ্গ প্রেতসত্ত্বা কাউকে আশ্রয় করে বিশ্রাম নেবার আশায় ঘুরে মরছে এলোমেলো। রাতের হিমেল কুয়াশা ছোট ছোট তরঙ্গে আবর্তিত হয়ে চারি দিক ব্যাপ্ত করে লুপ্ত করে এগিয়ে আসছে। যেন কোন অমঙ্গলের সমুদ্রজলে মগ্ন হচ্ছে দিগ্‌ দিগন্তর। সেই কুয়াশায় ডাকগাড়ীর আলো নিষ্প্রভ। আশে-পাশে সন্মুখে পশ্চাতে শুধু রাশি রাশি অন্ধকার। পরিশ্রান্ত অশ্বদের নাসা থেকে নির্গত প্রশ্বাস উষ্ণ বাষ্পাকারে উপরে উঠছে।

তিন জন যাত্রীরই সর্বাঙ্গ ভাবী পোষাকে ঢাকা। আর শরীরই শুধু নয়, মনও তাদের সম্পূর্ণ আড়াল করা। কেউ কারুর পরিচয় জানে না। এর কারণ, সেকালে পথচারীদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হোত। পথের যে কোন সহযাত্রী আচম্বিতে দস্যু বা দস্যুর সাগরেদরূপে আত্মপ্রকাশ করলে বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। অস্ত্রের পেটিকার

উপর কড়া নজর রেখে ডাকগাড়ীর পাহারাদারও সেদিন এই কথাই ভাবছিল।

ডাকগাড়ীর যা রীতি এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রহরীর সন্দেহ যাত্রীদের। যাত্রীর আতঙ্ক সহযাত্রী ও প্রহরী। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না কেউ। শুধু জানোয়ারগুলোকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত নয় গাড়োয়ান।

'ওঃ হো'—গাড়োয়ানের চীৎকার শোনা যায়—'আর একটা দৌড় বাপধনরা, তাহলেই পাহাড়ের টঙে উঠে পড়ব আমরা। কী যন্ত্রণায় যে পৌঁছে দিচ্ছ সে আমিই জানি।'

'কে হে?' পাহারাদারের গলা।

'ক'টার ঘড়িতে ঘা দিল?'

'এগারোটা বেজে গেছে।'

'হা কপাল। এখনও চড়াই শেষ করতে পারলাম না। এঃ এঃ। চ বাবারা চ চ।'

ডাকগাড়ী আবার সেই পার্বত্য পথ ভেঙে কাদা ঠেলে এগোতে লাগল। যাত্রীরা এতক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিল, এবার গাড়ীর পাশে পাশে চলতে লাগল।

শেষ দৌড়ে ডাকগাড়ী গিয়ে পৌঁছল মাথায়। ঘোড়ারা আবার বিশ্রাম পেলে। পাহারাদার নেমে উৎরাইএর জন্য গাড়ীর চাকাগুলি সাফ করে নিলে। যাত্রীরা বসবেন বলে গাড়ীর দরজা খুলে দিলে।

'হুঁসিয়ার হো' এমন সময় গাড়োয়ান সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

'কী হোল?'

'এই পথে ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে।'

'ঘোড়ার খুরের আওয়াজই বটে।' উঠে দাঁড়িয়ে পাহারাদার যাত্রীদের সতর্ক করে দিল। তার পর বন্দুক বাগিয়ে নিয়ে দাঁড়াল।

আমাদের পরিচিত লোকটি সেই মাত্র পাদানীতে পা দিয়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকছিলেন। বাকী দু'জন তাঁর পিছনে। সেই অবস্থায় তিন জনেই স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রহরী গাড়োয়ান যাত্রী সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল সেই অশ্বখুরধ্বনি।

সেই পার্বত্য পথে এতক্ষণ অবধি কেবল ডাকগাড়ীর ঘরঘড়ানি নৈশ বাতাসকে প্রকম্পিত করছিল। এখন সেই কুয়াশা-ঢাকা রাত্রি যেন মৌন উৎকণ্ঠায় রোমাঞ্চিত হল। অজানিত আশঙ্কায় যাত্রীদের হৃদস্পন্দন যেন শব্দময় হয়ে উঠেছে। কণ্টকিত নিস্তব্ধতা, হিমেল রাত্রির রহস্য আর শ্রান্ত যাত্রীদের উদ্বিগ্নতা, সব মিলে যেন শঙ্কা মূর্তিমান হয়ে উঠল।

পাহাড়ের ঊর্ধ্বমুখী পথে বেগে ধাবমান অশ্বখুরধ্বনি মুহূর্তে মুহূর্তে নিকটবর্তী হচ্ছে।

'রো—খো' বুক ফাটিয়ে চীৎকার করল প্রহরী। 'রো-খো। নয় তো আমি গুলী করব।'

চকিতে সেই ধ্বনি থামল। তার পর ঘন কুযাশার অন্তরাল থেকে প্রশ্ন এল—'ডোভারের ডাকগাড়ী নাকি?'

'কে তুমি?'

'এ কি ডোভারের ডাকগাড়ী?'

'কি তোমার দরকার?'

'এক জন যাত্রীর খবর চাইছি?'

'কি নাম?'

'মিঃ জার্ভিস লরি।'

আমাদের পরিচিত যাত্রীটির আচরণে সবাই তাঁর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানলে।

'যেখানে আছ সেখান থেকে নড়বে না।' প্রহরী অদৃশ্য অতিথিকে

উদ্দেশ করে বললে—'একবার ভুল হলে সারা জীবনে তা আর শুধরে নেওয়া চলবে না। মিঃ লরি, আপনি সাড়া দিন।'

ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে লরি বললেন—'কি দরকার? জেরির গলা মনে হচ্ছে।'

'আপনার জন্যে টি এ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে খবর এনেছি। আমি জেরি।'

'লোকটি আমার পরিচিত' বলে লরি পাদানী থেকে পথে নামলেন। বাকী দু'জন রূঢ় হাতে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে গাড়ীর ভিতর গিয়ে বসল। দরজা বন্ধ করে জানলা তুলে তারা নিশ্চিন্ত হল। কাছে আসতেও পারে। সাবধানের বিনাশ নেই।

'পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এসো' ভারী গলায় বললে পাহারাদার—'হাতে যদি কিছু থাকে, হাত মাথার ওপর তুলে এগোবে। নইলে এই সীসের গুলীতে ঝাঁঝরা করে দোবো।'

সেই তরঙ্গময় কুয়াশা-সমুদ্রের অভ্যন্তর হতে অশ্বারোহী এগিয়ে এসে ডাকগাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে লরির হাতে একখানি কাগজ দিলে। বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে আসার চিহ্ন অশ্বটির স্বেদসিক্ত দেহে। ঘোড়ার খুর থেকে অশ্বারোহীর টুপির প্রান্ত অবধি পদোৎক্ষিপ্ত কর্দম।

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে লরি বললেন—'প্রহরী।'

সতর্ক প্রহরীর দুই হাত বন্দুক বারুদে উন্মুখ। সে কাটা জবাব দিলে, 'বলুন স্যার।'

'ভয়ের কিছু নেই। টেলসন ব্যাঙ্কে কাজ করি আমি। লণ্ডনের টেলসন ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই জানো তুমি। এখন প্যারিস যাচ্ছি ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে। এই নাও তোমার জলখাবার। চিঠিটা পড়ে নি?'

'চটপট সেরে নেবেন কিন্তু।'

গাড়ীর বাতির কাছে গিয়ে কাগজটি খুলে ফেললেন তিনি। প্রথমে

মনে মনে পড়ে নিয়ে তারপর সরবে পড়লেন—'শ্রীমতীর জন্য অপেক্ষা করবে ডোভারে।'

'দেখলে ত ভাই, মোটেই দেরী হোল না। আচ্ছা জেরি, তুমি গিয়ে আমার এই জবাব জানাবে—বেঁচে উঠেছে।'

ঘোড়ার পিঠের উপর নড়ে বসল জেরি। 'এ কি অদ্ভুত জবাব!'

'যা বললাম তাই গিয়ে জানাবে। তাহলেই তারা জানবে যে আমি ঠিক ঠিক পেয়েছিলাম চিঠি। সাবধানে যাবে। আচ্ছা, তুমি এসো।'

লরি ডাকগাড়ীর ভিতর গিয়ে বসলেন। বাকী দু'জন আরোহী ইতিমধ্যে তাদের দামী ঘড়ি, আঙটি ও টাকার থলে ভারী বুটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল। এখন তারা ঘুমের ভাণ করে পড়ে রইল।

এতক্ষণে গাড়ী উৎরাই-পথে নামতে লাগল। কুয়াশা আরও ভারী হয়ে জড়িয়ে ধরছে ডাকগাড়ী। প্রহরী এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে তার বন্দুক বারুদ রাখলে। পরীক্ষা করে দেখলে তার জরুরী কাজের মালগুলি যথাস্থানে আছে কি না।

তার পর মৃদু স্বরে গাড়োয়ান ডাকলে, 'টম'?

'হ্যালো—জো!'

'জবাবটা শুনেছিলে?'

'শুনলাম বৈ কি।'

'কিছু বুঝলে?'

'মোটেই না।'

'কি আশ্চর্য। আমিও মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারিনি।'

সেই জগৎজোড়া কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্যে জেরি ততক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। ক্লান্ত ঘোড়াকে হাঁফ ছাড়তে দিয়ে সে নিজের মুখ, জামা-কাপড় যথাসাধ্য পরিষ্কার করে নিলে। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগল তীব্রবেগে গড়িয়ে যাওয়া ডাকগাড়ীর

চক্রধ্বনি। এক সময় সে শব্দও মন্দীভূত হয়ে এল। তখন নির্জন নিস্তব্ধ পার্বত্য-পথে জেরি অশ্ব-সঙ্গী নিয়ে ধীর পায়ে নামতে লাগল।

বেঁচে উঠেছে। আচ্ছা জবাব ত! কিন্তু তুমি জানো না জেরি, এ মামুলী উত্তর নয়। যদি কোন দিন এমনি বেঁচে ওঠা ঘন ঘন ঘটতে থাকে তবে পরিস্থিতি ঘোরালো সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে তোমার বিপদও কমবে না।

৩

দুনিয়ার প্রত্যেকটি লোক আপন খোলসের মধ্যে কি গভীর গোপন, —কি গূঢ় রহস্যময়, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। রাতের অন্ধকারে নগরীর ভীড় করা প্রতিটি গৃহের ছায়াবৃত গোপনীয়তা কত গভীর! শুধু গৃহ কেন, প্রতিটি কক্ষের নিজের রহস্য। প্রতিটি স্পন্দিত হৃদয়ের গভীরে কত অন্তর্মূল গোপন-কামনা-বাসনা। হয়ত বা ভয়, হয়ত বা সে বিভীষিকা মৃত্যুর। এ প্রিয় গ্রন্থের পৃষ্ঠা আর ওলটাতে পাই না। কোন দিন এ গ্রন্থের বস্তু-সম্ভার সব জানব, সে আশাও সুদূরপরাহত মনে হয়। একদা ক্বচিৎ আলোকপাতে যে অতল জলরাশি মধ্যে দেখেছিলাম গুপ্ত কত রত্নরাজি, কত উপাদান সামগ্রী, চিরকালের মত সে সকল আমার নয়নের অগোচর হয়ে গেছে। একটি পৃষ্ঠা পাঠের পর এক বসন্ত দিনে সে গ্রন্থ চিররুদ্ধ হয়ে যাবে এই বুঝি ছিল নিয়তির নির্দেশ। আলোকিত জলাভ্যন্তরে যে রহস্য আমি নিরীক্ষণ করেছিলাম, সহসা কার ইঙ্গিতে তা অগাধ তুষারে রূপান্তরিত হ'ল! নির্বোধের মত আমি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বন্ধু নিয়েছে, প্রতিবেশী নিয়েছে, প্রাণপ্রিয় যে ভালবাসার ধন তাও ছিনিয়ে নিয়েছে মৃত্যু। আমার সত্ত্বার যে নিগূঢ় গোপনীয়তা তার ভার আমি একাই বইব সারা জীবন।

ঢিলে পদক্ষেপে চলেছিল অশ্বারোহী জেরি। যতবার পানশালায় সে থামল, সামলে রইল—কথা কইল না। মাথার টুপিটি সযত্নে চাপিয়ে মুখ রাখলে অন্তরালে।

'না—না' আপন মনে বিড়-বিড় করলে সে—'এ সব তোমার পোষাবে না বাপু। তুমি ভাল মানুষ। কাজ কারবার করে তোমার চলে। তোমার কি এ সব পোষায়। বেঁচে উঠেছে। লোকটা নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায় জবাব দিয়েছে।'

যত বার উত্তরটা মনে পড়ল বুদ্ধি যেন ঘুলিয়ে যেতে লাগল তার। কিছুতেই কোন মানে বার করতে পারলে না সে।

টেলসন ব্যাঙ্কের প্রহরীকে সে জানাবে এই জবাব। প্রহরী জানাবে বড়কর্তাদের। ততক্ষণে রাত নিশুতি হয়ে যাবে। নগরীর পথে নৈশ ছায়াদের রহস্যের চেয়ে অনেক বেশী রহস্যময় এই জবাব।

রাতের প্রহর এগিয়ে চলে। তিন জন যাত্রী নিয়ে পুরানো ডাকগাড়ী সশব্দে দুলে দুলে এগিয়ে চলে। আর আরোহীদের আধ-জাগ্রত চোখের সামনে নানা রহস্যমূর্তি ছায়ার মত সরে সরে যায়।

ডাকগাড়ীতে ব্যাঙ্কের বিভ্রম ঘটল। ঝোলান চামড়ার মধ্যে হাত আটকে আমাদের পরিচিত যাত্রীটি তন্দ্রাতুর চোখে বসেছিলেন। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে শরীর হেলে পড়ছে বার বার। বাতির টিমটিমে আলোয় মনে হচ্ছে যেন সামনের ঐ দুটি মনুষ্য মূর্তি মোটা টাকাভরা থলি। বল্গার ঝনঝনানি যেন টাকার ঝঙ্কার। বিরাট টাকার লেনদেন হচ্ছে জড়িত চোখের সমুখে। একটু পরেই সেই ভূগভস্থ ষ্ট্রং রুমের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল মনশ্চক্ষে। মস্ত এক চাবী আর একটি বাতি নিয়ে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। কতদিনের চেনা সিন্ধুক থলের ভীড় ঠিক তেমনি রয়েছে। একটুকু বদল হয়নি।

কুয়াশা আর তিমিরান্ধকার মনে যেন আফিমের নেশা লাগিয়েছে।

ব্যাঙ্কের স্বপ্নের সঙ্গে আর একটি অনুভূতি সারা রাত্রি ধরে মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। যেন কবর খুঁড়ে কা'কে বার করতে যাচ্ছেন।

রাত্রির পটভূমিকায় সেই অগণিত ছায়ামূর্তির মধ্যে কোন্‌টির সাদৃশ্য আছে সেই মৃত মুখটির সঙ্গে তার হদিস মেলে না। সব ক'টির মুখেই সেই পঁয়তাল্লিশ বছরের ছাপ। পার্থক্য শুধু ব্যঞ্জনায়, আর তার গলিত বীভৎসতায়। কিন্তু মুখ সব একই। সবগুলিই বিবর্ণ শ্বেত। সেই প্রেতায়িত ছায়ামূর্তিকে শত বার করে প্রশ্ন করলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন যাত্রী।

'কত দিন রয়েছ কবরে?'

প্রত্যেকটি ছায়া-মুখ সেই একই উত্তর দিলে—'ষোল বৈ কি আঠারো বছর।'

'কবর থেকে আর উদ্ধারের আশা ছিল কি?'

'সে আশা বহু দিন ত্যাগ করেছি।'

'তুমি আবার বেঁচে উঠবে?'

'তাই ত শুনছি।'

'বাঁচার ইচ্ছা হয়?'

'তা বলতে পারি কই?'

'সে মেয়েটিকে ইচ্ছে করে দেখতে? আসবে তাকে দেখতে?'

এ কথার কত রকম উত্তর পেলেন তিনি। একবার ভাঙা গলায় জবাব পেলেন—'তাড়াতাড়ি কোরো না। তাকে হঠাৎ দেখলে আমি মরে যাবো।' একবার কান্না-ঝরা মুখে শুনলেন মিনতি—'আমায় নিয়ে চল তার কাছে।' কখনো বা সে মুখে অগাধ বিভ্রান্তি। নিষ্পলক দৃষ্টি তুলে বললে—'কে সে? আমি তাকে চিনি না। বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

একটি উত্তর শোনেন আর তাঁর স্বপ্ন-প্রমত্ত মন মৃত্তিকা খুঁড়তে থাকে। কখনো শাবল দিয়ে—কখনো সেই মস্ত চাবিটা দিয়ে, কখনো

বা খালি হাতে। এক সময় সেই বীভৎস গলিত শবটাকে কবর থেকে তোলেন। শবের মুখে-কেশে মাটি। কিন্তু হঠাৎ যেন সেই মৃতদেহ ধ্বসে গুঁড়িয়ে পড়ে মাটিতে। চমকে ওঠেন তিনি। ডাকগাড়ীর জানালা নামিয়ে বাইরের কুয়াশা আর বৃষ্টির স্পর্শ নেন গালে মুখে। বাস্তবের স্পর্শে স্বপ্নের ঘোর কাটে।

আবার কখন সব একাকার হয়ে যায়। রাত্রির বাস্তব ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নের আচ্ছন্নতা মিলে-মিশে যায়। সব যেন আবছায়া অস্পষ্ট হয়ে আসে। শুধু আচ্ছন্নতার মধ্যে সেই প্রেতমূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবার।

'কত দিন রয়েছ কবরে ?'

'তা হোল বৈ কি প্রায় আঠার বছর।'

'বাঁচতে ইচ্ছা করে ?'

'কি জানি।'

আবার সেই মাটি খোঁড়া। মাটি খুঁড়তে গিয়ে কখন সমুখের যাত্রীদের গায়ে আঘাত দেন। তারা আপত্তি করে। তখন চেতনা ফেরে। কিন্তু সে কতক্ষণ। আবার সেই ঘোর লাগে। আবার। আবার।

এক সময় জানলা নামিয়ে দেখেন কুয়াশা কেটে গেছে। পার হয়েছে রাত্রি। দিন আসন্ন দিগন্তে। সূর্য উঠছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে। মাটি বন পর্বত এখনও হিম। নির্মল স্বচ্ছ আকাশে দিনদেবের উষ্ণতা।

সেই নবোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন তিনি—'আঠারো বছর! হা ভগবান, আঠারো বছর জীবন্ত কবরে কাটানো! আঠারো বছর!'

৪

দুপুরের আগেই ডাকগাড়ী পৌছল ডোভারে।

হোটেলের প্রহরী গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল বিনীত ভঙ্গিমায়। এই দুরন্ত শীতের রাত্রে যে যাত্রী ডাকগাড়ী করে লণ্ডন থেকে ডোভারে এলেন, তাকে সমাদর করা দরকার।

একটি মাত্র আরোহী ভিতর থেকে নামলেন। বাকী দু'জন ইতিমধ্যে পথের ধারে নেমে পড়েছে।

লরি নেমেই প্রশ্ন করলেন—'কাল নৌকা পাওয়া যাবে?'

'আবহাওয়া যদি ভাল থাকে আর হাওয়া ওঠে, তবে বেলা দুটো নাগাদ নৌকা ছাড়বে। বিছানা দরকার হবে ত স্যার?'

'রাতের আগে নয়। এখন একটা থাকার ঘর দাও ত ব্যবস্থা করে। আর একজন নাপিত।'

'আসুন স্যার। এখুনি সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এই যে স্যার এই দিকে। কোন অসুবিধা হবে না।'

একটু পরে লরি যখন খাবার-ঘরে এলেন, দেখলেন তিনি ভিন্ন আর একটি মাত্র লোক প্রাতরাশ সামনে নিয়ে বসে আছেন। মানুষটির সর্বাঙ্গ দামী পোষাকে ঢাকা। সেই পোষাক সুগঠিত দেহের সঙ্গে চমৎকার মানানো। চোখ দুটিতে সিক্ত উজ্বল দীপ্তি। মুখে একটা সমাহিত গাম্ভীর্য যা দীর্ঘদিন ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্বের সঙ্গে বর্ষে বর্ষে গভীরতর হয়েছে। নিটোল কপোলে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আজো অবধি দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েনি মুখে, যদিও বয়সের রেখা কয়টি স্পষ্ট চোখে পড়ে। টেলসন ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মচারীদের মত এরও কাজ হল পরের ঝঞ্ঝাট পোয়ানো। আর পরের ঝঞ্ঝাট পরের সজ্জার মত অনায়াসেই ঝেড়ে

ফেলা যায় সমস্ত শরীর-মন থেকে। মানুষটি এমন নিথর হয়ে বসে আছে যেন কোন শিল্পীর সামনে মডেল হয়েছে।

লরিও তেমনি ভাবে বসলেন। আর বসতেই গভীর ঘুম জড়িয়ে এল দুটি চক্ষু ভরে। বেয়ারা যখন খাবার দিতে এল, সেই শব্দে তিনি জেগে উঠলেন। বললেন---'একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এসে হয়ত বলবে মিঃ লরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই অথবা বলতে পারে টেলসন ব্যাঙ্কের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব। তুমি তাকে আমার কাছে পৌছে দেবে, কেমন ?'

'যে আজ্ঞে। টেলসন ব্যাঙ্কের খদ্দের আমাদের প্রচুর। লণ্ডন আর প্যারিস যাতায়াত করেন, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা হরদম। তা হুজুরকে ত এর আগে কখনো দেখিনি ?'

'অনেক দিন আসিনি কিনা। আমরা এসেছিলাম—মানে আমি এসেছিলাম ফ্রান্স থেকে সে প্রায় বছর পনেরো হল।'

খাওয়ার পর গেলেন ডোভার সমুদ্রের বালুতটে। সঙ্কীর্ণ সহরটি যেন জলক্রোড় থেকে এলোপাথাড়ি পালিয়ে উটপাখীর মত পর্বতের কানাচে মাথা গুঁজে রেখেছে। সমুদ্র-সৈকত ত নয়, যেন বালুমরু। আর সেই মরুপ্রান্তরে পাথরের নুড়ি নিয়ে সমুদ্রজলের নিরবধি ধ্বংসলীলা। রাত্রিদিন জল আক্রোশে গর্জায় উন্মত্তের মত। সহরকে ভয় দেখায়, পাহাড়কে ভয় দেখায় আর পাড় ধ্বসায়। সহরে নিশি-দিন ঝড়ের ঝাপটা লাগে, আর সেই প্রবল বায়ুতে লোনা জলের গন্ধ পাওয়া যায়। কেবল যখন জোয়ার আসে, কিছু লোক বালুতটে বেড়ায়। নয় ত ডোভারের উপকূল চির-নির্জন।

শীতের অপরাহ্ণ গড়িয়ে এল। আজ সারা দিনের মধ্যে অনেক বার আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছিল। এপার থেকে দৃশ্যমান হয়েছিল ওপারে

ফ্রান্সের তটভাগ। এখন পড়ন্ত আলোকে আবার কুয়াশার ভার নেমে এল দিগন্ত অন্তরাল করে আর সেই সঙ্গে আচ্ছন্ন করল লরির চেতনালোক। সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্বলন্ত গন্‌গনে আগুনের সামনে সান্ধ্য আহারের অপেক্ষায় বসে তার মন গত রাত্রের মত আবার তন্দ্রাঘোরে কবর খুঁড়তে লাগল। এবার আর মাটি নয়, রক্তরাঙা জ্বলন্ত কয়লার কবর।

আহার শেষ করেছেন এমন সময় গলিপথে গাড়ীর ঘটাং-ঘটাং শব্দ কানে পৌছল।

'ঐ সে এল!' মনে মনে আবৃত্তি করলেন লরি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেয়ারা এসে খবর দিল যে লণ্ডন থেকে মিস্ ম্যানেট এসেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

'এখুনি নিয়ে এস। থাক, আমি নিজে যাচ্ছি, চল।'

শরীর-মনের ঢিলে আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে নিয়ে লরি বেয়ারার অনুসরণে আর একটি ঘরে এলেন। ঘনপালিশ প্রাচীন সব আসবাবপত্র। তাদের ভীড়ে কেবল দুটি বাতি জ্বলছে। ঘরের আবছা আলোয় লরির মনে হল, মেয়েটি হয়ত এখানে নয়, অন্য কোন ঘরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ঘরের মাঝামাঝি এসে দেখলেন যে, দুটি টেবিলের মাঝে আগুনের দিকে পিছন করে একটি বছর সতেরোর সুকুমারী মেয়ে তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। সোনালী চুল আর সমুদ্রনীল চোখ দেখে এক ঝলক স্মৃতি লরির মনের আকাশে বিদ্যুদ্বেগে উড়ে গেল। এমনি এক শীতের দিনে বিরামহীন তুষার-ঝটিকায় যখন সমুদ্র অস্থির উদ্বেল, তখন একটি স্বর্ণকেশী নীলনয়না শিশু-কন্যাকে বুকে করে তিনি চ্যানেল পার হয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্য সেই স্মৃতির পরিবেশে তিনি বেঁচে উঠলেন। কিন্তু সে ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ, যেমন আচম্বিতে উঠেছিল তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

'বসুন'। মেয়েটির জিহ্বার ঈষৎ বিদেশী টান কানে বাজল।

পুরাণো রীতিতে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন লরি— 'বোসো তুমি।'

'গত কাল ব্যাঙ্ক থেকে খবর পেলাম—কি যেন একটা আশ্চর্য সংবাদ মানে অভিনব আবিষ্কারই—'

'বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—একান্তই অবান্তর।'

'আমার পিতা—স্বর্গতঃ পিতা যাকে জীবনে দেখিনি আমি, তাঁর সামান্য সম্পত্তির ব্যাপারে প্যারিসে যেতে হবে শুনে, এই দূব পথেব একজন অভিভাবক সঙ্গীর জন্য আমি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে জানাই।'

লরি বললেন—'তোমার ভার নিতে পেরে আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি।'

'আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে শুনলাম যে, আপনার মুখে বিস্ময়কর কোন খবর নাকি আমি শুনব। আপনি আমায বলুন—কি সে খবর।'

'তাই ভাবছি। কি বলে সুরু করব ভেবে ঠিক করতে পাবছি না।' তারপর একটু থেমে বললেন—

'বিদেশে তোমায় যদি ইংরেজ তরুণী বলে পবিচয দিই, যদি মিস ম্যানেট বলে সম্ভাষণ করি, ভালোই হবে, কি বল ?'

'আপনার ইচ্ছায আমি বাধা দেবো না।'

'তবে শোন ! তোমার কাছে আমাদের ব্যাঙ্কের একজন খরিদ্দাবেব কাহিনী বলব। ব্যবসায়ী মানুষ আমরা। ব্যবসা ছাড়া কথা বলতে পাবি না বোঝ ত ?'

'খদ্দেরের গল্প ?'

'হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের লোক কি না। মানুষের চেয়ে খদ্দের বলাই আমাদের অভ্যাস। একজন ফরাসী ডাক্তারের কথা বলছি শোন।

তোমার বাবার মত তিনিও ছিলেন প্যারিসের এক বিখ্যাত লোক।

আর মানুষটির সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল—ব্যবসা সংক্রান্ত গোপনীয় জানা-শোনা। সে প্রায় বিশ বছর আগে।'

'সে কত দিনের কথা ?'

'বললুম ত। বিশ বছর হয়ে গেল। তিনি বিয়ে করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে। আমি ছিলাম তার সম্পত্তির একজন অছি। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজেই তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। কোন বন্ধুত্ব বা মনের ব্যাপার নয়। রোজ যেমন ব্যাঙ্কের খরিদ্দারের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আলাপ-পরিচয় হয় তেমনি ধারা আর কি। আসলে আমরা ব্যবসায়ী মানুষ ত, মনের কারবারী ত নই।'

মেয়েটির কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে দেখলেন লরি। 'আপনি আমার বাবার কথা বলছেন। বাবা মারা যাওয়ার দু'বছরের মধ্যে আমার মা-ও মারা যান। তখন আপনিই আমাকে ইংলণ্ডে নিয়ে আসেন। নিশ্চয়ই আপনি নিয়ে আসেন।'

'হ্যা মা! আমিই নিয়ে আসি। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ী লোক। আমাদের হৃদয় বলে কিছু নেই। থাকত যদি—এত বৎসরে একবারও কি তোমায় দেখতে যেতাম না? কিন্তু তুমি ত আমার কেউ নও? তুমি আমার ব্যাঙ্কের খরিদ্দার। আরো হাজার খরিদ্দারের একজন মাত্র। হৃদয়, অনুভূতি এ-সবের বালাই আমাদের কিছু নেই—করবার সময়ও নেই। কিন্তু এই অবধি তোমার বাবার কাহিনী! এর পর সব গরমিল। অথচ যে সময় তিনি মারা গেলেন, ঠিক সেই সময়টিতে যদি মারা না যেতেন—তুমি ভয় পেয়ো না মা, অমনভাবে চমকে উঠছ কেন?'

আচম্বিত আবেগে মেয়েটি দুই কম্পিত করতলে তার হাত চেপে ধরল।

কোমল সান্ত্বনার স্বরে বললেন লরি—'উতলা হয়ো না মা। শোনো।

যদি তোমার বাবা মারা না যেতেন। যদি, মনে কর, একদিন হঠাৎ নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যেতেন এমন কোন ভয়াবহ স্থানে যেখান থেকে তাঁকে সন্ধান করে বার করা অসম্ভব হোত। যদি তাঁর কোন সমধর্মী শত্রুই এমন থাকত যে এমন কিছু করত যার উচ্চারণ অবধি করা মানে মৃত্যু। এই যেমন ধর, কারুর হয়ে দীর্ঘ কারাবাসে রাজী হওয়া। ধর, যদি তাঁর স্ত্রী রাজা রাণী গীর্জা আদালত সর্বত্র আবেদন করেও তাঁর কোন খবর না পান, তাহলে আমার ফরাসী ডাক্তারের কাহিনীর সঙ্গে তোমার বাবার জীবন কাহিনীর আর কোন অমিল থাকে না মা।'

'আপনাকে মিনতি করছি, আপনি সব কথা আমায় খুলে বলুন।'

'বলব বৈ কি মা! কিন্তু তুমি অত উতলা হলে বলি কি করে? আমরা কারবারী লোক, মাথা ঘুলিয়ে গেলে কাজও গোলমাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, শোন। তোমার মা তখন গর্ভবতী। তিনি ভাবলেন, এত বড় দুঃখ তিনি তোমায় জানতে দেবেন না। তার কোলে যে আসবে সে যেন জানে যে তার বাবা—তুমি অমন করে বসলে কেন মা—কি হল তোমার?'

সযত্নে মেয়েটিকে তুলে নিলেন লরি। তারপর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'দুর্বল হোয়োনা মা। অমন করে ভেঙে পড়লে কি চলে? তোমার মা যখন গেলেন তখন তোমার বয়স দু'বছর। আর আজ? সেই শিশু আজ পরমা সুন্দরী তরুণী হয়ে উঠেছে। এই ক'বছরে একদিনও এ কালো মেঘ তোমার মনের আকাশকে আঁধার করেনি যে—কারাগারের অন্তরালে তোমার বাবা কি ভাবে এই আঠার বছর কাটাচ্ছেন।'

মেয়েটির নরম সোনালী চুলের দিকে একবার তাকালেন তিনি, তারপর বললেন—'পিতামাতার কোন গুপ্ত দৌলতের সন্ধান তোমায় দিতে পারব না মা। শুধু তোমায় জানাচ্ছি, তাঁকে আমরা খুঁজে

পেয়েছি। তোমার বাবাকে পেয়েছি আমরা। কিন্তু আজ তিনি পুরানো মানুষটির কঙ্কাল মাত্র। তবু তাঁকে যে পাওয়া গেছে এই কি যথেষ্ট নয় মা! তাঁকে একজন পুরাতন পরিচিতের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি যাচ্ছি সেখানে, সম্ভব হলে তাঁকে সনাক্ত করতে। তুমি তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবে। স্নেহে কর্তব্যে বিশ্রামে স্বাচ্ছন্দ্যে আবার পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলবে। মেয়ে ছিলে, মা হবে।'

লরি দেখলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা মৃদু শিহরণ প্রবাহিত হল। প্রেতকণ্ঠে বললে—'আমি কী দেখতে যাচ্ছি মিঃ লরি? তাঁকে না তাঁর প্রেতকে?'

'কিন্তু পুরানো মানুষটিকে পাওয়া গেলেও, তাঁকে পুরানো নামে পাওয়া যায়নি মা! আজ আর তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা বা উল্লেখ করাও যুক্তিসঙ্গত হবে না। এখন প্রথম প্রয়োজন তাঁকে ফ্রান্স থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। আর সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা যাত্রা করেছি। তার একটি মাত্র সঙ্কেত হল—'বেঁচে উঠেছে' এই দুটি কথায়। তুমি কি কিছুই শুনলে না মা।'

লরি দেখলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গ নিথর নিঃসাড় হয়ে গেছে। নিশ্বাস পড়ছে অতি মৃদু। এই অতি আকস্মিকতার আঘাতে মেয়েটি বিহ্বল বিবশ হয়ে পড়েছে ভেবে তিনি তার সঙ্গিনী মিস প্রসকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

যাত্রা করার আগে অন্ততঃ সুস্থ হয়ে ওঠা ত প্রয়োজন।

৫

মদের দোকানের দরজায ঠেলা-গাড়ী থেকে নামাতে গিযে একটা মদের পিপে মাটিতে বাদামের মত ফেটে পড়েছে। পথের উপরেই দুর্ঘটনা।

কাছাকাছির যত লোক কাজ-কারবার ফেলে ছুটে এসেছে সেই মদ গেলবার লোভে। পথের এলোপাথাড়ি পাথরের ফাটলের ফাঁকে-ফাঁকে সেই লাল মদের ছোট ছোট কুণ্ডের পাশে বিক্ষিপ্ত জনতার ভীড। পথের কাদা-ধূলোর সঙ্গে মিশে-যাওয়া সেই রুদ্ধ বা প্রবাহিত মদ্যস্রোতকে নিঃশেষে শুষে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় মুহূর্তে সেই পথ কলরব-মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয।

হাসি উল্লাস গালাগালি আর হৈ-চৈ শেষ হল তেমনি হঠাৎ, যেমন আচম্বিতে সুরু হযেছিল। যে লোকটি করাত দিযে কাঠ চিড়ছিল সে আবার কাজে ফিরে গেল। যে মেযেটি গরম উনুনের ছাযে অনাহারী দেহের কৃশ হাত-পাযের আঙুলগুলি সেঁকছিল সে আবার ফিরে গিযে বসল দরজায নিজের জাযগাটিতে। অন্ধকার গহ্বর থেকে যে লোকগুলো হঠাৎ পথের উপর উঠে এসেছিল, তাদের কদাকার মুখগুলো আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। রৌদ্র-ঝলকিত পথে আবার একটা বিষণ্ণ নৈঃশব্দ নেমে এল।

প্যারিসের এক সঙ্কীর্ণ গলিপথে সেদিন মাটি-পাথর ভিজেছিল লাল মদে। সেই রঙ লেগেছিল নানা বযসের নারী শিশু বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে। কারুর মুখে, কারুর হাতে, কারুর কপালে, কারুর সারা গাযে। এক-জনের ঠোঁটের দু'পাশ দিযে গড়িয়ে-পড়া মদের রক্তধারায় মানুষটাকে

দেখাচ্ছিল যেন রক্তলোভী পিশাচ! একজন পথের পাগল সেই মদের ধারা দিয়ে দেওয়ালে রক্তাক্ষরে লিখেছিল—রক্ত!

এ পথের পাথর রক্তস্রোতে একদিন এমনি লাল হয়ে উঠবে। লাল হয়ে যাবে মানুষের শরীর, তারও বুঝি আর দেরী নেই। একি তার সঙ্কেত!

কোথা থেকে বুঝি খানিকটা জীবন উছলে পড়েছিল এই পথে। সেটুকু শুষে নিতেই আবার সব ঝিমিয়ে গেল। আবার সেই বিষণ্ণ তরঙ্গহীন অন্ধকার। এই তিমির-রাজ্যের পাঁচ জন দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রভু। শীত, আবর্জনা, ব্যাধি, অশিক্ষা আর অভাব। এই পঞ্চরথীর সভায় অভাব হল মহারথী। বিলাস-নগরী প্যারিসের সহরতলীতে এই পথের আশে-পাশে সেই রাজ্যের এক মুষ্টি প্রজা দেখতে পাবে তুমি। দেখতে পাবে সেই অভাবের চেহারা এখানকার প্রত্যেকটি দরজায় জানালায়- দেখতে পাবে পথের কোণে-কোণে। পঞ্চ শোষণে এখানকার শিশুর অকাল বার্দ্ধক্য। শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের মুখেই একটি মাত্র ছাপ—সে ছাপ ক্ষুধার। ক্ষুধার রাজ্যই যেন। বড় বড় অট্টালিকা থেকে নির্বাসিত হয়ে ক্ষুধা যেন এই সব পথের আশে-পাশে হিংস্র লোভে ঘোরে। এখানকার বাসার বাইরে যে নোংরা কাপড় আর চট ঝোলে—পথের আবর্জনা-স্তূপে যে ময়লা জমে, সে সব ক্ষুধারই রূপ। সস্তা রুটির দোকানে, নোংরা মাংসের দোকানে, পচা তেলে-ভাজা খাবারের দোকানে, এ পল্লীর আনাচে-কানাচে, অণু-পরমাণুতে দারিদ্র্য আর ক্ষুধা নিত্য প্রহরী।

আর যেমন দেবতা তেমনি তার পীঠস্থান! একটা সরু নোংরা গলিপথ থেকে বেরিয়েছে আরো সরু ঘোরানো গলি সব। পচা দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে সব সময়। সে পথে যারা বাস করে তাদের গায়েও যেমন দুর্গন্ধ পরনেও তেমনি। মুখে দিনরাত্রি হাজার ভাবনার বাসা। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ উদাস।

কিন্তু মরবার আগে পশু যেমন একবার মরীয়া হয়ে শিকারীর দিকে ফেরে, তেমনি এই সব চিন্তাক্লিষ্ট পরাজিত চোখের দৃষ্টিতে কখনো কখনো সেই মরীয়া ভাব চোখে পড়ে। চোখে পড়ে অনাহারী সাদা ঠোঁটের নিরুদ্ধ আক্রোশ। কপালের বলিরেখায় ফাঁসীর পাকানো দড়ির মিল দেখা যায়।

দোকানেও সেই অভাবের স্বাক্ষর। এখানে সবই যেন নেই-নেই— সর্বত্র যেন নিত্য লক্ষ্মীছাড়া ভাব। কেবল যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্রের দোকানে ভাণ্ডার পর্যাপ্ত। ছুরি আর কাস্তে এখানে যেমন ধারালো তেমনি উজ্জ্বল। একটি হাতুড়িও হালকা নয়। বন্দুকের দোকানে যেন বিপ্লবের ভাণ্ডার। এ-পথে পথচারীর জন্য ফুটপাত নেই। জল-কাদা ভরা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা একেবারে বাড়ীর দরজার ধারে হাজির। বৃষ্টি-বাদলে পথের নোংরা জল গিয়ে দাঁড়ায় উঠোনে বা ঘরে। দীর্ঘ গলির মাঝে-মাঝে দড়ি পুলি দিয়ে টাঙানো এক-একটি গ্যাস। সন্ধ্যায় যখন বাতিওয়ালা সেই গ্যাস জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, অল্প-অল্প হাওয়ায় সেই টিমটিমে আলোর বাতি শূন্যে দোল খায়, মনে হয় যেন আঁধার সমুদ্রে ঝড়ের ঝাপটে উঠছে-নামছে জাহাজ। আসলে এরা সমুদ্রযাত্রীই। ঝড়ের তাড়নায় আর ঢেউয়ের ঝাপটে এরা বিপর্যস্ত নৌকারোহী।

হয় ত এমন দিনও আসতে বিলম্ব নেই যেদিন ঐ বাতিওয়ালার মত টিমটিমে গ্যাসের বাতি নামিয়ে লোকে ঐ পুলি আর দড়ি দিয়ে টেনে তুলবে মানুষকে। ঐ বাতির মতই সারি-বাঁধা মানুষ ফাঁসীতে লটকে দোল খাবে। সারা ফ্রান্স জুড়ে সেই হাওয়া উঠতে আরো বুঝি কিছু বিলম্ব আছে।

পথের কোণের এই মদের দোকানটি এখানকার মধ্যে সম্ভ্রান্ত। এতক্ষণ ধরে দোকানের মালিক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল।

মানুষটি রুক্ষ প্রকৃতির। বছর তিরিশ বয়স, পুরন্ত ভারী গড়ন। 'ছোট-ছোট কোঁকড়ান কালো চুলে সারা মাথাটি ভরা। মুখটিতে শিল্পীর হাতের ছাপ আছে। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় যে মানুষটি জেদী এক-রোখা প্রকৃতির।

পাগলের কীর্তি দেখে মালিক চেঁচিয়ে বললে—'কী ব্যাপার? একে-বারে পাগলা-গারদের ক্ষ্যাপা! কী যা-তা লেখা হচ্ছে?'

রাস্তা পার হয়ে গিয়ে কাদা লেপে মালিক রক্তলেখাটি মুছে দিলে নিজের হাতে। 'রাস্তায় এ-সব লেখো কেন? আর কোথাও জায়গা পাও না লেখবার?'

যখন দোকানে ফিরে এলো দেখলে মাদাম কাউণ্টারের পিছনে তেমনি বসে আছে। তার বয়স স্বামীরই সমান। চোখের দৃষ্টি ভারী সজাগ। কিন্তু লোকে দেখে, মেয়েটি কদাচিৎ চোখ তুলে তাকায়। মুখের ভাবে শান্ত দৃঢ়তা। এ মেয়েকে দেখলেই বোঝা যায় যে বুদ্ধিতে তার কুয়াশা নেই, জীবনে ভুল করেনি মোটেই। সহজে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে মেয়েটি গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে হাতের সেলাই পাশে রেখে একটা ছোট কাঠি দিয়ে দাঁত খুটছিল বসে-বসে।

স্বামী ঘরে ঢুকতেই ছোট্ট একটু কাসলে সে। বাক্যহীন এই সঙ্কেতেই স্বামী বুঝলে যে, স্ত্রীর ইচ্ছা দোকানের ওপাশে নতুন কোন খরিদ্দারের তদারক করে সে। মেয়েটি যখন কাসে ভুরু দুটি ঈষৎ উন্নত হয় কপালে, সেটি প্রথমেই চোখে পড়ে।

মালিক এতক্ষণে দোকানের চারিপাশে তাকিয়ে দেখলে। ঘরের এক কোণে দুটি চেয়ারে নিরিবিলি এসে বসেছেন একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একটি কমবয়সী মেয়ে। অন্য খরিদ্দারদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যখন সে নিকটবর্তী হল আগন্তুকদের, শুধু চোখের ভাষায় ভদ্রলোকটি সঙ্গিনীকে জানালেন যে, এই সেই লোক। একেই খুঁজছি আমরা।

মনে মনে বললে হ্যফর্জ—'এখানে কোণ ঘেঁসে বসে কি করছেন আপনারা? আপনাদের চিনিই না আমি।'

অন্য খদ্দেররা বিদায় নেওয়া মাত্রই প্রৌঢ় লোকটি এগিয়ে এলেন। স্ত্রীর সেলায়ের দিকে নজর ছিল মালিকের, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন তিনি—'একটু কথা বলতে চাই।'

'স্বচ্ছন্দে।' হ্যফর্জ তার সঙ্গে নিঃশব্দে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোকটির প্রথম বাক্যস্ফূর্তিতেই হ্যফর্জ যেন চমকে উঠল। তার পর দু'জনে মিনিট খানেক গূঢ় আলাপ হল। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বাইরে যেতেই ভদ্রলোকটি সঙ্গিনী মেয়েটিকে ডাকলেন। তার পর তারাও বাইরে গেলেন। মাদাম নিবিষ্ট মনে সেলাই করছিল, এ সবই তার দৃষ্টির অগোচর রইল।

দরজা থেকে বেরিয়ে লরি ও মিস ম্যানেট দোকানের মালিকের পিছু-পিছু এগোলেন। ছোট উঠোনের চারি পাশেই মস্ত মস্ত পিঁজরাপোলের মত বাসা। তারই একখানির অন্ধকার ঢালি বাঁধানো সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে হ্যফর্জ নীচু হয়ে পুরানো কর্তার মেয়েকে প্রণাম জানালে। ভাবটুকু কোমল, কিন্তু ভঙ্গীটি মোটেই মনোহর বোধ হল না লরির। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটির যেন গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে। মুখে বিন্দু মাত্র স্নিগ্ধতা অবশিষ্ট নেই, ব্যবহারে নেই শিষ্টতা। আচম্বিতে যেন গূঢ় ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর জীব হয়ে উঠেছে মনে হল।

সিঁড়ি ভাঙা সুরু করেই কঠিন কণ্ঠে জানালে সে—'অনেক উঁচু। পথও দুর্গম। ধীর পায়ে চলুন।'

'একলা আছেন?'

'একলা? একলা ছাড়া তাঁর সঙ্গে থাকবে কে?'

'একলাই থাকেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'একলা থাকার ইচ্ছে বুঝি ওর ?'

'ইচ্ছেতে নয়। দরকারে। ওরা যখন প্রথম আমায় খুঁজে পেয়ে দাবী করে যে ওকে আমি রাখব কি না—এমন কি নিজের ঝুঁকিতে—সেই তখন যেমন দেখেছিলাম এখনও ঠিক তেমনি আছেন।'

'অনেক বদলে গেছেন-- না ?'

'বদলে ?' দেওয়ালে ঘুঁসি মেরে দোকানের মালিক কি-যেন একটা গালিবর্ষণ করলে আপন মনে।

যত উঠছেন বুকে হাফ ধরছে লরির।

প্যারিসের ঘিঞ্জি রাস্তায় এই ধরণের বাড়ীর সিঁড়ি ভাঙা যেন পাহাড়ে ওঠা। শুধু অন্ধকার নয়, নোংরা। দু'পাশের ভাড়াটেরা সিঁড়ির ধারেই নোংরা ফেলে রাখে দিন-রাত্তির। একটা পচা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ যেন বাতাসের টুঁটি চেপে আছে সব সময়। লরি দু'বার থেমে হাঁফ ছাড়লেন। মাঝে-মাঝে পথের দৃশ্য চোখে পড়ে জানালা দিয়ে। চারি পাশেই সেই নোংরামি আর লক্ষ্মীছাড়া রূপ। শুধু অনেক উঁচুতে উঠে একবার চোখে পড়ল নোতরদম গীর্জার দুটি উন্নত শীর্ষ। এই বুক-চাপা ছোটত্বের মধ্যে গীর্জার ঐ দুটি চূড়া যেন মহৎ জীবনের স্বপ্ন-স্বর্গ !

অবশেষে শেষ সিঁড়ি ভাঙা শেষ হল। কোটের পকেট থেকে চাবী বার করতে দেখে লরি তাকে প্রশ্ন করলেন—'দরজায় তালা দেওয়া কেন ?'

দ্যফর্জ রুক্ষ গলায় শুধু হুঁ বলে সাড়া দিলে।

'দরজা বন্ধ কেন ?'

'কেন ? এত কাল বন্ধ দরজার অন্তরালে কাল কাটিয়েছেন। এখন সব খোলা পেলে জানি না কি সবনাশ করে বসবেন। হয়ত নিজেকেই টুকরো করে ফেলবেন আক্রোশে।'

'তাও কি সম্ভব ?'

'সম্ভব? সম্ভব কেন নয় শুনি? এ পৃথিবীতে কী সম্ভব নয়? কি হচ্ছে না তুনিয়ায়? শয়তানের পৃথিবী—হয় না আবার কি?'

পুরুষ তু'জনের নিম্ন কণ্ঠের আলাপ কানে না পৌঁছলেও, আপন মনের গভীর ভাব-সংঘাতে মেয়েটির মুখ এতক্ষণে ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছিল। একটা আতঙ্কের ধাক্কায় মুখের সব রক্ত সরে গিয়ে গোলাপী গাল পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে দেখে লরি তার গায়ে হাত দিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'সাহসী হও মা! এখুনি দেখো না সব চিরকালের মত মিটে যাবে। একবার তাকে দেখলেই সব ভয় ঘুচে যাবে তোমার। তখন তোমার কত কাজ পড়বে। তাকে ভালো করে তুলবে তুমি—স্নেহ দেবে, যত্ন দেবে—তাকে সুখী করবে—তিনি তোমার—'

শেষ ধাপে যখন পৌঁছলেন, লরি দেখলেন তিনজন লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘরের ভিতর দেখচে। কেউ দরজার ফুটো দিয়ে, কেউ দেওয়ালের ফাটা দিয়ে।

'এরা কারা?'

'তাড়াতাড়িতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, তোমরা এসো ভাই। আমাদের একটু কাজ আছে।'

তিন জন নেমে যেতেই লরি রাগত কণ্ঠে দোকানের মালিককে বললেন 'এরা কারা? তুমি কি ওঁকে চিড়িয়াখানার জন্তু পেয়েছ?'

'না—তু'একজন চেনা লোককে মাত্র দেখাই। যেমন এই আপনারা এসেছেন।'

'এ অন্যায়।'

ততক্ষণে দরজায় চাবী ঘুরিয়েছে সে। তুম-তুম করে ধাক্কা দিয়ে ভিতরের মানুষটির সাড়া জাগিয়েছে। তার পর দরজার এক পাল্লা ঈষৎ উন্মুক্ত করে কি যেন বললে। অস্ফুট এক বর্ণ প্রত্যুত্তর কানে এল অন্ধকার থেকে।

তাদের হাত নেড়ে আহ্বান করতেই লরি মেয়েটিকে সবলে বাহু দিয়ে জড়িয়ে নিলেন। দেখলেন, সে যেন সংজ্ঞা হারাবার প্রাক-মুহূর্তে এসে পৌঁছেচে।

চোখ থেকে ঝরে লরির গালে কি যেন চক-চক করতে লাগল। তিনি স্নিগ্ধ সিক্ত কণ্ঠে বললেন—'এসো মা এসো।'

'বড়ো ভয় করছে আমার!'

'ভয়? ভয় কিসের? কার ভয় মা?'

লরি মেয়েটিকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে নিলেন। তার পর যেন কোলে করেই ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন।

এ ঘরটি বহু কালের কাঠ-কাঠরার গুদাম। দরজা একটি। জানলাও একটি পথের দিকে। সেই জানলায় চাকা লাগান দড়ি। সোজা পথ থেকে এই উঁচু অবধি মাল তোলার ব্যবস্থা। এত অন্ধকার যে প্রথমে কিছুই ঠাহর হল না লরির। তার পর চোখ একটু অভ্যস্ত হতে তিনি মেয়েটিকে নিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন।

এক সময় দেখলেন, জানলার দিকে মুখ করে একটি পক্ককেশ বৃদ্ধ একখানি বেঞ্চির উপর ঝুঁকে আপন মনে কি নিয়ে পরম ব্যস্ত। লরি নত হয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ যা তৈরী করেছেন তা মেয়েদের এক পাটি জুতা।

৬

'কেমন আছেন ?'

উত্তরে সেই নত শির একবার ঈষৎ আন্দোলিত হল। দূরাগত ধ্বনির মত শোনা গেল—'ভাল।'

'এখনও কাজ করছেন ?'

কতক্ষণ পরে সেই মুখ দেখতে পেলেন লরি। দেখলেন, দুটি জ্যোতিহারা চোখ। 'কাজ করছি।' এই দুটি মাত্র কথায় যে দুর্বলতা প্রকাশ পেল তাতে লরির হৃদয় গভীর দুঃখে ভরে উঠল। দীর্ঘ দিন বন্দিজীবন যাপন করার ফলে যে দুর্বলতা শরীরে বাসা বেঁধেছে এ তারই ফল। কত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলেন নি। কাল কাটিয়েছেন নিঃসঙ্গ নির্জন বোবা। যেন কত কাল পূর্বের একটি ধ্বনির মৃদুতম প্রতিধ্বনি। মনুষ্য-কণ্ঠের সজীবতা ও ব্যঞ্জনার লেশ নেই সেই ধ্বনিতে। লরির মনে হল, যেন মানুষটি কত কাল ধরে একাকী দিশাহারা হয়ে ফিরেছেন বনে-বনান্তরে, এতদিনে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বন্ধু-পরিজনের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে গভীর মৃত্যু ঘুমে অচেতন হবেন।

কতক্ষণ মৌন কাল কাটল। তার পর সেই দুটি দীপ্তিহীন চোখের দৃষ্টি তুলে আবার তাকালেন বৃদ্ধ।

ডিফার্জ তাকে বললে—'আর একটু আলো বাড়ালে কষ্ট হবে কি ?'

ইতস্ততঃ দৃষ্টি দিয়ে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বললেন—'কি যেন বলছিলে তুমি ?'

'আর একটু আলো বাড়ালে কষ্ট হবে ?'

'আলো এলে সহ্য করতেই ত হবে।'

আধ-ভেজান দরজাটি খুলে দিলে জ্যফর্জ। আলো এসে পড়ল বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে। লরি দেখলেন মানুষটিকে। কোলের উপর আধা তৈরী একটি মেয়েলি জুতো। শ্বেত শ্মশ্রুতে ভরা মুখখানি। গাল দুটি বসা। দীঘ চিকণ মুখের মধ্যে চোখ দুটি কেবল বড়ো-বড়ো। আলো লেগে সে দুটি যেন ঝক-ঝক করতে লাগল এতক্ষণে। গায়ে একটি হলদ রঙের ছিন্ন সার্ট। খোলা বুকটি দেখা যাচ্ছে যেন শীতের পাতার মত শুষ্ক বিবর্ণ।

আলোর জন্য হাত দিয়ে চোখ ঢেকেছিলেন। সেই হাতের দিকে তাকিয়ে লরির মনে হল যেন হাড় অবধি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মানুষটি যখনই কথার উত্তর দিচ্ছেন, এলোমেলো ভাবে এদিকে-ওদিক তাকাচ্ছেন, যেন কথার সঙ্গে স্থানের মিল করতে পারছেন না দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে।

মেয়েটিকে দ্বারপ্রান্তে রেখে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন লরি।

নতশির বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জ্যফর্জ বললে– 'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

'কি বলছ?'

'একজন ভদ্রলোক আপনাকে দেখতে এসেছেন। কী জুতা তৈরী করছেন এঁকে দেখান ত। আর কারিগরের নামটিও বলুন।'

অনেকক্ষণ ধরে এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতে জড়াতে লাগলেন বৃদ্ধ। মাঝে-মাঝে চিবুকে হাত বুলাতে লাগলেন। এমনি ধারা করলেন কতবার। যেন বার বার শূন্যতার মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন।

'কি যেন বলছিলে?'

'আপনার নাম বলুন।'

'আমার?—একশ' পাঁচ।'

'খাস্। আর কিছু নয়।'

'হ্যাঁ—একশ' পাঁচ।'

'আপনি ত আর মুচি নন পেশায়?'

সেই দুটি জ্যোতিহীন চোখ পলকের জন্য ডিফার্জের মুখের উপর ন্যস্ত হল। তার পর ধীর কণ্ঠে বললেন তিনি—'মুচি নই আমি। কোন কালে ছিলামও না। তবে শিখেছি—শিখে নিয়েছি নিজে নিজে।'

লরির হাত থেকে সেই সৌখীন মেয়েলি জুতাটি নেবার জন্য কম্পিত হাত প্রসারিত করলেন তিনি। সেই অবসরে দু'জনের দৃষ্টিবিনিময় হল। লরি প্রশ্ন করলেন তাঁকে 'আমায় মনে পড়ে ডাঃ ম্যানেট?'

হাত থেকে স্খলিত হয়ে জুতাটি পড়ল মাটিতে। প্রশ্নকারীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ।

'মঁসিয়ে ম্যানেট' ডিফার্জের দিকে দেখিয়ে লরি বললেন 'দেখুন ত ভালো করে এই লোকটির দিকে। আমার দিকে তাকান। কিছুই কি মনে পড়ে না আপনার? কোন পুরানো ব্যাঙ্কার, পুরানো ব্যবসা, পুরানো চাকর-বাকর, কোন কিছু পুরানো কি মনের ভিতর জাগে না? দেখুন না চেয়ে। ভাবুন না একটু।'

এই দুটি লোকের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখতে লাগলেন বৃদ্ধ পালটে পালটে। ধীরে ধীরে তাঁর কপালে একটি কুঞ্চন রেখা-স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে হল বুঝি চৈতন্যোদয় ঘটছে। কিন্তু ক্ষণিকের সেই চেতন মানস আবার এক সময় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আবার সেই বিস্মৃতির সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হলেন। স্মৃতি বিস্মৃতির বিপরীত তরঙ্গভঙ্গে ক্লান্ত হলেন। আবার নেমে এল অন্ধকার দু'চোখ ভরে। তখন মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বৃদ্ধ আবার জুতা সেলায়ে মন দিলেন।

'চিনতে পেরেছেন ?'

ড্যফর্জের প্রশ্নের উত্তরে লরি বললেন—'পলকের জন্য চিনেছি। ভেবেছিলাম বুঝি হবে না। কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য ঐ মুখে আমি বহুদিনের বিস্মৃত পরিচয় স্পষ্ট দেখেছি। চুপ। এসো আমরা সরে দাঁড়াই।'

দ্বারপ্রান্ত থেকে মেয়েটি এগিয়ে এসে বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়েছে কখন। কোন সাড়া নয়, শব্দ নয়, যেন একটি বিদেহী আত্মার মত বৃদ্ধের নত মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি।

কখন বুঝি হাতের যন্ত্র বদলাতে গিয়ে মেয়েটির জামার প্রান্ত চোখে পড়ল বৃদ্ধের। চকিতে মুখ তুলে দেখলেন মেয়েটিকে।

একটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ভরে উঠল বৃদ্ধের দুটি চোখ। একটু পরে দুটি ঠোঁট কাঁপতে-কাঁপতে যেন কি বাক্য রচনা করতে লাগল নিঃশব্দে। অনেকক্ষণ পরে সেই শব্দ ক'টি হৃৎপিণ্ডের গতির সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হল—'এ কি ?'

কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মেয়েটি। সেই অবস্থায় সে বৃদ্ধের দুটি হাত নিয়ে একবার অধরে ছুঁইয়ে বুকের উপর চেপে ধরল। লরি ভাবলেন বুঝি বা বৃদ্ধ পিতার ধ্বংসস্তূপই কন্যা বকে আঁকড়ে নিল।

'তুমি জেলারের মেয়ে নও ?'

'না।'

'তবে কে তুমি ?'

তাঁর পাশে বসল মেয়েটি বেঞ্চের উপর। বৃদ্ধ ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। তখন পিতার হাতে হাত দিল সে। একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গে শিহরিত হল বৃদ্ধের দেহ। হাতের তীক্ষ্ণ ছুরিকাটি রেখে বৃদ্ধ এই অজানা মেয়েটির মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

এক রাশ সোনালী চুল কাঁধের উপর ভেঙে পড়েছে। সেই চুলের

কয়েকটি গোছা নিয়ে আনমনে খেললেন তিনি। তার পর আবার সেই অন্ধকার।

একটু পরে নিজের গলা থেকে একটা দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন বৃদ্ধ। নোংরা কাপড়ের একটা টুকরো খুলে ভিতর থেকে দু'তিনটি সোনালী চুল বার করলেন, কত বার করে মিলিয়ে দেখলেন। বিড়-বিড় করে বললেন—'এ-ও কি হয়? কি করে হয়? এ সব কি?'

চেতনার সূর্যালোক এল। 'সে রাত্রে আমার কাঁধে মাথা রেখেছিল আমার সোনা। বুঝি ভয় পেয়েছিল যে আমি চলে যাবো। কিন্তু ভয় ত ছিল না কিছু। তবু ওরা যখন আমায় নিয়ে গেল জেলখানায়, এই ক'টি চুল আমার জামার হাতায় জড়িয়ে ছিল। আমি বলেছিলাম জেলারকে, ঐ ক'টি আমায় রাখতে দিন। ওরা আমার দেহকে মুক্ত করতে পারবে না—কিন্তু আমার মনকে মুক্তি দেবে। মনে পড়ছে স দিকে পড়ছে আমার।'

কথাগুলি কল্লোলের মত মানস সরোবরে উঠল পড়ল। কিন্তু মুখে বললেন তিনি—'এ-ও কি হয়? তুমিই কি আমার সেই?'

মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। সেই সোনালী চুল ক'টি কত বার করে বুকে চেপে ধরে অসহায় আর্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন 'না—না। তুমি এত ছোট—এত সুন্দর। তুমি কি করে হবে? এই আমি। জেলখানার কয়েদী। এই হাত তুমি ত কখনো দেখনি। এই মুখ তুমি ত চিনবে না। এই গলা কখনো শোনোনি। না, না। সে ছিল আমার একদিন। আমি ছিলাম তার। কিন্তু সে কত যুগ হয়ে গেল—কত যুগ—তোমার নামটি কি লক্ষ্মী মেয়ে?'

তাঁর কণ্ঠের স্নিগ্ধতায় অধীর হয়ে মেয়ে বাপের চরণতলে বসল। বুকের উপর হাত দুটি জড়ো করে বললে—'আমার কি নাম। মা কে, বাবা কে, সব আমি বলব আপনাকে। কিন্তু সে এখন নয়। সব বলব

আপনাকে। সব বলব। শুধু আমায় আপনি আশীর্বাদ করুন। আমায় একবার বুকে জড়িয়ে নিন—শুধু একটি বার।'

নীচু হয়ে বৃদ্ধ মেয়ের সোনালী চুলে মুখ রাখলেন।

'যদি চিনেই থাক মা আমার, একবার এই বুড়োর কথা ভেবে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল মা। কত আশা, কত স্বপ্ন, কত সাধ কত স্মৃতি! সব চোখের জলে ভিজিয়ে দাও।'

বৃদ্ধের শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানি বুকের মধ্যে নিয়ে মেয়ে তাকে যেন শিশুর মত ভোলাতে লাগল।

'যত কান্না আছে সব কেঁদে নাও। কান্নার শেষ করে দাও। আমি এসেছি তোমায় নিয়ে যেতে। এইবার তোমায় নিয়ে আমি চলে যাবো ইংল্যাণ্ডে। পিছনে পড়ে থাকবে এই পুরানো পতিত জমি—নতুন সুখের নীড় বাঁধব আমি তোমায় নিয়ে সযত্নে। মাকে ত হারিয়েছি চিরদিনের জন্য—তিনি ত কেঁদে-কেঁদে চলে গেছেন। তোমায় ফিরে পেয়েছি এ আমার কত সৌভাগ্য! তোমার এই অভাগিনী ভাগ্যবতী মেয়ের দিকে একবার তাকাও বাবা।'

মেয়ের বুকে মুখ গুঁজে বৃদ্ধ শরীর এলিয়ে দিয়েছিলেন। কী অপরিসীম যন্ত্রণা ও অন্যায় ভোগ করে এত ক্লান্ত হয়েছেন ভেবে বাকী দু'জনের চোখ ফেটে জল এল।

লরি এগিয়ে এসে পিতা-পুত্রীকে পরম স্নেহে তুলে ধরলেন। ঝড়ের শেষে এখন সব শান্ত হয়ে এসেছে। জীবনের ঝটিকা অবসানে এখন বিরতি।

'এখনি একে নিয়ে যেতে হবে প্যারিস থেকে?'

'কিন্তু ওর পক্ষে কষ্ট কি সহ্য হবে?'

'এ বীভৎস রাজ্য থেকে পালাতে পারলে উনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন'—বললে মেয়ে জিদ করে।'

লরি বললেন—'তবে তাই হোক মা। আমি নিজে ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পিতা-পুত্রীকে সেই আধা অন্ধকার চিলে কোঠায় তেমনি ভাবে রেখে লরি ও ষ্টফর্জ দু'জনে যাত্রার আয়োজন করতে গেলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল প্যারিসের এই সহরতলীতে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল কখন নিঃশব্দ পায়ে। তারও কতক্ষণ পরে দু'জনে ফিরে এলেন যাত্রা ও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে।

শূন্য বিহ্বল বিস্মিত দৃষ্টির অন্তরালে সেই বন্দীর মনে কি ভাবতরঙ্গ উঠছিল তা এরা কেউ-ই ধারণা করতে পারলে না। কি যে ঘটল তার গভীর মর্মার্থ কি তিনি বুঝলেন? আপন মুক্ত জীবনের অনুভূতি কি হৃদয়তন্ত্রীতে নবজীবনের রাগিণী বাজালে? মানুষটির গূঢ় বিহ্বলতায় এক-এক বার ছেদ পড়ছে তখন—যখন কন্যার কণ্ঠধ্বনিতে সচকিত হয়ে উন্মনা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তার মুখখানির দিকে।

আহারপর্ব সমাপ্ত হল মন্থর গতিতে। পোষাক পরিচ্ছদ বদল হল। তার পর চারজনে ধীর পায়ে নামতে লাগলেন সেই দীর্ঘোন্নত বঙ্কুর সিঁড়ি বেয়ে।

'কিছু মনে পড়ে তোমার?'

'কিছু না। কত দিন হয়ে গেল।'

উঠোনে নেমে বৃদ্ধ যেন একটি পরিচিত টানা সেতুর আশায় তাকালেন। কিন্তু না দেখে যেন নিরাশ হলেন।

পথ নির্জন। কোন বাতায়নে কৌতূহলী দর্শক নেই। সেই জনহীন পথে কেবল নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দ এদের সাক্ষী হয়ে রইল। আর মদের দোকানের দ্বারে হেলান দিয়ে মালিকের স্ত্রী গভীর মনোযোগে সেলাই করতে লাগল। তার দৃষ্টিও যেন পড়ল না এদিকে।

বৃদ্ধের পিছনে-পিছনে কন্যাও গাড়ীতে উঠল।

লরি উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধ তাকে মিনতি করলেন তার যন্ত্রপাতি আর অর্ধসমাপ্ত জুতাটি নিয়ে আসার জন্য। মাদাম সে কথা শুনে নিজে নিয়ে এল সেগুলি। তার পর আবার দরজায় হেলান দিয়ে তেমনি ভাবে আপন মনে সেলাই করতে লাগল। যেন কিছু দেখেও দেখেনি।

গাড়োয়ানের চাবুক খেয়ে ঘোড়ারা লাফিয়ে ছুট দিল। আধ স্তিমিত পথের আলোয় গাড়ীর লণ্ঠনগুলি আলোছায়ায় দুলতে লাগল।

তারা-ভরা আকাশের নীচে কম্পিত এই আলোক-দ্যুতি। কত নক্ষত্র, যাদের আলোক আজও এসে পৌঁছায়নি এই ধরিত্রীর বুকে। যারা আজো জানে না এই অপার অসীম বিশ্বভুবনে একটি মৃত্তিকাকণা এই পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে কত ন্যায় অন্যায়, কত স্নেহ নিষ্ঠুরতা।

রাত্রির অন্ধকারের কী দুর্ভেদ্য গূঢ়তা! কী অগোচর ব্যাপ্তি! মনকে আচ্ছন্ন করে। শীতল রাত্রি, ঘোড়ার লাগামের ঝনঝন, সম্মুখে-বসা একটি নিথর ঘুমন্ত বৃদ্ধ আবার সেই স্বপ্নকে প্রত্যাবৃত্ত করল মনে।

এই মাত্র তাকে উদ্ধার করেছেন। মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে মুক্ত বাতাসে তুলে এনেছেন।

'বেঁচে উঠতে ভাল লাগছে?'

কানে সেই পরিচিত উত্তরটি এল।

'ঠিক বলতে পারিনা। কী জানি।'

দ্বিতীয় পর্যায়

[পাঁচ বছর পর]

১

ব্যাঙ্ক ত নয় যেন আদিম গুহা। যেমন ছোট তেমনি নোংরা। খরিদ্দারের অসুবিধার অন্ত নেই। আর এই অসুবিধাগুলিই মালিকদের গর্ব। তাদের ধারণা, ঝক্‌ঝকে সম্ভ্রান্ত চেহারা হ'লে টেলসন ব্যাঙ্কের ইজ্জত কমবে। ব্যবসা কমবে। খরিদ্দারের যত অসুবিধাই ঘটুক না কেন টেলসন ব্যাঙ্কের মালিকরা বরং ছেলেদের ত্যজ্যপুত্র করবে, তবু ব্যাঙ্কের শ্রী ফেরাবে না কিছুতেই।

বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। কিন্তু যে কেউ সেই গহ্বরে প্রবেশ করে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। কাউণ্টার পেরিয়ে ভিতরের ঘরটিতে ঢুকলে চোখে আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন জীর্ণ আসবাবের গন্ধে ভারী পচা বাতাস যেন বুকের উপর জগদ্দলের মত চেপে বসে।

আর এখানকার নিয়মও অদ্ভুত। বাইরের কাউণ্টারে যারা বসে তারা পৃথিবীর মতই প্রাচীন। ভাবলেশহীন তাদের মুখ পাথরের তৈরী মনে হয়। টেলসন ব্যাঙ্কে অল্পবয়সী কেউ ঢুকলে দীর্ঘ দিন তাকে লোক-লোচনের অন্তরালে ভিতরে বসে কাজ করতে হয়। দিনে-দিনে সেই মৃত্যুর মত নিঝুম পুরীতে রুদ্ধ বাতাসের আবহাওয়ায় তার ভিতরকার মানুষটি কখন বদলে যায়। টাকা নোট গহনা আর পরের দলিল-পত্র নেড়ে নেড়ে পাথর হয়ে যায় তারও মুখ-চোখ। তখন সে বাইরে আসে।

এমনি করে টেলসন ব্যাঙ্কের ট্র্যাডিশান বরাবর চলে।

সে-যুগে মৃত্যুদণ্ড ছিল স্নানাহারের মতই নিত্য ঘটনা। টেলসন ব্যাঙ্কের কৃতিত্বও সে ব্যাপারে কম ছিল না। প্রকৃতি মৃত্যুর পথে সব কিছু সমস্যার সমাধান করে। আইনেরই বা অপরাধ কি? যে জালিয়াৎ তার কপালে মৃত্যুদণ্ড। মিথ্যা দলিল করার অপরাধে মৃত্যু। টাকা-পয়সার দলিলের সামান্যতম জোচ্চুরি যে করবে তার আর বাঁচবার উপায় নেই। এই সব কারণে একা টেলসন ব্যাঙ্কই যে কত লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ব্যাঙ্কের ভিতরের আবহাওয়ার মত মানুষগুলিও অনড়। শুধু বার-দরজার বাইরে যে লোকটি ফাই-ফরমাস খাটে সেই কিছু নড়া-চড়া করে। বাকী সময় বসে থাকে চুপচাপ। যখন কোথাও কাজে যায় ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে যায় নিজের জায়গায়। চেহারায় হাবভাবে ছেলেটিও যেন বাপের ছায়া।

এমনি এক মার্চের ঝড়ো সকালে বাপ ছেলেতে ঘাঁটি আগলে বসেছিল। ফ্লীট ষ্ট্রীটের লোক-চলাচল সুরু হয়ে গিয়েছে রীতিমত। ছেলেটি চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে করতে সেই দিকে তাকিয়ে সব দেখছিল।

এমন সময় ভিতর থেকে সাড়া এল—'জেরি!'

ছেলেটি বাপের দিকে তাকিয়ে বললে—'যাও বাবা। আজ সকাল বেলাই ডাক পড়েছে।'

২

ভিতবে গিযে দাঁড়াতেই ব্যাঙ্কেব এক বুড়ো কর্মচাবী বল্‌লে—'পুবানো বেলীব জেল চেনো তো জেরি।

বেশ ভারিক্কী চালে জেবি জবাব দিল—'চিনি বই কি।'

'বাঃ। আর মিঃ লবিকে?'

'তাকে চিনি না আবাব? খুব চিনি। বেলী-বাড়ীবই ব... সব চিনি না বলতে পাবি। ও-সবেব অত খবব কে রাখছে বলুন না।'

'তা বেশ। এখন এক কাজ কবো দিকিনি। যেখান দিয়ে সাক্ষীবা আদালতে ঢোকে সেখানকাব প্রহবীকে এই চিঠিটুকু দেখাবে। মিঃ লরির চিঠি। তাকে দেখালেই প্রহবী তোমায ভেতবে ঢুকতে দেবে।'

'আদালতেব ভেতবে?'

'হ্যাঁ! আদালতের ভেতবে বই কি।'

বারেকেব জন্য জেবির দুটি চোখেব মণি যেন কাছ-ববাবব হযে এল। কি যেন বলাবলি কবলে সে দুটিতে।

'আদালতে অপেক্ষা করব, না, চলে আসব?'

'আগে সবটুকু শোনো। চিঠি দেখবাব পব ভিতবে ঢুকে তুমি তার নজবে পড়ার চেষ্টা করবে। তিনি তোমায দেখলে, সেখানে অপেক্ষা কবতে থাকবে যতক্ষণ না তোমায ডেকে কিছু জানিযে দেন।'

'এই ত?'

'একজন লোক তাঁব হাতেব কাছে থাকা দবকার। তুমি তাঁকে জানিয়ে দেবে যে, তুমি বইলে তাঁর দরকারে।'

চিঠিটি নিয়ে জেরি আর একবার বললে—'আজ সকালের দিকেই বোধ হয় জালিয়াতির মামলা উঠবে ?'

'জালিয়াতি নয়, বিশ্বাসঘাতকতা !'

'তার শাস্তিও বড়ো বিশ্রী। বড়ো বিশ্রী দেখতে শুনতে।'

সেই প্রাচীন মুখে চশমার অন্তরালবর্তী দুটি তীক্ষ্ণ চোখে যেন রাজ্যের বিস্ময় উদ্যত হয়ে উঠতে দেখল জেরি।

'তা বললে কি হয় ? আইন যা, তা তো হবেই।'

'লোক মারা ব্যাপারটাই ত জঘন্য। তার উপর আইনের নামে মানুষকে কেটে কুটিকুটি করা—ভাবলে যেন কি রকম হয়।'

'মোটেই জঘন্য নয়'—জবাব দিলে বৃদ্ধ—'আইনের নিন্দে ক'রো না, বুঝলে। নিজের সাবধান নিজে হও। নিজের বুক আর মুখ সামলে চলো।'

জেরি জবাবে বললে 'ঠাণ্ডায় সব জমে ভারী হয়ে আছে স্যার। কি কষ্টে যে রুটি রোজগার করি তা তো আপনার অজানা নয় ?'

'জানি সবই। তার আর কি করা যাবে বলো ? নানা লোক নানা রকমে করে খাচ্ছে। কারুর বা কষ্টে কারুর বা কিছু আরামে।'

চিঠি হাতে নিয়ে জেরি বিদায় নিলে।

সেকালে ফাঁসী হোত টাইবার্ণে। নিউগেটের বার-রাস্তার তাই কোন দুর্নাম রটেনি তখনো। কিন্তু জেলখানা ছিল নরক। যত রকম নোংরামি ব্যভিচার রোগের আড্ডা এই সব জেলখানা। কয়েদীদের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব রোগ ছড়িয়ে পড়ত আদালত অবধি। কত বার এমন হয়েছে যে, কয়েদীদের ছড়ানো রোগে তাদের ফাঁসীর আগেই বিচারকের নিজের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে গেছে। বেলী-জেলকে লোকে পরলোকের ফটক বলেই জানে। এখান থেকে যে কতজন ওপারে চলে গেছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। কত রকম গাড়ী করে কয়েদীরা যায়

এখান থেকে। সেখানকার ফাঁসী-কাঠেরই বা কত ঘটা! চাবুক মারার ব্যবস্থারই বা রকম-ফের কত!

সেই জেলখানা আর আদালতের উঠোন পেরিয়ে জেরি নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে গেল ভিড় ঠেলে-ঠেলে। শেষ অবধি সাক্ষীদের কাঠ-গড়ার দরজার প্রহরীর হাতে পৌঁছে দিল চিঠিখানি। আদালতে আজ ঠাসাঠাসি মানুষের ভিড়। যত লোক থিয়েটারে বা সংয়ের আড্ডায় ভিড় করে, তার চেয়ে বোধ করি এখানে ভিড় কম নয়। বেলী-বাড়ীর সব ক'টি দরজাতেই তাই নিয়ত প্রহরী। কেবল একটি সদর দরজা নিত্য খোলা থাকে। সে-পথ দিয়ে চোর-জোচ্চোর-খুনীরা সমাজ থেকে সোজা এখানে এসে ওঠে। তার পর বিচার হয়। তারপর সোজা ফাঁসীতে—না হয় অন্য কোন সাজায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজা ঈষৎ ফাঁক হ'ল। সেই স্বল্প উদ্‌ঘাটিত পথে কায়ক্লেশে ভিতরে প্রবেশ করল জেরি।

স্থির হয়ে বসে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলে সে, 'এখন কি চলছে?'

'এখনো আরম্ভ হয়নি।'

'আগে কি হবে?'

'সেই রাজদ্রোহের মামলা।'

'অর্থাৎ সেই পোড়ানো, চোখ ঝলসানো, কিমা-করা তো?'

লোকটি যেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিলে—'হ্যাঁ গো। প্রথমে ফাঁসীতে লটকিয়ে দেবে। জিভ বেরোবার আগেই নামিয়ে নিয়ে তার চোখের সামনেই তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটবে। তারপর পেটের মাল-মসলা বের করে ঝলসিয়ে পোড়াবে। সব দেখবে লোকটা তোয়াজ করে। তারপর শেষ অঙ্কে কুচ করে গলাটা কেটে নেবে। শাস্তিটা মন্দ বাতলায়নি, কি বল?'

'আগে অপরাধী সাব্যস্ত হলে তবে তো?'

'সে ভাবনা নেই বন্ধু। অপরাধী ঠিক হয়েই আছে।'

এতক্ষণে মিঃ লরি তাকে দেখেছেন। মাথা নেড়ে তাকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করে আবার বসলেন। লরির বিপরীতে এক ভদ্রলোক মাথায় পরচুলার রাশ পরে রাশভারী হয়ে বসে আছেন। তাঁর চাল চলন লক্ষ্য করতে লাগল জেরি। লোকটি অবিরত কি যেন খুঁজছেন আদালত-ঘরের ছাদের দিকে। দুটি হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢোকানো। যেন নিরালম্ব ভাব।

এতক্ষণে জজ এলেন। মুহূর্তে উদ্বেল-মুখর জনসমুদ্র নিস্তরঙ্গ বোবা হয়ে গেল। দু'জন প্রহরী এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল আসামীকে।

যে লোকটি নিরন্তর আদালতের ছাদে কি যেন অন্বেষণ করছিলেন, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আসামীর দিকে তাকাল। যেন এক দমক ঝড়ের মত, এক ঝলক আগুনের মত, যেন এক রাশ জলোচ্ছ্বাসের মত সমস্ত জনতার নিশ্বাস গিয়ে পড়ল তার উপর। থামের অন্তরাল থেকে, ঘরের কোণ থেকে, চারিদিক থেকে তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। মানুষটির শরীরের প্রত্যেকটি বিন্দু চিনে নেবার জন্য যেন মুহূর্তে একটা সাজ-সাজ রব পড়ে গেল চারি দিকে।

বছর পঁচিশ বয়স। কালো চোখ। সুশ্রী সুঠাম তরুণ যুবা। দুটি গালে রৌদ্রের তাম্রাভা। সমস্ত অবয়বে নিখুঁত সজ্জনতা। গাঢ় ধূসর বর্ণের সাজ সর্বাঙ্গে। আসামীর কাঠগড়ায় এসে যথাসাধ্য সৌজন্যের সঙ্গে লোকটি জজকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। আজকের পরিবেশে তার মনের ভিতর যত ঝড়ই উঠুক না কেন, তার কপোলের তাম্রাভার ভিতর দিয়ে এমন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল, যা দেখে এটুকু বুঝতে বিলম্ব ঘটে না যে মানুষটির ভিতরে একটি হার-না-মানা সূর্য-আত্মা সদা জাগরূক হয়ে আছে।

যে দৃষ্টিতে আজ জনতা তাকে গিলছিল, তার মধ্যে করুণা ছিল না।

বরং লোকটির অপরাধের গুরুত্ব যদি কম হত, যদি শাস্তির পরিমাণ হ্রাস হবার কোন কারণ ঘটত, তবেই সমবেত জনতার আশাভঙ্গের অন্ত থাকত না। এমন সুন্দর একটি নবীন যুবক-দেহ কি ভাবে অস্ত্রে চাবুকে দড়িতে আগুনে মুহূর্তে মুহূর্তে বিদলিত বিগলিত হবে, তারই উজ্জ্বল প্রত্যাশায় লোকে ধৈর্য ধারণ করে রয়েছে। মানুষের মধ্যে যে আদিম পিশাচ আজও মরেনি, তারই সুস্পষ্ট সদম্ভ আবির্ভাব যেন আজকের এই উত্তেজিত জনতার মধ্যে।

চুপ চুপ! ফালতু আদমি একদম চুপ!

আসামী চার্লস ডার্ণে। গত কাল রাজদ্রোহের অপরাধ অস্বীকার করেছে আসামী চার্লস ডার্ণে। আমাদের মহামান্য ইংরেজ সরকারের সৈন্য-সামন্ত ও সামরিক প্রস্তুতির খবর বিশ্বাসঘাতক আসামী নানা ছলে-কৌশলে বিদেশী ফরাসী-রাজের গোপন দপ্তরে পৌঁছে দিয়েছেন বহুদিন ধরে। এই কাজের জন্য নানা ভাবে নানা সময়ে সে এদেশ থেকে ফরাসী দেশে পাড়ি দিয়েছে। সেই গুরুতর রাজদ্রোহিতার অপরাধে ধৃত আসামী ডার্ণে আজ তার চরম বিচারের সম্মুখীন হয়েছে।

আইনের শত-সহস্র কূট জালের বিস্তারের মধ্যে মূল কথাটি এইটুকুই উদ্ধার করতে পারলে জেরি। এবার এটর্ণী জেনারেলের বক্তৃতা।

যে মানুষটির দেহের সদ্‌গতির কত মধুর কল্পনা লোকের মনে-মনে ফিরছিল, সেই আসামী চার্লস ডার্ণে কিন্তু আদালতের কার্যধারা নীরব প্রশান্তির সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল। তার চারি পাশে আদালতের মেঝেতে নানা ওষধি ভিনিগার ছড়ানো, যাতে আসামীর রোগ কোন ভাবে চারিদিকে না সংক্রামিত হতে পারে।

একবার মুখ ঘোরাতেই আসামীর দুটি চক্ষু স্থির নিবদ্ধ হয়ে গেল। তার সেই ভাবান্তর লক্ষ্য করা মাত্রই সমস্ত আদালতের চোখ ঠিকরে পড়ল আসামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে দুটি নারী-পুরুষের উপর।

দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে একটি বছর কুড়ির মেয়ে তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে বসেছিল। লোকটির চুল যেন ধবল গিরি। সমস্ত মুখে কি এক প্রগাঢ়তা যা অনির্বচনীয়। সে প্রগাঢ়তা কর্মে নয়, মর্মে। যতক্ষণ মানুষটি মৌন হয়ে বসেছিলেন, তাঁর সব কিছুর মধ্যে যেন জীর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এখন কন্যার সঙ্গে কথা কইছেন, মুখের সেই নিস্তরঙ্গ গাঢ়তা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এখন দেখে মনে হয়, যেন মানুষটির জীবনের অপরাহ্ণ বেলা এখনো অনেক দূর—সায়াহ্নের প্রশ্নই ওঠে না।

পিতার একখানি হাতের উপর নিজের কোমল করতল রেখে মেয়েটি অবাঙময়ী হয়ে বসে আছে। অপরাধীর প্রতি গভীর করুণায় যেন তার মন আদ্র হয়ে উঠেছে, সারা মুখে সেই স্নিগ্ধতা। আসামীর ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে সে বাপের খুব কাছ ঘেঁসে বসে আছে। এই দুটি পিতা-পুত্রীর দিকে তাকিয়ে জনতার মুখে একটি মাত্র প্রশ্ন—'কারা ওরা ?'

এক মুখ থেকে আর এক মুখে। এমনি করে জেরি অবধি সেই প্রশ্ন ও উত্তর কানাকানি হয়ে এল।

'কারা ?'

'সাক্ষী ?'

'কোন্ পক্ষে।'

'বিপক্ষে।'

'কার বিপক্ষে '?

'আসামীর।'

এতক্ষণ পরে জজ স্থির হয়ে আসনে বসলেন। তাকালেন আসামীর দিকে।

এটর্ণী জেনারেল বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন আসামীর দিকে। যাকে নির্বিঘ্নে ফাঁসীতে লটকিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর।

৩

বয়স কম হলেও লোকটি যে রাজবিরোধী চক্রান্তে পাকা, সে কথা জুরীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এটর্ণী জেনারেল বললেন যে, মৃত্যুই এই গুরুতর অপরাধের শাস্তি। এই ধরণের লোকটি বহু দিন ধরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যাতায়াত করে আসছে। অথচ সে অপরাধ অস্বীকার করে তার গতিবিধির কোন সদ্ যুক্তিও দেখাতে পারেনি। কেবল জীবন ধারণের প্রয়োজনে লোকটি যদি এই দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত থাকত (ভগবৎ কৃপায় যা বাস্তব নয়) তবে কোন দিনই এই গোপন চক্রান্ত হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়ত না। ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী পরম কৃপাভরে এক জন নির্ভীক সত্যবাদী প্রজার মারফৎ আসামীর এই জঘন্য গুপ্ত চক্রান্তকে চীফ সেক্রেটারীর কাছে প্রকাশিত করে দিয়েছেন। সেই পরম দেশভক্তকে আমরা এখুনি দেখতে পাব। মানুষটি তার কর্তব্য পালনে যে মহান্ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। আসামীর বন্ধু ছিলেন তিনি। কোন এক দুর্লভ মুহূর্তে বন্ধুর এই নোংরা কাজ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন। তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। দেশ-জননীর পবিত্র বেদীমূলে তিনি বন্ধুত্বকে বলিদান দিয়ে এই হীন রাষ্ট্রদ্রোহিতার চরম সমাপ্তি ঘটাতে মনস্থ করেন। প্রাচীন গ্রীক বা রোমের মত সৎ নাগরিকত্বের যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত আমাদের দেশে, তবে এই সজ্জন সেই পুরস্কারের অধিকারী হতেন সন্দেহ নেই। কবিরা যথার্থই বলেন যে, ধর্মাচার সংক্রামক। এক জন অন্য জনকে উদ্বুদ্ধ করে। একথা আরও সত্য দেশ-ধর্ম সম্বন্ধে। সেই দেশভক্ত

এই বিষয়ে আসামীর ভৃত্যকেও অনুপ্রাণিত করেন এবং তারই সাহায্যে আসামীর যাবতীয় কাগজপত্র তল্লাসী করেন। এটর্ণী জেনারেল ব্যক্তিগত ভাবে এই ভৃত্যটিকে নিজের পিতা-মাতার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাভাজন বিবেচনা করেন এবং তার বিশ্বাস যে, মাননীয় জুরীরাও তাকে সেই প্রকার শ্রদ্ধার্হ বিবেচনা করবেন। এই দুই সত্যবাদী নির্ভীক্ দেশভক্তের সাক্ষ্য এবং তল্লাসীতে প্রাপ্ত কাগজ-পত্র—যা কোর্টে এখনি দাখিল করা হবে—তা দেখে মাননীয় জুরীদের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না যে, আসামী মহামান্য সম্রাটের সামরিক গুপ্ত তথ্যের যাবতীয় সংবাদ বিদেশী শত্রু-রাষ্ট্র দপ্তরে পৌছে দিত। এই প্রথম বার নয়। ইতিপূর্বে কত দিন ধরে যে আসামী এই বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে তা ঈশ্বরই জানেন। যদিও এই দলিলগুলি আসামীর নিজের হাতের লেখা কি না, তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তার দ্বারা আসামীর অপরাধের গুরুত্বের কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, আসামী আপন হীন ষড়যন্ত্রের কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করত। ষড়যন্ত্রের কৌশলে সে পাকা শিল্পী। আমেরিকানদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ লাগার পনেরো দিনের মধ্যেই আসামী এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সে আজ পাঁচ বছর পূর্বেকার ঘটনা। এই সকল ঘটনা ও তথ্য বিবেচনা করে জ্ঞানী ও দেশভক্ত জুরী মহোদয়গণ অবশ্যই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে দ্বিধা করবেন না। যত দিন না ঐ দেশদ্রোহীর মাথা নিতে পারছি, আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব না। আমরা পারব না, আমাদের স্ত্রী-পুত্রেরা পারবে না, আমাদের নিম্নতম চতুর্দশ পুরুষ পারবে না। ঈশ্বরের নামে, দেশের নামে এবং সংসারের যাবতীয় পবিত্র বস্তুর নামে এটর্ণী জেনারেল দিব্য করলেন।

এটর্ণী জেনারেলের বক্তৃতার পর আদালতে যেন এক ঝাঁক নীল মাছি

ভন্ ভন্ করতে লাগল। যাবতীয় লোক আসামীর কি পরিণতি ঘটবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

এমন সময় সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন দেশভক্ত। আবার সব চুপচাপ।

সাক্ষীর জেরা সুরু হল। ভদ্রলোক। নাম জন বারসাদ। বক্তব্য শেষ করে সাক্ষী আদালত থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন সদম্ভে, এমন সময় লরির পাশের পরচুলা-পরা লোকটি সাক্ষীকে জেরা করার জন্য জজের কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

'আপনি নিজে কোন দিন গুপ্তচরের কাজ করেছেন?'

'কখনো না। ও-রকম হীন কাজ করাকে আমি ঘৃণা করি।'

'তবে চলে কিসে?'

'সম্পত্তির আয় আছে।'

'সম্পত্তি কোথায়?'

'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কিসের সম্পত্তি?' ব্যবসা জাতীয় কোন জিনিষ?' কার কাছ থেকে পেয়েছেন?'

'দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সম্পত্তি।'

'দূর মানে কত দূর?'

'তা দূর হবে বই কি, বেশ দূর।'

'কোন দিন জেলে ছিলেন?'

'কখনো না।'

'ধার করেও কখনো না?'

'সে কথা উঠছে কেন?'

'ধার করে কখনো জেলে গেছেন কিনা স্পষ্ট স্বীকার করুন। বলুন কখনো যাননি জেলে?'

'হাঁ, গিয়েছি।'

'ক'বার ?'

'দু'-তিন বার হবে বোধ হয়।'

'পাঁচ-ছ' বার নয় তো ?'

'তাও হতে পারে।'

'সামাজিক পরিচয় কি আপনার ?'

'সাধারণ ভদ্রলোক।'

'কখনো কারুর বুটের লাথি খেয়েছেন ?'

'হতেও পারে।'

'প্রায়ই লাথি খান ?'

'না।'

'কখনো কেউ লাথি মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছিল ?'

'কখনো না। একবার সিঁড়ির মাথায় এক জন লাথি মেরেছিল বটে, কিন্তু নীচে গড়িয়ে পড়েছিলাম নিজের ইচ্ছাতেই।'

'জুয়ায় জোচ্চুরী করার জন্যই কি লাথি খেয়েছিলেন ?'

'মাতাল বজ্জাতটা তাই বলেছিল বটে, কিন্তু সে বেবাক মিথ্যে।'

'ডাহা মিথ্যে কথা ?'

'মিথ্যে বই কি।'

'জুয়ায় কখনো জোচ্চুরী করেননি ?'

'ভদ্রলোক যা করে তার বেশী কোন দিন করিনি, শপথ করছি।'

'আসামীর কাছে কখনো টাকা ধার করেছিলেন ?'

'করেছিলাম।'

'কখনো ধার শোধ করেছেন ?'

'না।'

আসামীর সঙ্গে আপনি যে বন্ধুত্ব করেছিলেন সে কি তার পয়সায় পানাহারের বাসনায়?'

'না।'

'ঐ কাগজপত্রগুলোই আসামীর কাছে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ও সম্বন্ধে আর কিছু জানেন?'

'না।'

'যদি কেউ বলে ও গুলো আপনিই জোগাড় করেছিলেন?'

'আমি? আমি নয়।'

'সাক্ষী দিয়ে কিছু পাবার আশা আছে?'

'না।'

'লোককে জালে ফেলবার জন্যে সরকারের কাছে মাস-মাহিনা ব' ঐ রকম কিছু পান নাকি?'

'কখনো না।'

'অন্য কিছু মতলব আছে এর পেছনে?'

'না।'

'শপথ করছেন তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'নিছক দেশপ্রেমের তাগিদেই সাক্ষী দিতে এসেছেন? অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?'

'কিছু মাত্র না।'

তারপর আসামীর ভৃত্যের সাক্ষ্য।

৩

বছর চারেক আগে সে আসামীর কাছে কাজ নিয়েছিল। একবার জাহাজে যখন দেখা হয় তখন আসামী তাকে একজন কাজের লোকের সন্ধান দিতে বলে। তার ফলেই সে আসামীর কাছে চাকরী নেয়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আসামীর চাল-চলনে তার সন্দেহ হতে থাকে। তখন থেকে সে তার কাগজপত্র কাপড়-চোপড় সব কিছুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সুরু করে। এই ধরণের কাগজ ইতিপূর্বে বহু বার সে আসামীর কাছে দেখেছে। আসামীর টেবিলের ড্রয়ার থেকে এগুলিকে উদ্ধার করেছিল সে। টেবিলে আগে সে রাখেনি। এই ধরণের খসড়াও ফরাসীদের কাছে দেখাতে বহু বার দেখেছে সে আসামীকে। ইংল্যাণ্ডকে সে ভালবাসে। স্বদেশের এই অহিত প্রাণ ধরে করতে পারবে না বলেই সে আসামীর গুপ্ত চক্রান্ত সব ফাঁস করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী সাক্ষীকে গত সাত বছর ধরে সে চেনে। তার মধ্যে কোন আচম্বিতের প্রশ্নই ওঠে না। সব পরিচয়ের মধ্যেই খানিকটা আচম্বিত থেকেই যায়। নিছক দেশপ্রেমের তাগিদে সেও সাক্ষী দিতে এসেছে। অন্য কোন অভিসন্ধি তার নেই।

সাক্ষী থামতেই সারা আদালতে আবার জনতার ভনভনানি সুরু হল।

তারপর লরির সাক্ষ্য।

'আপনি টেলসন ব্যাঙ্কের কেরাণী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অমুক তারিখ শুক্রবার রাতে ব্যাঙ্কের কাজে আপনাকে লণ্ডন থেকে ডোভার অবধি ডাক-গাড়ীতে যেতে হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ডাক-গাড়ীতে আর কোন যাত্রী ছিল ?'

'আরো দু'জন ছিলেন।'

'তাঁরা রাত্রে পথেই নেমে পড়েছিলেন মনে আছে ?'

'তা আছে।'

'মিঃ লরি, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন তো। সেই দু'জনের একজন উনি কিনা ?'

'সে আমি হলফ করে বলতে পারব না।'

'সেই দু'জন যাত্রীর কারুর সঙ্গে আসামীর মিল আছে কি ?'

'দু'জনেই মুড়িশুড়ি দিয়ে ছিলেন। রাত ছিল অন্ধকার। সকলেই আমরা এত আত্মমগ্ন ছিলাম যে, সেকথাও আমি হলফ করে বলতে পারব না।'

'মিঃ লরি, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধরুন, আসামী সেই দু'জন যাত্রীর মত মুড়িশুড়ি দিয়েছে, তাহলে অন্ধকারে তাকে কি তাদের একজনের মত মনে হতেও পাবে ?'

'না।'

'কিছুতেই তাকে এদের একজন মনে করতে পারেন না ?'

'না।'

'হলেও হতে পারে অন্ততঃ এ-কথা বলতে আপনি রাজী আছেন ?'

'হতেও পারে। শুধু এ-কথা আমি আদালতকে জানিয়ে দিতে চাই যে, ডাকাতদের ভয়ে সে-রাত্রে আমরা সবাই যে রকম ভয়কাতর হয়ে পড়েছিলাম, আসামীর মুখে-চোখে তেমন কোন সন্ত্রাসের লক্ষণও আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'মিঃ লরি, আপনি কখনো মেকী ভীরুতা দেখেছেন ?'

'দেখেছি বই কি।'

'মিঃ লরি, আবার আসামীর দিকে চেয়ে দেখুন। আপনার জ্ঞানে একে আগে কখনো দেখেছেন কি ?'

'দেখেছি।'

'কখন ?'

'কয়েক দিন বাদে আমি যখন ফ্রান্স থেকে ফিরছিলাম, আমি যে জাহাজে ফিরি আসামীও সেই জাহাজে ওঠে। আমরা একসঙ্গেই আসি।'

'আসামী কখন জাহাজে উঠেছিল ?'

'মাঝ রাত্রের একটু পরে।'

'নিশীথ রাত্রে ? এমন অসময়ে জাহাজে বুঝি আসামী একাই ওঠে ?'

'ঘটনাচক্রে তাই বটে।'

'ঘটনাচক্রের কথা ছেড়ে দিন। সেই মাঝ রাত্রে আসামীই একমাত্র যাত্রী ছিল কি না বলুন ?'

'হ্যা।'

'আপনি কি একা ভ্রমণ করছিলেন, না সঙ্গে কেউ ছিল ?'

'দু'জন সহযাত্রী ছিলেন। একজন পুরুষ আর একজন নারী। তাঁরাও এখানে উপস্থিত আছেন।'

'বটে ? আসামীর সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়েছিল ?'

'ঝোড়ো রাত। তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ দীর্ঘ সমুদ্রপথ আমি সোফায় শুয়েই কাটিয়েছিলাম।'

'মিস্ লুসি ম্যানেট ?'

যে মেয়েটির দিকে পূর্বেই একবার সকলের দৃষ্টি পড়েছিল, সেই

মেয়েটি আসন থেকে উঠে দাঁড়াতেই সকলের নজর ফিরে গিয়ে পড়ল তার উপর। মেয়ের হাত নিজের বাহুলগ্ন করে বৃদ্ধ পিতাও তাঁর আসনে উঠে দাঁড়ালেন।

'মিস্ ম্যানেট, আসামীর দিকে চেয়ে দেখুন।'

একরাশ জনতার কুতূহলী চোখের সামনে যা হয়নি এতক্ষণে তাই হল। ঐ অপূর্ব লাবণ্য-মমতা-ভরা দুটি স্নিগ্ধ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আসামীর ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইলে না। সে আর এ মেয়েটি। মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান। তবু আদালত ভরা লোকের সামনে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টায় ছেলেটির দ্রুত নিশ্বাসের সঙ্গে ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল থর-থর করে। মুখ থেকে রক্তের জোয়ার নেমে গেল।

আবার জনতার গুঞ্জন উঠল।

'দেখুন তো, আসামীকে আগে কখনো দেখেছেন কি না?'

'দেখেছি।'

'কোথায়?'

'এই মাত্র যে জাহাজের কথা হচ্ছিল সেই জাহাজে।'

'আপনিই তবে?'

'আমার দুর্ভাগ্য!'

জজ ধমক দিলেন।

'যা প্রশ্ন করা হচ্ছে ঠিক ঠিক তার উত্তর দেবে। বাচালতার দরকার নেই।'

'আসামীর সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি কথা হয়েছিল আদালতকে বলুন।'

'ভদ্রলোক যখন জাহাজে এলেন—'

'তুমি আসামীর কথা বলছ ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে বল, আসামী।'

'আসামী যখন জাহাজের ডেকে এলেন'—বাপের দিকে মমতার দৃষ্টি মেলে মেয়েটি বললে—'তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেন যে আমার বাবা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল। সে রাত্রে আমরা চার জন ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না জাহাজে। সেই ঝড়-বাদলের হাত থেকে বাবাকে কি ভাবে নিরাপদে রাখব সে কথা ভেবে আমি অত্যন্ত কাতর হয়েছিলাম। উনি সে-সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনিই সে রাত্রে অযাচিত ভাবে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এই ভাবেই সূত্রপাত হয় আমাদের আলাপের।'

'এক মিনিট। আসামী কি একা জাহাজে এসেছিল?'

'না।'

'আর কে তার সঙ্গে ছিল?'

'দু'জন ফরাসী ভদ্রলোক।'

'তারা কি কিছু আলোচনা করেছিল নিজেদের মধ্যে?'

'জাহাজ ছাড়া অবধি ওরা কথাবার্তা বলেন।'

'এই কাগজপত্রের মত কিছু দিতে দেখেছিলে তুমি?'

'দেখেছিলাম বটে কতকগুলি কাগজপত্র। কিন্তু কি কাগজপত্তর আমি জানি না।'

'এই রকম?'

'হলেও হতে পারে। আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ওরা কথাবার্তা বলছিলেন বটে, তবে কি বলছিলেন কিছুই শুনতে পাইনি আমি। শুধু লক্ষ্য করেছিলাম তাঁরা কাগজপত্রগুলি দেখছিলেন।'

'আসামীর সঙ্গে আর কি কথা হয়েছিল?'

'আসামী আমাদের সঙ্গে প্রাণখোলা কথা বলেছিলেন। হয়ত

আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে ওঁর মনে দয়া হয়েছিল। তিনি আমাদের সঙ্গে যে রকম স্নিগ্ধ-সদয় ব্যবহার করেছিলেন, আশা করি—' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি—'আজকে তাঁর ক্ষতি করে সে দয়ার প্রতিদান যেন না দিতে হয় আমাকে।'

আবার গুন্‌গুনানি।

'আসামী আমাকে জানান যে ভারী একটি বিপজ্জনক গোপনীয় কাজে তিনি যাচ্ছেন। এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকায় তিনি নাম ভাঁড়িয়েই চলেছেন। সেই কাজের তাগিদে তিনি কয়েক দিনের জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিলেন—হয়ত কিছু কাল ধরে কয়েক দিন অন্তর-অন্তর তাঁকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পাড়ি দিতে হতে পারে।'

'আমেরিকা সম্বন্ধে আসামী তোমাকে কোন কথা বলেছিল কি? ঠিক ঠিক বলবে।'

'কি ভাবে ঝগড়ার স্ত্রপাত হয় সেইটাই তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তার মতে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এ কলহে নানা অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা। ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন যে, জর্জ ওয়াশিংটন হয়ত বা ইতিহাসে তৃতীয় জর্জের মতই প্রাধান্য লাভ করবেন। অবশ্য এ-সব কথা সময় কাটানোর জন্য ঠাট্টার ছলেই তিনি বলেছিলেন। কোন দুরভিসন্ধি ছিল না তাঁর।'

যে গভীর আবেগ নিয়ে মেয়েটি সাক্ষ্য দিল, তার আলোড়ন আদালতের বিচারক থেকে দর্শক-সাধারণ অবধি সকলের মনেই সাড়া জাগাল। বিশেষ করে ওয়াশিংটন সম্বন্ধে আসামীর মন্তব্য শুনে বিচারক একবার চকিত হয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে।

এ্যাটর্নী জেনারেল এবার বৃদ্ধকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করলেন।

'ডাঃ ম্যানেট, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন তো! একে আগে আর কখনো দেখেছেন?'

'মাত্র একবার। তিন কি সাড়ে তিন বছর আগে লণ্ডনে যখন সে আমার বাসায় এসেছিল ?'

'ডাক-জাহাজে ওই কি আপনার সহযাত্রী ছিল যার সঙ্গে আপনার মেয়ের আলাপ হয়েছিল ?'

'না।'

'লোকটিকে সনাক্ত করতে না পারার আপনার বিশেষ কোন কারণ আছে ?'

'আছে'—নীচু গলায় বললেন তিনি।

'বিনা বিচারে বিনা অভিযোগে নিজের দেশে দীর্ঘ কারাবাসের দুর্ভাগ্য হয়েছিল কি আপনার, ডাক্তার ?'

'দী-র্ঘ কা-রা-বা-স !'—কথাটা এমন বিলম্বিত উচ্চারণ করলেন তিনি যে, সবার হৃদয় স্পর্শ করল।

'ঐ ঘটনার দিনই কি আপনি সম্যমুক্তি পেয়েছিলেন ?'

'এরা তাই বলেছে আমাকে।'

'আপনার কি কোন কথাই স্মরণ নেই ?'

'না। আমার মন শূন্য সাহারা। নিজের মেয়ের সঙ্গে আমার কি ভাবে পরিচয় ঘটে, কি করে সে আমায় লণ্ডনে নিয়ে আসে, কিছুই আমার মনে পড়ে না। মেয়েকে চিনতে পারার স্মৃতিশক্তি যে ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেও তাঁর অসীম দয়া। নইলে আর কিছুই আমার মনে পড়ে না - সব কিছুরই খেই হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

এ্যাটর্নী জেনারেল আসন নিতেই পিতা-পুত্রীও আসন নিল।

পাঁচ বছর আগে নভেম্বরের এক রাত্রে আসামী কয়েক জন ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে, যাদের কোনই পাত্তা পাওয়া যায়নি, ডোভারগামী জাহাজে উঠেছিল। সেই রাত্রেই সে এক জায়গায় নামে এবং সেখান থেকে বারো মাইল পথ অতিক্রম করে একটি জাহাজঘাটা ও সেনা-

ছাউনির খবরাদি সংগ্রহ করে। সেই সেনা-নগরীর একটি হোটেলের কফিখানায় আর একজন লোকর জন্য অপেক্ষা করছিল আসামী ঐ সময়ে। সে কথা প্রমাণ করার জন্য একজন সাক্ষীকে ডাকা হল আসামীকে সনাক্ত করতে।

আসামী পক্ষের উকিল সাক্ষীকে জেরা করতে সুরু করলেন। জেরায় এইটুকু মাত্র জানা গেল, সাক্ষী সেই দিন ভিন্ন আর কখনো আসামীকে দেখেনি। এই সময় পরচুলা-পরা যে ভদ্রলোকটি মিঃ লরির সম্মুখে বসে এতক্ষণ আদালতের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ছিলেন, তিনি ছোট্ট একটি কাগজে কি দুটি-একটি কথা লিখে কাগজটি পাকিয়ে উকিলের কাছে ছুঁড়ে দিলেন। কাগজটি খুলে পড়তেই উকিলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবাক মনোযোগের সঙ্গে তিনি তাকালেন আসামীর দিকে।

'আপনি ঠিক বলছেন আসামীই সেই লোক?'

সাক্ষী স্থির-নিশ্চিত এ সম্বন্ধে।

'আসামীর মত দেখতে আর কখনো কাউকে দেখেছেন কি?'

'গরমিল হবার মত কাউকে দেখিনি।'

'ভাল করে ঐ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে দেখুন তো।'

যে ভদ্রলোক কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাঁকে দেখিয়ে উকিল বললেন—'তারপর আসামীকেও দেখুন। দু'জনে কি একই রকম দেখতে?'

ভদ্রলোকের দিকে চোখ ফেরাতেই কেবল সাক্ষীই নয় আদালত শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। মহামান্য বিচারকের আদেশে ভদ্রলোক মাথার পরচুলা খুলে ফেলতে সবাই দেখলে আসামীতে আর কার্টনেতে কোন পার্থক্য নেই চেহারার। জজ তখন সাক্ষীর উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এই ভদ্রলোক অর্থাৎ মিঃ কার্টনকে জেরা করবেন কি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে?

'না তার দরকার নেই।'

'তাহলে সাক্ষী কা'কে সনাক্ত করতে চান আসামী বলে?'

এই নাটকীয় পরিণতিতে সাক্ষী, মামলা, ষড়যন্ত্র সব যেন এক ধাক্কায় মৃৎপাত্রের মত গুঁড়িয়ে গেল।

আসামী পক্ষের উকিল এবার জুরীদের কাছে মামলার সওয়াল আরম্ভ করলেন। ঐ বারসাদ লোকটা ভাড়াটে গোয়েন্দা আর বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কিছুই নয়। আসামীর ধার্মিক ভৃত্যটিও এর বন্ধু ও সহযোগী হয়েছে আর এই দুই জালিয়াতে মিলে আসামীকে শিকার হিসেবে বেছে নিয়েছে। আসামী ফরাসী। পারিবারিক কারণে তাকে মাঝে মাঝে এদেশে আসতে হয়। সে-পারিবারিক কারণ সে জীবন বিনিময়েও বলতে নারাজ। নির্মম জেরায় ঐ মেয়েটির মুখ থেকে আদালত যা খবর পেলেন তাতেও আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। জাতীয় স্বার্থের এই ধরণের জঘন্য ধুয়া তুলে এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করে সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা যে-কোন গভর্ণমেণ্টরই দুর্বলতার পরিচায়ক। এ্যাটর্নী জেনারেল এ নিয়ে আতিশয্যের চূড়ান্ত করেছেন। এই মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ হয়নি।

এর পর এ্যাটর্নী জেনারেল ও স্বয়ং বিচারক অবতীর্ণ হলেন আসরে এবং আইনের ভাষায় আসামীর শোক-গাথা শোনালেন।

তার পর জুরীরা উঠে গেলেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে।

কার্টন এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে কড়িকাঠ গুণছিলেন বটে, কিন্তু নির্লিপ্ততা দেখালেও আদালতের প্রতিটি খুঁটিনাটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তার। মেয়েটির মাথা বৃদ্ধ বাপের বুকে টলে পড়ল তিনিই প্রথম দেখতে পেলেন। সমুচ্চ কণ্ঠে তখুনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'অফিসার, ধরুন। ওকে ধরাধরি করে বাইরে হাওয়ায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। দেখতে পাচ্ছেন না মেয়েটি পড়ে যাবে।'

'বৃদ্ধ ও তার কন্যা আদালত-গৃহ ত্যাগ করলেন।

সন্ধ্যা আসন্ন। জুরীরা এখনও একমত হতে পারেননি। আরো দেরী হবে জেনে আদালত-কক্ষে আলো জেলে দেওয়া হল। দর্শকেরা যে যার মত ঘুরে আসতে গেল। আসামীও এতক্ষণে কাঠগড়ার পিছনের ঘরে গিয়ে বসল।

বাপ ও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে লরিও বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জেরিকে নিকটে আসতে ইংগিত করলেন।

'জেরি, তুমি বরং এই বেলা কিছু খেয়ে এস। আর কাছেই থেক। জুরীরা এলে রায় শুনতে পাবে। তারপর কিন্তু এক মুহূর্ত দেরী করো না। যত তাড়াতাড়ি পারবে মামলার রায় ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিতে হবে। আর এ কাজ তোমার চেয়ে তাড়াতাড়ি কেউ করতে পারবে না জানি। আমার অনেক আগেই পৌঁছে যাবে তুমি।'

কার্টন লরির বাহু স্পর্শ করে বললেন—'এখন কেমন আছে?'

'ভারী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কোর্টের বাইরে গিয়ে এখন অনেক সুস্থ বোধ করছে।'

'আসামীকেও তাই বলেছি আমি। আপনার মত ব্যাঙ্কের কর্মচারীর পক্ষে সকলের সামনে আসামীর সঙ্গে কথা বলা সমীচীন হবে না।'

এ কথা শুনে লরির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

আসামীর কাঠগড়ার সম্মুখে এসে কার্টন ডাকলেন—'মিঃ ডার্নে?'

আসামী সোজাসুজি এগিয়ে এল।

'মিস্ ম্যানেট কেমন আছেন জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক আপনার পক্ষে। ভালই আছে সে।'

'আমিই এর কারণ জেনে খুবই দুঃখিত। আমার হয়ে এ কথা বলবেন তাকে।'

'বলব।'

কতক্ষণ ঘোরাঘুরির পর জেরি যখন ফিরল, দরজার কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেল লরি তাকে ডাকছেন।

'এই যে স্যার।'

ভিড়ের মধ্য দিয়ে লরি জেরির হাতে একখানি কাগজ গুঁজে দিলেন।

'খুব তাড়াতাড়ি।'

কাগজের উপর দ্রুতহস্তে লেখা—'বেকসুর খালাস।'

৪

আদালতের প্রাঙ্গণ নির্জন হয়ে এসেছে। অধালোকিত বারান্দায় ডাক্তার ম্যানেট ও লুসি, মিঃ লরি ও আসামী পক্ষের কৌঁসুলী ষ্টিভার সত্যমুক্ত চার্লস্ ডার্ণেকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন।

একদিন স্তিমিত আলোয় দেখা প্যারিসের পাঁচ তলার গুদাম-ঘরের জুতা তৈরীর পাগলামীতে লিপ্ত ডাক্তারকে আজ আর চেনাই যায় না। কেবল এক-এক সময় মর্মান্তিক স্মৃতি মনের ভিতরে অতীত বেদনাকে জাগিয়ে তোলে, তখন বহু দূরের এক পাষাণ কারা-প্রাচীরের নির্মম ছায়া পড়ে সেই মুখে। মানুষটিকে তখন একান্ত অসহায় মনে হয়।

শুধু লুসি সেই যাদু জানে। মায়ের এই ক'টি বৎসরের মর্মান্তিকতাকে ছাপিয়ে দূর অতীতের মাধুরীর সঙ্গে বর্তমানের স্নিগ্ধতাকে এক স্বর্ণসূত্রে সে যেন গেঁথে রেখেছে। তার কণ্ঠের মধু, তার মুখের অনির্বচনীয় যাদু, তার হাতের মায়া পিতার অন্তরে নব জীবনের সঞ্চার করেছে।

লুসির হাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে ডার্ণে তার কৃতজ্ঞতা জানাল। তার পর উকিল ষ্টিভারের দিকে ফিরে তাঁকেও ধন্যবাদ দিল। ষ্টিভারের বয়স ত্রিশের কিছু ওপরে, কিন্তু ইতিমধ্যেই পসার জমিয়েছেন চমৎকার।

ওকালতী চালে আসামীর পরামর্শদাতা হিসেবে লরিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন—'আপনাকে যে সসম্মানে খালাস করে আনতে পেরেছি—'

'আপনি আমাকে চির জীবনের মত কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করলেন।'

'আপনার জন্য যথাসাধ্য করেছি। মানে অনেকেই যা করে থাকে।'

'অনেকের চেয়ে বেশীই বলুন'—মন্তব্য করলেন লরি।

'আপনিও তাই বলেন? আপনি সারাক্ষণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন, আপনি জানবেন বই কি। তাছাড়া আপনি ব্যবসাদার লোক।'

'সে যাই হোক, আমার আবেদন৷ আজকের মত সভা ভঙ্গ হোক। লুসিকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে। মিঃ ডার্ণের পক্ষেও সাংঘাতিক দিন গেছে। আমরাও ক্লান্ত।'

'আপনি নিজের কথা বলুন। আমাব এখনও হাতের কাজ বাকি। সারা রাত কাজ করতে হবে।'

ডার্ণের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ডাঃ ম্যানেট যেন নিথর হয়ে আছেন। অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণায় ভ্রূকটি-কুটিল সে-মুখের চাহনি অন্তর্ভেদী। মনের ভাবনাগুলিও দিশেহারা।

তাঁর হাতে হাত রেখে ডাকল লুসি – 'বাবা!'

তিনি যেন ধীরে-ধীরে ভাবনা সরিয়ে দিলেন দূরে। তারপর মেয়ের দিকে তাকালেন।

'বাড়ী যাবে?'

'যাব মা।'

গলির প্রায় সবগুলি আলোই নিবেছে। এবার আদালতের গেটও সশব্দে বন্ধ হল। নিরানন্দ আদালত-প্রাঙ্গণ জনশূন্য। ঘোড়ার গাড়ী ডেকে বাপ ও মেয়ে বিদায় নিল।

স্ট্রাইভারও চলে গেলেন।

যে-লোকটি এতক্ষণ এই দলে যোগ দেননি, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলেননি, যিনি ছায়া-ঘন দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিঃশব্দে সবার পিছনে— এতক্ষণে তিনি এগিয়ে এলেন এবং যতক্ষণ না ঘোড়ার গাড়ীটি অদৃশ্য হল তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। তার পর ডার্নে ও লরি রাস্তায় যেখানে দাঁড়িয়েছিল এগিয়ে এলেন সেখানে।

'মিঃ লরি, ব্যবসাদার লোকেরা এবার মিঃ ডার্নের কথা বলতে পারবে।'

'ব্যবসাদারের মন যখন ব্যবসা আর হৃদয়াবেগের মধ্যে দোল খায়, তখন সেখানে যে কী লড়াই চলে জানলে আপনি আশ্চর্য হবেন মিঃ কার্টন।'

কার্টনের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

'সে কথা তো একবার বললেন! ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে মন আমাদের নিজেদের নয়। নিজের চেয়ে অফিসের ভাল-মন্দের কথাই ত বেশী ভাবতে হয় আমাদের।'

'তা জানি। ও তো জানা কথা'—উদাসীন ভাবে বললেন কার্টন—'মিছে বিব্রত হবেন না। সবার মত আপনিও যে সজ্জন লোক সন্দেহ নেই। বরং অনেকের চেয়েই ভাল, আমি বলব।'

কার্টনের মুখে মদের গন্ধ—খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন না তিনি। ডার্নেকে বললেন,— 'এক অদ্ভুত দৈব বিড়ম্বনায় আমরা আজ দু'জনে মুখোমুখি হয়েছি। আজকের এই রাত নিশ্চয় অদ্ভুত ঠেকছে আপনার কাছে। নিজেরই প্রতিচ্ছায়া শান-বাঁধান রাস্তায় সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে কথা যাক্ বড়ো দুর্বল মনে হচ্ছে আপনাকে।'

'দুর্বল। হ্যাঁ, দুর্বল বোধ করছি বড্ড।'

'কিছু খেয়ে শরীরটা তাজা করে নিন না কেন? ওই লোকগুলো যখন আপনাকে ইহলোক না পরলোক, কোন্ লোকের বাসিন্দা করবে

ভেবে মাথা ফাটিয়ে ফেলছিল, সেই ফাঁকে আমি কিছু খেয়ে নিয়েছি। চলুন কাছে পিঠের একটা সরাইখানা দেখিয়ে দি।'

ডার্ণের হাত ধরে ফ্লীট ষ্ট্রীটে নিয়ে এলেন কার্টন। সেখান থেকে গলিপথে হোটেলে। একটি ছোট ঘরে আস্তানা নিলেন দু'জনে। সামান্য কিছু আহার ও সুরা পানে লুপ্ত শক্তি ফিরে পেলো ডার্ণে। কার্টন একই টেবিলে পোর্টের বোতল খুলে তার মুখোমুখি বসলেন। আজ সারা দিন ঝড় বয়ে গেছে শরীর মনের উপর দিয়ে। এখন আশ্চর্য এক রকম দেখতে তারই প্রতিলিপির সামনে বসে—মনে একটা স্বপ্নের কুহেলী সৃষ্টি হল যেন। 'নিজেকে এতক্ষণে এই পৃথিবীরই লোক মনে হচ্ছে তো? আঃ, সে চিন্তাও কত আনন্দের!'—কেমন যেন তিক্ত কণ্ঠে বললেন কার্টন। তার পর বড়ো এক গ্লাস মদ ঢেলে বললেন—'আর আমি—এ সংসারকে ভুলতে পারলেই আমি বাঁচি। এ জগতে মদ ভিন্ন আর কোন কিছুতেই কোন আস্থা নেই, আসক্তি নেই আমার। সে সব আমি চাই না। দরকারও নেই। আপনাতে-আমাতে, সত্যি বলতে কি, দেহে যতই সাদৃশ্য থাক, মনের দিকে কোন মিলই নেই।'

'খাওয়া তো হল। আসুন, এবার কোন মনের মানুষের প্রীতি কামনায় তার স্বাস্থ্য পান করা যাক।'

'মনের মানুষ? কিন্তু কাউকেই তো মনে পড়ছে না।'

'তার নাম তো আপনার ঠোঁটের গোড়ায় লেগে আছে।'

'লুসি ম্যানেটের কথা বলছেন?'

'তারই কথা বলছি'—

সঙ্গীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কার্টন সুরার পাত্র তুললেন। তার পর গ্লাসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তার পিছনে। দেয়ালে আঘাত খেয়ে গ্লাসটা খান-খান হয়ে গেল। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে আর একটা পাত্র আনতে বললেন।

'অন্ধকার গাড়ীতে তুলে দেয়ার পক্ষে মেয়েটি খাসা সুন্দরী বলতে হবে'—নূতন পানপাত্রে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন কার্টন।

ডার্নের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

'লুসি ম্যানেটের মত মেয়ে করুণা করবে, কাঁদবে—ভাবতে মন্দ লাগে না। ওর করুণা-মমতার জন্যে বুঝি বা প্রাণ-বিপর্যয়ও সহ্য হয়। কি বলেন আপনি? সত্যি নয়?'

ডার্নে একটি কথারও উত্তর দিলে না।

'আপনার মুখের কথায় কি যে খুশী হয়েছিল সে! অবশ্য ভাবে না দেখালেও, বুঝতে দেরী হয়নি আমার।'

এই ইংগিতে ডার্নের মনে পড়ে গেল যে এই অপ্রিয় লোকটিই আজ স্বেচ্ছায় তাঁর সাহায্যেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—স্মরণ হতেই ডার্নে তাকে ধন্যবাদ দিলে পরম কৃতজ্ঞতা ভরে।

'আমি না ধন্যবাদের প্রত্যাশী না কৃতিত্বের'—উদাসীন উত্তর দিলেন কার্টন—'কিছুই করবার ছিল না প্রথমতঃ আর কেন যে করলাম তা নিজেও জানি না। মিঃ ডার্নে, একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।'

'সানন্দে'—

'বলুন তো, আপনাকে খুব একটা পছন্দ করে ফেলেছি এই কথাই কি বিশ্বাস করেন?'

'সে কথা এখনো ভাবিনি'—একটু অপ্রসন্ন কণ্ঠে উত্তর দিল ডার্নে।

'ভেবে দেখুন না একবার।'

'আপনার আচরণে তারই প্রকাশ বটে' –

'আপনার বুদ্ধিবৃত্তির তারিফ করতে হয়—'

দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডার্নে। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় চাইতেই কার্টন কেমন যেন বেপরোয়া কণ্ঠে বললেন—'একটা কথা। আপনি কি আমাকে মাতাল ভেবেছেন?'

'মনে তো হয় আপনি খুবই মদ খাচ্ছেন।'

'মদ? তা খাচ্ছি বই কি?'

'খুব বেশী পরিমাণেই খাচ্ছেন না কি?'

'কিন্তু কারণটাও জানা উচিত। আমি এক সৃষ্টিছাড়া জীব, বন্ধু! সংসার আমায় স্নেহ করে না—আমিও কারুর স্নেহ চাই না।'

'এ ভাল নয়। এমন করে নিজেকে নষ্ট করবেন না।'

'কি জানি। হয়ত আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু নিজেকে একটু সাবধানে রাখবেন বন্ধু। বিদায়, শুভরাত্রি।'

নির্জন ঘরে সিডনী কার্টন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজেকে চুলচেরা করে বিচার করলেন। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে বললেন—'লোকটিকে সত্যই কি ভালবেসেছ? নিজের চেহারার সঙ্গে যার এত মিল তাকেই কেন ভালবাসলে? নিজেকে ভালবাসার কি আছে তোমার? কি আছে বল? কিছু যে নেই সে তো তোমার জানা। কি করেছ তুমি নিজের? কি হতে পারতে আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ তাই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলেই কি এত ভালবাসা? লোকটার সঙ্গে জায়গা বদল করবে? বল না! খুলে বল না তোমার মনের কথা। লোকটাকে ঘৃণাই তো কর?'

ঝড়-লাগা মন মন্দে শান্ত হল। তার পর এল প্রশান্ত ঘুম। হাতে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল মানুষটি। শুধু মাথার রাশীকৃত চুল টেবিলের উপর বিন্যস্ত হয়ে পড়ল। আর বাতির মোম গলে গলে সেই চুলে জড়াতে লাগল।



৫

ডাক্তার ম্যানেটের বাড়ীটি সহরের ভারী নির্জন জায়গায়। মামলার পর চার মাস কাটল। স্মৃতির অতলে অবলুপ্ত হয়েছে সব। এখন ডাক্তারের সঙ্গে পরম হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে লরির। সহরের নির্জন পথপ্রান্তের গৃহটি হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের প্রিয় আনন্দধাম।

রবিবারের এক প্রসন্ন বিকেলে লরি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ডাক্তারের বাড়ীর দিকে। সেই বিশেষ সুন্দর বিকেলটিতে লরি তিনটি কারণে হাঁটতে হাঁটতে এলেন। মধুর অপরাহ্ণ আলোয় খাওয়ার আগে ডাক্তার ও লুসির সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ান তিনি। যেদিন বেড়াতে ভাল লাগে না, ডাক্তারের ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প করেন, বই পড়ে শোনান। এমনি ভাবে সারা দিন কাটে ওঁদের সাহচর্যে। আজ অবশ্য তার কোনটিই নয়। আজ নিজের মনে চিন্তার জট ছাড়াচ্ছিলেন তিনি। তাই হাঁটতে ভাল লাগছিল।

ডাক্তার যেখানে বাস করেন তার মত নিভৃত-নিরালা পরিবেশ লণ্ডনে আর দুটি নেই। একটি বড় নির্জন বাড়ীর তিনটি ঘর নিয়ে থাকেন তাঁরা। পথের এই দিকটিতে রোদ আসে সকালের দিকে। নরম সোনালী মিষ্টি রোদ। দিন যত এগোয় ছায়া পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে। তখন এই অঞ্চলটিকে মনে হয় যেন রৌদ্র-সমুদ্রের নিভৃত বন্দর। যেমন শান্ত তেমনি নির্ভরশীল আশ্রয়।

পুরানো দিনের মত আবার রুগী দেখতে সুরু করেছেন ডাক্তার। যা অর্থাগম হয় তাতে পিতা-পুত্রীর বেশ চলে যায়। আপন চিন্তায়

মশগুল হয়ে চলতে-চলতে লরি এক সময় দেখলেন ডাক্তারের সদর দরজায় কখন পৌঁছে গেছেন।

'এ বাড়ীতে আমি ঘরের লোকের মতই'—ভাবলেন লরি—'নিজেই উঠে যাই।'

বিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও প্রতিটি ঘরের সামান্য আসবাব-পত্রকে সুন্দর করে রচনা করে রেখেছে লুসি। নিজের ঘরটি ভরে আছে পাখী, ফুল, বই, ডেস্ক, টেবিল, রংএর বাক্সে। দ্বিতীয় ঘরখানি রুগী দেখবার জন্য এবং খাওয়ার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করেন ডাক্তার। তৃতীয় ঘরখানি ডাক্তারের নিজের। ঘরের এক কোণে সেই পাঁচ-তলার গুদাম-ঘরের উপকরণ। একদিন যেখান থেকে লরি উদ্ধার করে এনেছিলেন তাঁকে মৃত্যুলোক থেকে প্রাণলোকে। সঙ্গের সেই বেঞ্চি ও জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি সব যত্নে রাখা।

আপন মনে ভাবলেন লরি—'ও-সব মর্মান্তিক স্মৃতি আঁকড়ে থেকে আর লাভ কি?'

'আশ্চর্যের কি আছে এতে?'—অপ্রত্যাশিত পাল্টা প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠলেন লরি।

তাকিয়ে দেখলেন সামনে মিস্ প্রস। ডোভারের হোটেলে একদা পরিচয় ঘটেছিল। তারপর দিনে-দিনে পরিচয় গাঢ় হয়েছে এই মহিলার সঙ্গে।

'কেমন আছেন?'

'ভালই। তুমি আছ কেমন?'

'ভাল আর কই? মেয়েটিকে নিয়েই বড্ড মুশকিলে পড়েছি।'

'কিসের মুশকিল?'

'দিন-রাত লোক আসছে লুসির ভাল-মন্দের খবর নিতে।'

'তাই নাকি।'

'আমি আছি ওর সঙ্গে—মানে, ও আছে আমার সঙ্গে সেই দশ বছর থেকে। খরচা-পত্তর দেয়। সবই সত্যি। কিন্তু তাই বলে এ ধরণের অবাঞ্ছিত লোক-জনের রাত-দিন হামলা আমি সহ্য করতে পারব না। ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে দোব না আমি যাকে-তাকে। একজনকে দেখলাম না যে ওর যোগ্য।'

সব মেয়ের মতই প্রসও যে অসূয়া-পরবশ তা জানেন লরি। কিন্তু তার হৃদয়ের গোপনে একটি নিষ্পাপ নিঃস্বার্থ নারীপ্রাণ আছে যে ভালবাসার ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে চায। সৌন্দর্যের, সুরুচির, যৌবনের সৌভাগ্য নিয়ে যে মেযে জন্মাযনি, সে তার প্রিযপাত্রটির মধ্যেই চায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিছুতেই সে ভালবাসায় অংশীদার সহ্য করতে পারে না।

লরি আসন নিযে বসলেন—'একটা কথা তোমায জিজ্ঞেস করব ? আচ্ছা বল ত, ডাক্তার কি কখনো গল্পচ্ছলে তাঁর কারা-জীবনের স্মৃতির উল্লেখ করেন ?'

'না'

'তবুও ঐ বেঞ্চ যন্ত্রপাতি রেখে দিয়েছেন ?'

'মনে-মনে যে ভাবেন না একেবারে বলা যায না।'

'বেশী ভাবেন ?'

'খুব বেশী ?'

লরির দৃষ্টিতে চকিতে যেন লঘু বিদ্যুৎ খেলে গেল—'বল তো মিস প্রস, নিজের কারা জীবন সম্বন্ধে ডাক্তারের নিজের থিযোরী কি ? কার জন্য তাঁর এই নির্যাতন, কে তাঁর নির্যাতনকারী, এ সব কি তিনি জেনেছেন, না জানেন ?'

'লুসির কাছে যা শুনেছি'—

'অর্থাৎ'

'তার ধারণা, ডাক্তার জানেন।'

'এ সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম বলে রাগ করো না। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু ব্যবসাদার লোক—আদার ব্যাপারী।'

'তাই নাকি ?'

এ কথায় মিস্ প্রসের মন অনেকটা নরম হয়ে এল। বললে 'ডাক্তারের মনে সদা আতঙ্ক।'

'আতঙ্ক ?'

'তা নয়। সেই মর্মান্তিক স্মৃতির আতঙ্ক। একবার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল। সব সময় তাঁর ভয় আবার হয়ত স্মৃতি হারাবেন। তাই বোধ হয় ওকথা তোলেন না পারত পক্ষে।'

প্রসের কথার ইংগিতে খুবই বিচলিত হলেন লরি। বললেন—'ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু সে-সব নিজের মনে চেপে রাখাও তো ভাল নয় তাঁর পক্ষে। এই দুশ্চিন্তাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।'

'কিন্তু উপায় নেই'—মাথা নেড়ে বলল মিস্ প্রস—'সে কথা মনে হলেই কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে যান। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তিনি ঘরময় পায়চারী করেন। সাড়া পেয়ে মেয়ে উঠে বাপের কাছে যায়। বাপের পাশে-পাশে থাকে। তাঁর সঙ্গে নিঃশব্দে পায়চারী করতে থাকে। ঘুণাক্ষরেও কোন কথা তোলে না। এক সময় ডাক্তারের মনে উত্তেজনা কমে আসে। মেয়ের সঙ্গ ও ভালবাসার যাদুতে আবার যে-মানুষ সে-মানুষ হয়ে যান।'

কথাবার্তায় ছেদ পড়ল।

'ওঁরা আসছেন'—বলে প্রস উঠে দাঁড়াল—'এইবার মানুষের ভিড় দেখবেন।'

লরিও জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাপ মেয়ের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে সিঁড়িতে।

আজ গরম পড়েছে দুঃসহ। খাওয়ার পর লুসির প্রস্তাব মত সবাই গিয়ে বসল খোলা বাতাসে গাছের ছায়ায়। মৃদু স্বরে গল্প সুরু হল। মাথার উপরে নিরালা গাছের মর্মর-ধ্বনি ডালে-পাতায় বাজতে লাগল।

বাইরের মানুষ-জনের মধ্যে কেবল ডার্ণে এল।

ডাক্তার সাদরে স্বাগতম জানালেন তাকে। লুসিও। শুধু তাকে দেখা মাত্রই প্রসের হঠাৎ গা ও মাথা ব্যথা সুরু হল। সে বিদায় নিয়ে সরে পড়ল।

ডাক্তারকে আজ ভারী প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। এই সব সময় তাঁকে এত অল্প বয়সী দেখায় যে, বাপ ও মেয়ের চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ডাক্তার আজকে সারা দিন নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। অস্বাভাবিক সজীবতায় বাঙয় হয়ে উঠেছেন।

'আচ্ছা ডাঃ ম্যানেট'—ডার্ণে বলল—'টাওয়ারের সব কি দেখেছেন আপনি ?'

'লুসি আর আমি ওখানে গিয়েছি বটে তবে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে।'

'আমি ওখানে গিয়েছি অন্য উদ্দেশ্যে। আমি যখন গিয়েছিলাম এক অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম ওখানকার।'

'কি কাহিনী ?'

'মিস্ত্রিরা কাজ করতে করতে একটা পাতাল-ঘরের সন্ধান পায় যেটি বহু দিন আগে তৈরী হয়েছিল। লোকে তার কথা ভুলেও গিয়েছিল। ঘরটির ভিতরের দেয়ালটি কয়েদীদের লেখায় লেখায় কলঙ্কিত। তারিখ, নাম, অনুযোগ, অভিযোগ, প্রার্থনা, বাণী কত কি লেখা তাতে। দেওয়ালের এক কোণের পাথরে একজন কয়েদী—যে হয়ত পরে ফাঁসী গিয়েছে—তিনটি অক্ষর খোদাই করে গিয়েছিল। কোন দুর্বল যন্ত্রে কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি করা তিনটি বর্ণ। প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল শব্দ তিনটি বুঝি ডি-আই-সি। কিন্তু পরে সতর্ক পরীক্ষায়

প্রমাণ হয় শেষ শব্দটি 'সি' নয় 'জি'। কিন্তু ঐ তিনটি আদ্য অক্ষরযুক্ত কোন বন্দীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে বহু গবেষণার পর স্থির হল, ঐগুলি কোন নামের আদ্যক্ষর নয়। পুরো কথা। 'ডিগ' মানে খোঁড়া। মেঝে খুঁড়ে একটি পাথরের নীচে ছোট চামড়ার ব্যাগে পোড়া কাগজের ছাই পাওয়া যায়। সেই অজানা বন্দী কি লিখেছিল কোন দিনই তার মর্মোদ্ধার হয়নি।'

'তোমার কি হল বাবা?'—উৎকণ্ঠিত মুখে মেয়ে বাপের দিকে তাকালে।

ডাঃ ম্যানেট হঠাৎ হাত মাথায় রেখে চমকে উঠলেন। তাঁর মুখের চেহারা দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়ল।

'না না, ঠিক অসুস্থ নয়। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে তাই চমকে উঠেছিলাম। চল, ভিতরে যাওয়া যাক্।'

প্রায় তখুনিই সামলে নিলেন নিজেকে। সত্যি সত্যিই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। ডাক্তার ম্যানেট হাত দেখালেন। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। কিন্তু তিনি এই গল্প সম্বন্ধে কোন মন্তব্য বা ইংগিত কিছুই করলেন না। ঘরে যেতে যেতে আদালতের প্রাঙ্গণে যেমন দেখেছিলেন ডার্নের উপর স্তম্ভিত ঠিক সেই বিশেষ দৃষ্টির চমক যেন আবার দেখতে পেলেন লরি ডাঃ ম্যানেটের চোখে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডাঃ ম্যানেট শুধরে নিলেন নিজেকে যে, সত্যিই চোখে কিছু দেখেছেন কি না সংশয় উপস্থিত হল লরির।

চায়ের সময় সিডনী কার্টন এসে দেখা দিলেন।

চা পান শেষ করে সবাই জানলার কাছে সরে এল। বাইরে রাত গাঢ় হয়ে এসেছে। লুসি বাবার পাশে বসল। ডার্নে লুসির পাশে। কার্টন জানলায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালেন।

'এখনও বৃষ্টি পড়ছে বড় বড় ফোঁটায় কিন্তু তেজ কমেছে বর্ষার'—বললেন ডাঃ ম্যানেট—'টিপ—টিপ ঝরছে।'

'কিন্তু ঝরছে ঠিক।'

তাঁরা খুব নীচু গলায় কথা বলতে লাগলেন।

রাস্তায় হুড়োহুড়ি ব্যস্ততা—সবাই ঝড়-জলের আগে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানোর জন্য ছুটোছুটি করছে।

ডার্ণে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললে—'শত শত লোক রাস্তায়, তবু নির্জনতা।'

চলমান জনতাব পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

হঠাৎ তুমুল ঝড়-জল ভেঙ্গে পড়ল। কড়-কড় বাজের গর্জনের সঙ্গে সুরু হল চোখ-ঝলসান বিদ্যুৎ-চমকানি। বজ্রনির্ঘোষ, অগ্নিবর্ষণ আর ধারাপাতের বিরাম রইল না। এমনি চলল মাঝরাত পর্যন্ত—তার পর চাঁদ দেখা দিল আকাশে।

সেণ্ট পল্স্ গীর্জায় রাত একটার ঘণ্টা বাজল। লরিকে নিয়ে যাবার জন্য জেরি হাতে লণ্ঠন নিয়ে এসেছে।

'কি বিশ্রী রাত! এ রকম রাতে কবর থেকে মৃতেরা উঠে আসে।' পথ চলতে-চলতে মন্তব্য করলেন লরি।

'এমন রাত আমি কখনো দেখিনি স্যার—দেখতেও চাই নে' উত্তব দিল জেরি।

'শুভরাত্রি মিঃ ডার্ণে। এই রকম রাতে আবার কখনো সবাই একত্র মিলিত হব, এ সৌভাগ্য আর হবে কিনা জানিনা।'

হয়ত হবে। হয়ত চলবে আবার এমনি ধারা জনতার ছুটোছুটি—গর্জন। জনস্রোত ভেঙে পড়বে তাদের উপর দুর্বার মত্ততায়।

৬

রাজদরবারেই কেবল নয়, সারা ফরাসী দেশের অভিজাত সমাজের মধ্যমণি হলেন মঁসিয়ে। কাল সারারাত কেটেছে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সামাজিকতার আহ্বানে। গ্র্যাণ্ড অপেরায় থিয়েটার দেখেছেন সপারিবদ্ধ। তারপর সান্ধ্য-ভোজনের বিরাট পর্ব। রাজকার্যের জগদ্দল দায়িত্বের পর এই সব প্রমোদ-অনুষ্ঠান আছে বলেই মঁসিয়ের মত অভিজাতদের নিশ্বাস ফেলার অবসর ঘটে।

যেখানেই যান সঙ্গে থাকে বিরাট কর্মচারী, খানসামা-বাবুর্চির দল। পান থেকে চূণ খসলে সম্ভ্রম থাকে না। কেবল কর্মচারী-খানসামাদের দেখলেই বোঝা যায় কী বিরাট ধনী মঁসিয়ে। আভিজাত্যের পরিমাপ পাওয়া যায় আহারপর্বের খতিয়ানে, আনুষ্ঠানিকের আড়ম্বরে, বসন-ভূষণের জৌলুষে। কোন একটির ক্ষুণ্ণতা ঘটলে সম্মান-প্রতিপত্তির হানি হয়। তাতে প্রাণ থাকলেও মান থাকে না।

সারা ফ্রান্সের যত ভোজ্য, যত ভোগ্য সব একমুষ্টি অভিজাত আঁক্‌ড়ে বসে আছেন। আর সেই সৌভাগ্যবানদের অন্যতম হলেন ইনি। ভোগ করে করে এই মানুষগুলির উদরের পরিমাণ এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে সারা দেশ গিলে খেলেও হয়ত তাঁদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি ঘটবে না।

সংসারের রীতি সম্বন্ধে মারকুইস উদার মতাবলম্বী। তিনি বলেন, জীবন ও জীবিকা যেমন চলেছে চলুক। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁরা ললাটে ভাগ্যের জয়টীকা পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা ঈশ্বরের বরপুত্র। তাঁরই পবিত্র ইচ্ছায় রাজসুখ উপভোগ করছেন। এ পৃথিবীতে যত প্রাচুর্য সব আমাদের, এ কথা বলেন মঁসিয়ে। বলেন—বিশ্বাসও করেন।

সেদিনকার বিরাট ভোজ-সভায় সমবেত হয়েছিলেন ফ্রান্সের সেরা অভিজাতরা। ঘরের ঐশ্বর্য মোড়া শিল্পরুচির সঙ্গে অতিথিদের প্রসাধন ও রূপসজ্জা যেন এক মধুর ঐক্যতান সৃষ্টি করেছিল। সামরিক রথীরা ছিলেন, যাদের সমর-বিদ্যা সম্বন্ধে অণুমাত্র জ্ঞান নেই। ছিলেন নৌ-অফিসাররা, যারা জাহাজের 'জ' জানেন না। অসামরিক রাজপুরুষরা সম্মানিত করেছিলেন মঁসিয়েকে, যারা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার কোন খবরই রাখেন না। গীর্জার পুরোহিত ও ধর্মের প্রহরীরাও ছিলেন। এঁরাই বোধ হয় পৃথিবীর সর্বাধিক লোভী, কামী, আত্মসুখী-গোষ্ঠী। এঁদের চোখে কামনার নীল আলো। জিহ্বা অসংযত। জীবন যাপন ততোধিক নিন্দার। যে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের এঁরা প্রতিভূ তার যোগ্যতা থাকা তো দূরের কথা, এঁদের সমস্ত সততাই ভণ্ডামি। বাইরের মুখোস মাত্র।

আর ছিলেন ফড়েদের দল। এরা কারুরই প্রতিনিধি নন। সংসারের সোজা সড়কের বাইরে যেখানেই কিছু মুনাফা শিকারের সম্ভাবনা, সেখানেই এই ভাগ্যান্বেষীদের ভিড়। মানুষের আয়ু ও স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে প্রভূত দৌলত জমাচ্ছেন, তেমন এক দল ডাক্তারও ছিলেন আসর উজ্জ্বল করে। রাষ্ট্রের শত পরিকল্পনার মন্ত্রণাদাতার দলও আজকের আসরে অনুপস্থিত ছিলেন না। এঁদের উর্বর কল্পনাশক্তি নব-নব দিকে ধাবিত। কেবল বাস্তবের একখানি পাথর সরিয়ে বসানোর যোগ্যতা বা শক্তি এঁদের নেই।

প্যারিসের অভিজাত ধনী সমাজের একটি ছবি যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছিল মঁসিয়ের ভোজ-সভায়। বাকচতুর দার্শনিকের সঙ্গে আলাপরত বৈজ্ঞানিক। পোষাকী আচার-আচরণে নিটোল মুক্তার মত প্যারিসের বড়বাবুর দল। মহিলারাও সমবেত হয়েছেন দলে দলে। তরুণী থেকে বৃদ্ধা। রূপে-রোশনায়ে সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী। বয়স ঢলে পড়েছে। সাজা

জীবনে মনোমত বর পেলেন না বলে আজও কুমারী। এমনও কত। যারা বিবাহিতা, তাঁরা মা নন। মা সব চাষীর ঘরে। ফ্রান্সের ভাবী কাল বড় হচ্ছে গরীব মা-বাপের কোলে। ঐশ্বর্যের দিন কাটে শুধু রূপ-পরিচর্যায় আর নিস্ফল বিলাস-বাসনা মেটাতে।

এখানে যেন মনুষ্যত্বের অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ।

তা হোক্। কিন্তু সর্বাঙ্গের সজ্জায় আভরণে এতটুকু চ্যুতি নেই। পাউডার প্রসাধনে কত যত্ন করে করে বর্ণ ঠিক রাখা। ত্বকের কমনীয়তা। মুখের লাবণ্য। বিরলকেশ মাথায় পরচুলার চাতুরী। অঙ্গের সুবাস রূপের সঙ্গে যেন ছন্দময। তার সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের ধ্বনি। রেশমে পশমে সোনায় জরিতে সুরে সুরভিতে সভা যেন নন্দন।

আর তার মধ্যে মঁসিয়ে মৃদুপদে হেঁটে যাচ্ছেন। ঈষৎ স্ফুরিত অধরে মৃদু মানবী হাসি বিতরণ করছেন। দুটি-একটি কথা কইছেন কোন ভাগ্যবানের সঙ্গে। আশ্বাস দিচ্ছেন। কাউকে শুধু স্মিত হাস্যে পুলকিত করছেন। সর্বাঙ্গের সুবাস ছাপিয়ে সন্ধ্যায় পান করা বহু মূল্য সুরার সুরভি জড়িয়ে আছে মানুষটির রসনায় রচনায়।

মানুষ তো নন। যেন দেবতা। অমৃত-পাত্র এনেছেন অভাজনদের কৃপা করতে। এমনি অভিবাদন আর বিনয়ের ঘটা। যত পূজা পেলেন, দেখে দেবতাদের ঈর্ষা ঘটে। পর্যটন শেষ হলে মঁসিয়ে নিজের কামরায় অন্তর্হিত হলেন। তখন সভা ভঙ্গ হল। একে একে অতিথিরা বিদায় নিলেন। শুধু সেই উজ্জ্বল আলোকিত সভায় বিচিত্র শব্দ গন্ধের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে একটি পরিণত-বয়স্ক পুরুষ কতকক্ষণ কি ভাবলেন। তার পর হাতে হ্যাট নিয়ে দর্পণ-খচিত প্রাচীরের পাশ দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে একবার মাত্র পিছন ফিরে তাকালেন সেই কক্ষটির দিকে। তার পর কাকে যেন উদ্দেশ করে বললেন—

'নরকস্থ হও তুমি।'

তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এলেন নীচে।

ষাট বছরেও মানুষটি রূপবান। বেশ-বিন্যাসে রূপ দৃপ্ত। মুখ যেন মুখোস। পৃথিবীর দাম্ভিকতা মাখান সেই মুখ। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলে চোখের ব্যঞ্জনায় নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ নজরে পড়ে। আভিজাত্যের কৃত্রিম হাসিতে সেটুকু ঢাকতে পারে না।

বাগানে গাড়ী অপেক্ষায় ছিল। উঠে বসতেই গাড়ী ছুটল।

আজকের সভায় যথাযোগ্য সমাদর পাননি। তার জন্য মনটা বিরক্ত হয়ে আছে। মঁসিয়ে আজ কারুর সঙ্গে আলাপে প্রসন্নতা দেখালেন না। কি জানি কেন সকলের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ কাটালেন সময়।

গাড়ী ছুটেছে যেন শত্রুব্যূহ ভেদ করছে। প্যারিসের সরু সরু রাস্তায় এত জোরে গাড়ী চালান মারাত্মক। ফুটপাত নেই যে ছেলে-গুলো সতর্ক সাবধান হয়ে পথ চলবে। কিন্তু সে কথা কে ভাবে? যেমন চলে আসছে তেমন চলে।

তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে গাড়ী ছুটছে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে। মানুষের জীবনের উপর কোন দয়া-মায়া নেই এদের। এতটুকু অসাবধানে কী বিপদ ঘটে যেতে পারে, ভেবে দেখে না এরা। ডুকরে কেঁদে উঠে গাড়ীর সামনে থেকে ছুটে পালায় মেয়েরা। ছোট ছেলেদের পাখীর ছানার মত ছোঁ মেরে সরিয়ে নেয় মা-বাপ। এমনি চলে পথ থেকে পথে এক রকম।

হঠাৎ বাক নিতেই গাড়ীর চাকা লাফিয়ে উঠল সশব্দে। আর সেই আর্ত চীৎকার উঠল বাতাস বিদীর্ণ করে।

এমন ঘটনা নূতন নয়। কোচোয়ান ক্বচিৎ এরূপ ক্ষেত্রে গাড়ী থামায়। হত হোক্, আহত হোক্, তা বলে তো মারকুইস মঁসিয়েদের গাড়ী নোংরা রাস্তায় দাঁড়াতে পারে না।

এখানেও তাই হোত। কিন্তু ঘোড়ার লাগামে দশ জোড়া হাত

উন্মত্ত প্রতিরোধে দৃঢ় হয়েছে দেখে সহিস ভয়ে ভয়ে নেমে এল রাস্তায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন মারকুইস—'কি হয়েছে?'

মাথায় টুপি একটি লম্বা লোক ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে এক দলা রক্ত মাংস তুলে নিয়ে পথের ধারে রাখলে। তার পর সেই কাদার মধ্যে বসে বন্য জন্তুর মত আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদতে লাগল।

'একটা ছেলে মরেছে হুজুর!'

'তাতে এত চেঁচামেচি কিসের? ওর ছেলে?'

'হ্যাঁ হুজুর—'

সেই কাদা-রক্ত-মাখা লোকটি ততক্ষণে উঠে কাছে এসে দাঁড়াতেই মারকুইস একবার তরবারির হাতলে হাত দিলেন।

বাতাসে দুটি হাত ছুঁড়ে দিয়ে লোকটি কান্না-ভাঙা গলায় বললে—'মেরে ফেলেছে। একেবারে পাথর হয়ে গেছে।'

পথের ভিড় জমেছে মারকুইসের গাড়ীর কাছে। চোখে-চোখে কৌতূহল। রাগ-বিদ্বেষ তখনো জ্বলেনি সে সব দৃষ্টিতে। বাপের তীব্র আর্ত চীৎকারের পর সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা এক দল ইঁদুর যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—ভাবলেন মারকুইস।

পকেট থেকে মোহরের থলি বার করলেন। তার পর মানুষগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন—'আশ্চর্য লাগে আমার যে, নিজেদের আর ছেলেপিলেদের কোন যত্ন নিতে অবধি তোমরা শেখোনি। একটা না একটা সব সময় পথে আছেই আছে। আমার ঘোড়াগুলোর কি ক্ষতি করেছ তোমরা জান না। যাও, এই মোহরটা ছোঁড়ার বাপটাকে দিয়ে দাও।'

সহিসকে লক্ষ্য করে মারকুইস একটা মোহর ছুঁড়ে দিলেন পথে। অনেক জোড়া চোখ কৌতূহলে নত হয়ে দেখলে।

লোকটা আর একবার প্রেত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—'মরে গেছে।' আর একটি লোক এসে তাকে সবলে ওঠাতেই লোকটি তার কাঁধে মাথা রেখে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল। শুধু একটি বার পথিপার্শ্বের সেই নিশ্চল রক্ত-মাংসের ডেলাটুকু দেখাতেই তার পিতৃ-হৃদয়ের শোক বিগলিত ধারায় ঝরতে লাগল।

'কেঁদো না—অমন করে ভেঙে পড়ো না ভাই। ছেলে তোমার সুখেই গেল। বেঁচে তার কি সুখ ছিল? মরে শান্তি পেলে চিরজন্মের মত।'

'তুমি দেখছি দার্শনিক। এই যে ওহে—' হেসে বললেন মারকুইস—'তোমার নামটি কি?'

'আমার নাম গ্যফর্জ।'

'কি কাজ কর?'

'মদ বেচি।'

'মোহরটা তুলে নাও। যেমন খুশী খরচ করো। কোচোয়ান গাড়ী ছাড়।'

গাড়ী ছাড়ার উদ্যোগ হতেই মারকুইস সিটের পিছনে আরাম করে বসলেন। কি যেন একটা জিনিষ ভেঙে ফেলেছেন অসাবধানে। তার বাবদ মূল্যও ধরে দিয়েছেন। সুতরাং আর মাথা ঘামাবার কিছু রইল না।

এমন সময় একটা মোহর টুং করে গাড়ীর ভিতরে ছিটকে এসে পড়ল।

—'রোখো। কে ছুঁড়েছে মোহর?'

এই মাত্র যেখানে গ্যফর্জ দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাকালেন মারকুইস। দেখলেন, পথের উপরে কেঁদে-কেঁদে মুখ ঘসছে বাপ। আর তার পাশে একটি বলিষ্ঠাঙ্গী মেয়ে দাঁড়িয়ে উল বুনছে।

'নোংরা কুকুরের দল। তোদের বুকের উপর দিয়ে এই গাড়ীব চাকা পিষে দিয়ে যেতে পারলে তবে আমার আক্রোশ মেটে। যে রাস্কেল মোহর ছুঁড়েছে—'

এই মানুষটা মুখে যা বলছে তাব চেযে ঢেব বেশী হিংস্রতা করতে পারে এ কথা জানে না কে? আইনের বাইরেও তার অত্যাচাবেব সীমা-পরিসীমা নেই। সে কথা ভেবে জনতার মুখে একটা রা উঠল না। শুধু সেই উল-বোনা মেযেটি একদৃষ্টে তাকিযে রইল মারকুইসের দিকে।

কতক্ষণ পরে আবার হুকুম দিলেন—'ছোড়ো গাড়ী।'

মারকুইসের গাড়ীর পিছনে আরো কত গাড়ী ছুটে গেল। পথেব ধারের কুকুরের দল অবাক চোখে দেখতে লাগল এই ঐশ্বর্য আডম্ববেব ছেদহীন মিছিল। তাও এক সময শেব হল।

শুধু সেই উল-বোনা মেযেটিব কাজেব বিবতি ঘটল না। উদাসিনী নিয়তির মত সে ভাগ্য-সূত্র গেঁথে যেতে লাগল।

৭

এপাশে-ওপাশে যত দূর দৃষ্টি চলে, ফসলের ফলন চোখে পড়ে। তাও একটানা নয়। ছাড়া-ছাড়া। কোথাও কযেক ফালি যব, কযেক ফালি কড়াই মটর। কোথাও গমজাতীয শস্য। এখানকার মানুষেব চেহারার মতই ফসলের অবস্থা। না আছে দীপ্তি, না পুষ্টি।

চার ঘোড়ায টানা বিহাব-শকটে চলেছেন মারকুইস। গাড়ী খাড়াই ভেঙে উপরে উঠছে। মারকুইসের মুখে পড়েছে রক্তের আভা। আভিজাত্যের রঙে রাঙা নয়, অস্তগামী সূর্যের আলোয রক্তিম। খাড়াই পার হযে পিছনে ধূলির ঝড় তুলে গাড়ী উৎরাইতে নামতে ন।

নামতেই পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে গেলেন সে দিনের মত। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে মারকুইসও নেমে গেলেন দৃষ্টির আড়ালে। মুখের আভাও আর রইল না মুখে। সূর্য নেমে যাবার পর, মারকুইস নেমে যাবার পর শুধু জেগে পড়ে রইল পাহাড়ের পায়ের কাছে একটি ভগ্ন জীর্ণ দেউলে হয়ে যাওয়া গ্রামজীবন। পড়ে রইল গ্রামের সেই বিশাল উদার মাঠ। মাঠের শেষে আকাশমুখী গীর্জা। জেগে রইল শুধু বন আর টিলা। আর সেই টিলার উপর প্রহরীর মত দুর্গ কারাগার।

দিক্-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার যেন কালো আবরণে ঢেকে নিতে এল গৃহ-ফেরা যাত্রীকে।

যেমন গ্রাম তেমনি লক্ষ্মীছাড়া লোক-জন। কোথাও শ্রী নেই, ছাঁদ নেই—সব কিছুতেই দারিদ্র্যের ছাপ। সন্ধ্যা বেলা অনেকেই বেকার দরজার সামনে বসে। কেউ কেউ রাতের খাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। কেউ বা ঝরণার ধারে গেছে শেকড় ও ঘাস-পাতা ধুতে। মাটিতে ফসল যা কিছু জন্মায় সবেতেই পেট ভরে, ক্ষুধা মরে। মাটির ভরসাতেই বেঁচে আছে। নইলে এখানকার মানুষ ফুরিয়ে যাওয়া জীব।

রাস্তায় কদাচিৎ শিশুদের মুখ দেখা যায়—কুকুরদের তো দেখাই যায় না।

পৃথিবীতে এরা দুটি ভবিষ্যৎ নিয়ে এসেছে। কায়ক্লেশে টিঁকে থাকা নয় কারাগারে মরণ।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর সহিসের চীৎকারের সঙ্গে উদ্যতফণা চাবুকের তীক্ষ্ণ শব্দ বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠল। মারকুইসের গাড়ী এসে ফোয়ারার কাছ বরাবর ডাক-গাড়ীর আড্ডায় থামল। চাষীরা কাজ-কর্ম ফেলে তাকাল তাঁর দিকে। জমিদারও তাকালেন তাদের দিকে। সে দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সবাই চোখ নামাল।

হুকুম দিলেন মারকুইস—'লোকটাকে ধরে নিয়ে আয়।'

হাতে টুপি লোকটিকে নিয়ে আসা হল। বাকী সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল চারি দিক থেকে।

'রাস্তায় তোমার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'একবার নয় দু'বার। তা অত জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে কি দেখছিলে?'

একটু নত হযে লোকটা হাতের নীল টুপি বাড়িযে গাড়ীর তলার দিকে দেখল। সমবেত জনতাও কুঁজো হযে গাড়ীর তলার দিকে তাকাল।

'কে? ওখানে কি দেখছ?'

'একটা লোক শেকলে ঝুলছে।'

'কে?'

'লোক একটা।'

'হারামজাদ সব। নাম নেই লোকটার? এই গ্রামের সকলকে চেন। কে ও?'

'হুজুর, ও এ গ্রামের নয। জীবনে আমি কখনো ওর মখ দেখিনি।'

'শেকলে ঝুলছে? দম আটকে মরার ইচ্ছা হযেছে বুঝি?'

'সেইটাই আশ্চর্য ঠেকছে হুজুর। মাথাটা ঝুলছে—ঠিক এই ভাবে।'

'কিসের মত দেখতে?'

'কি দেখাব হুজুর? সব সাদা। সারা গা ধূলায ঢাকা—ভূতের মত লম্বা দেখতে। ভূতের মত সাদা।'

কথা শুনে সবাই হতভম্ব।

'আমার গাড়ীর তলায় চোর আর তুমি হতভাগা মুখটি বুজে আছ নির্বিকার। বেটাকে দূর করে দাও—'গর্জন করে উঠলেন মারকুইস।

'ভাগো এখান থেকে'—ধমক দিলেন পোষ্ট মাষ্টার।

‘লোকটা যদি আজ রাত্রে এই গ্রামে থাকে ওর উপর নজর রেখো। চুরি-টুরি করে না যেন।’

‘জো হুকুম, হুজুর।’

হুড়মুড় করে গাড়ী আবার ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে লাগল। খাড়া পাহাড়ে উঠতেই গতি শ্লথ হযে এল গাড়ীর। গ্রীষ্ম রাতের নানা সুরভির হাট বসেছে চারি দিকে। ডাঁশ-মশারা ঘোড়াদের মুখের চার দিকে সানাই ধরেছে।

পাহাড়ের মাথার কাছে ছোট্ট কবর। কবরের উপর একটি ক্রুশ-চিহ্ন আর ক্রুশে আঁটা বিশ্ব-পরিত্রাতার চেহারা। কাঠে খোদাই-করা অনিপুণ হাতের নিরাভরণ মূর্তি। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। যেমন শিল্পী তেমনি সৃষ্টি।

সেই মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল একটি মেয়ে। গাড়ী কাছে আসতেই পলকে উঠে দাঁড়াল। তারপর গাড়ীর দরজার কাছে সরে এল।

‘হুজুর, একটা আর্জি ছিল।’

‘কি? সব সময় শুধু তোমাদের আবেদন আর আর্জি।’

অধৈর্যের সঙ্গে বললেন মারকুইস।

‘হুজুর, মা-বাপ। আমার স্বামী হুজুর—’

‘কি হয়েছে তোমার স্বামীর? তোমাদের স্বভাবই ঐ রকম। সরকারকে কিছু দেবে না?’

‘তার আর দিতে কিছু বাকী নেই হুজুর! সব দিয়ে একেবারে মরে গেছে।’

‘মরে গেছে! আমাকে কি তার প্রাণটা ফিরিয়ে দিতে হবে?’

‘না হুজুর। সে ঐখানে শুয়ে আছে—ঐ আগাছার নীচে।’

‘কি হয়েছে তাতে?’

'এত আগাছা, হুজুর, সেখানে—'

'তাতে কি ?'

অল্প বয়সে জীর্ণ হয়ে পড়েছে মেয়েটি। যেন মূর্তিমতী শোক। কথা কইতে-কইতে মাঝে মাঝে নীল শির বের করা একটি হাত সে গাড়ীর দরজার উপর রাখছিল।

'হুজুর, শুনুন আমার নিবেদন। আমার স্বামী না খেতে পেয়ে মারা গেছে। না খেতে পেয়ে অনেকেই মরে, আরো কত মরবে।'

'আমি কি সকলকে খাওয়াব ?'

'হুজুরের কাছে সে দাবী আমি করি না। আমার আবেদন, হুজুর, শুধু এক টুকরো কাঠ পাথর—তাতে আমার স্বামীর নাম খোদাই করে তার কবরের উপর রাখা হোক্। না হলে তার কথা যে ভুলে যাবে লোকে। আমিও যখন ঐ এক রোগে মারা যাব তারা খুঁজে পাবে না কোথায় তার কবর ছিল। আমাকেও ত সবাই অমনি কোন আগাছার নীচে গোর দেবে। আর ত চেনা যাবে না। এত আগাছা হুজুর—এত বাড়ন তাদের, অথচ এত অভাব চারি দিকে।'

মেয়েটির হাতখানা ঘৃণায় সরিয়ে দিল পার্শ্বচর গাড়ীর দরজা থেকে। গাড়ী আবার ছুটতে লাগল হাওয়ার বেগে।

গ্রীষ্ম রাতের সুমধুর সুরভি চারি পাশে আবার মায়াজাল রচনা করে। বনস্পতির ডালপালা-বাহু-বিজড়িত নিজ প্রাসাদের ছায়ায় প্রবেশ করলেন মারকুইস। ছায়া অপসারিত করে বাড়ী দেখা দিল। গাড়ী থামল। অবারিত হল বিরাট প্রাসাদের বিরাট দরজা।

'মঁসিয়ে চার্লস—ইংল্যাণ্ড থেকে যার আসার কথা, এসেছে কি

'না মঁসিয়ে।'

৮

বিপুল প্রাসাদটি আগাগোড়া পাথরের তৈরী। সামনের শান-বাঁধান চত্বরটি প্রস্তর-শিল্পের আভরণে সজ্জিত।

গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতেই খানসামা সিঁড়ি ভেঙে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাইরে কালো রাত পেঁচার ডানা-ঝাপটায় একবার যেন সচকিত হয়ে উঠল। তার পর আবার সব নীরব-নিঝুম। যেন হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে রাত আবার নিরুদ্ধ নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল।

বিরাট দরজা বন্ধ করার ভারী আওয়াজ হল। মারকুইস প্রবেশ করলেন অস্ত্র-ঘরে। এ ঘরের থরে-থরে সাজান চাবুক আর লোহার ডাণ্ডার পরিচয় জানে চাষী প্রজারা। জমিদারের রাগের মুখে পড়ে কতজন ওর ঘায়ে সাবাড় হয়েছে। নয় তো ঘায়েল হয়েছে রীতিমত।

আরো সিঁড়ি ভেঙে মারকুইস নিজের মহলে এসে পড়লেন। তিনখানি ঘর নিয়ে এ মহল—তাঁর নিজস্ব নিরিবিলি। ফ্রান্সের রাজ-বংশের অনেক ধারারক্ষী চিত্রপট আর আসবাবে সাজান তাঁর নিজের শয়ন-কক্ষ। অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খাওয়ার টেবিলে দু'জনের ব্যবস্থা তৈরী। সেদিকে নজর পড়তেই মারকুইস বললেন—'ভাইপো এখনো এসে পৌঁছয়নি শুনলাম। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। খাবারের ব্যবস্থা যেমন আছে থাক। পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে আসছি আমি।'

অল্প পরেই আহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন তিনি। একলাই খেতে বসলেন। ঝোল মুখে দিয়ে আর একটিতে হাত দিতে যাবেন, যেন

কিসের আওয়াজ পেয়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। খানসামাকে বললেন—'দেখ তো? কি ওখানে?'

জানলার পর্দা তুলে রাতের কালো আঁধার মন্থণ করলে সে। কান পেতে শুনলে। তারপর নিবেদন করলে—'কিছু নয় হুজুর—'

'ঠিক হ্যায—'

অর্ধেক খাওয়া সারা হয়ে এসেছে এমন সময় শুনলেন বাইরে গাড়ীর ঘড়-ঘড় শব্দ। প্রাসাদের ফটকের সামনে এসে থামল।

'কে এল?'

ভাইপো এসে পড়েছে। তক্ষুণি তার কাছে সংবাদ গেল যে, আহায প্রস্তুত। মারকুইস অপেক্ষা করছেন তার জন্য। কযেক মুহূর্তের মধ্যে ভোজের টেবিলে এসে উপস্থিত হল সে। ইংল্যাণ্ডে চার্লস ডার্নে এরই নাম।

মারকুইস ভাইপোকে সংযত সৌজন্যে অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু করমর্দন করলেন না।

আসন নিযে প্রশ্ন করলে ডার্নে—'কালই প্যারিস ছেড়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমি সোজা আসছি।'

'লণ্ডন থেকে?'

'হ্যাঁ—'

'আসতে বেশ সময লেগেছে তো?'

'না, সোজাই তো আসছি—'

'আসতে দেরী হয়নি, দেরী হযেছে মনস্থির করতে।'

'নানা কারণে কাজের ঝঞ্ঝাটে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম—' উত্তর দিতে গিয়ে ডার্নে মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করলে।

'তা বটে—'

ঘরে চাকর যতক্ষণ ছিল এ ছাড়া আর অন্য কোন কথাবার্তা হল না। কফি পরিবেশনের পর দু'জনে একলা হলেন। কাকার মুখের দিকে চেয়ে ডার্ণে বললে—'যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম তাতে নানা ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য যে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম তাতে মৃত্যু হলেও আমি আপশোষ করতাম না।'

'ও কথা বলছ কেন?'

'সত্যিই যদি আমার বিপদ ঘটত, আপনি আমাকে বিরত হতে দিতেন কিনা সন্দেহ।'

মুখের রেখায়-রেখায় ভাইপোর প্রতি স্নিগ্ধ মমতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন মারকুইস, কিন্তু তাতে আন্তরিকতা এল না।

সেদিকে তাকিয়ে ডার্ণে স্পষ্টই বললে—'আপনি আমার চারি পাশের পরিবেশকে সহজ করে দেবার চেষ্টা করতেন না নিশ্চয়ই!'

'না, না, সে কি?'

অল্প একটু অপেক্ষা করে বললেন—'দেখ, যে ঘরে তুমি জন্মেছ, যে বংশ-মর্যাদা তোমার রক্তে, তার সৌভাগ্য মাথা খুঁড়ে মানুষ পায় না।'

'কিন্তু ফ্রান্সের ইতিহাসে আমাদের কৌলীন্য বিন্দুমাত্র গরিমা পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সেকালে ত বটেই, একালেও আমরা আমাদের অধিকার এমন জবরদস্তি জাহির করেছি যে, আজকে সারা ফ্রান্সে আমাদের মত এমন ঘৃণার পাত্র আর দ্বিতীয় কাউকে চোখে পড়ে না।'

'এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। নীচের তলায় যারা থাকে ওপরওয়ালাদের প্রতি তাদের এই ঘৃণা পূজারই নামান্তর।'

'ও কথা সত্যি নয়। এই জমিদারীর মালিকদের সমীহ করে লোক নিছক ভয়ে। কোন ভক্তি নেই তার মধ্যে।'

'আমাদের পারিবারিক আভিজাত্যের দিক থেকে তাতে অন্ততঃ লজ্জার কারণ নেই।'

মারকুইস এক টিপ সুগন্ধ নস্য নাসারন্ধ্রে দিয়ে আরাম করে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসলেন। বললেন—'চাবুকের চেয়ে বড় শাসনও নেই, শিক্ষাও নেই। যত দিন মাথার উপর এই ছাদ থাকবে, কুকুরগুলোকে চাবুকের ভয়ে বশে রাখব। তোমার ভাবনা নেই। যত দিন এ পরিবারের শান্তি সম্ভ্রম বজায় রাখার দায়িত্ব আমার, তত দিন তোমাদের কারুরই মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু তুমি খুব পরিশ্রান্ত। যাও, বিশ্রাম নাও গে।'

'আর একটা কথা।'

'একটা কেন। যত খুশী কথা আছে বলো।'

'আমরা যে অন্যায় করেছি তার ফসল ফলতে সুরু করেছে।'

'অন্যায় করেছি?'

'অন্যায় নয়? আপনারা সবাই অন্যায় করেছেন। অত্যাচার করে এসেছেন, এখনো করতে কসুর করছেন না। কিন্তু আমি কি করে ভুলব মায়ের শেষ অনুরোধ, তাঁর অন্তিম দৃষ্টির কাতর মিনতি—'লোকের প্রতি স্নেহশীল হবে, লোকের দুঃখ মোচন করবে'—সে আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু সে শক্তি সামর্থ্য কোথায় পাব আমি?'

'আমার কাছ থেকে যদি সে রকম কিছু পাবার আশা করে থাক, সে তোমার দুরাশা।'

একটু থেমে বললেন মারকুইস—'যে সমাজ-ব্যবস্থায় আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, তাকে ভাঙতে দেব না আমি বেঁচে থাকতে।'

'এই সম্ভ্রম সম্পত্তি আমার জীবনে মূল্যহীন। ফ্রান্সেও আমি থাকতে চাই না'—বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে ডার্নে—'আমি স্বেচ্ছায় আমার অধিকার ত্যাগ করছি।'

'এ ছুটোই কি তোমার নিজস্ব? ফ্রান্স হয় তো হতে পারে কিন্তু এই সম্পত্তি?'

'এ সম্পত্তি আঁকড়ে থাকাব ইচ্ছা নেই আমার। যদি আগামী কাল এ সম্পত্তি আমাতে বর্তায—'

'সে-সম্ভাবনা সুদূরপবাহত।'

'কুড়ি বছর পবেও তো হতে পাবে—'

মাবকুইস পরিহাস-বিজড়িত কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ কবে উঠলেন।

'বাহিব থেকে দেখলে সব কত মজবুত মনোহর। কিন্তু দিনেব আলোয উন্মুক্ত আকাশেব নীচে দেখলে এ শুধু ঋণ আব অপচয, অত্যাচাব আব নিপীড়ন, বুভুক্ষা আব নগ্নতাব ধ্বসে পড়া দুর্গ ছাড়া কিছু নয।'

মাবকুইস আবাব শ্লেষোক্তি করলেন।

'যদি কোন দিন এ সম্পত্তি আমার হাতে আসে'—বললে ডার্নে—'আমি উপযুক্ত লোকেব হাতেই তুলে দেব একে। তুলে দিযে বাঁচব। এ সম্পত্তি আমাব জন্য নয— এর উপব ভগবানেব অভিশাপ উদ্যত হযে আছে।'

'তাব পব?'

'আমি ইংল্যাণ্ডে গিযে বাস কবব। সাধারণ সজ্জন ভদ্রলোকের মত বাচতে চাই আমি।'

'ইংল্যাণ্ড দেখছি তোমার মনে রং ধরিযেছে—' স্মিত হেসে প্রশান্ত দৃষ্টিতে মাবকুইস তাকালেন ভাইপোব দিকে।

'ইংল্যাণ্ড আমার আশ্রয।'

'দাম্ভিক ইংরেজরা বলে বটে ইংল্যাণ্ড সবার আশ্রয-স্থল। জান বোধহয়, এ দেশের একজন সম্প্রতি সেখানে আশ্রয় পেযেছে। একজন ডাক্তার?'

'জানি।'

'তার একটি মেয়েও আছে শুনেছি।'

'হ্যাঁ—'

'হুঁ! তুমি শ্রান্ত। শুভ রাত্রি।'

বলে মারকুইস স্মিত হাসি হাসলেন। সে হাসির আড়ালে একটা রহস্যের ইংগিত। এমন একটা ভংগিমায কথাগুলি উচ্চারণ কবলেন তিনি, তাতে রহস্য যেন আরো নিবিড়তর হয়ে উঠল। তিনি আবাব পুনরাবৃত্তি করলেন—'একজন ডাক্তার আর তাব একটি মনোরমা মেযে। বসন্তের প্রথম রঙ।

আজকের রাত নিস্তব্ধ, নির্বাত। হাল্কা শ্লিপার পাযে ঘবের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুবে বেড়াতে লাগলেন মারকুইস। ঘুবে বেড়াতে লাগলেন হিংস্র বাঘের মত।

সারা দিনেব টুকরো-টুকবো স্মৃতি মনেব পর্দাব আসছে-যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য শেষ পাড়ি দিচ্ছেন। পাহাড়েব কোলে গ্রাম—পুকুর-পাড়ে চাষীদেব জটলা। টুপি-পবা একটা মজুব পথের মাঝে তালগোল-পাকানো একটা মেযেব শবীবেব উপব ঝুঁকে পড়ে দেখছে। কে যেন চেঁচিযে উঠল—'মবে গেছে। একেবাবে শেষ করেছে।'

অগ্নিকুণ্ডে একটি মাত্র বাতি পুড়ছে। পাতলা মশাবি টেনে দিযে শুয়ে পড়লেন মারকুইস।

আর উঠলেন না।

৯

প্রহরের পায়ে পায়ে বছর কেটে গেল। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের মাষ্টার হিসেবে তত দিন ইংল্যাণ্ডে ডার্ণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে সমস্ত তরুণ শিক্ষার্থী অবসর সময়ে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শিখতে চায়, তাদের নিয়েই তার ছাত্রসমাজ। নিজেও ভাল ইংরেজী লিখতে পারত। দরকার হলে ফরাসী থেকে ইংরেজীতে তর্জমাও করতে পারত বলে ডার্ণের নাম ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। তা ছাড়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকায় তার সুবিধাও হল প্রচুর।

লণ্ডনে সোনার পালঙ্কে আরাম করার বাসনা নিয়ে আসেনি ডার্ণে। গোলাপের পাপড়িতে পা দিয়ে স সারে বাচতে চায়নি বলেই সে পরিশ্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চাইলে নূতন করে। আর সে-মধুর শ্রমের সুযোগ পেতেও তার বিলম্ব হল না। সেই সঙ্গে কিছু আর্থিক সংযোগের।

ডার্ণের সময়ের কিছুটা কাটত কেমব্রিজের ছাত্রমহলে আর অনেকটা কাটত লণ্ডনে।

যেদিন সংকট ঘনিয়ে এসেছিল জীবনে, সেই দিন থেকে লুসির প্রেমমুগ্ধ হয়েছিল সে। সৃষ্টির আদিকাল হতে সমস্ত পুরুষ যে পথে প্রেরণা পেয়েছে, সৌভাগ্য পেয়েছে, রমণীয় রমণীর ভালবাসায় আতুর হয়েছে, সেই এক পথে ডার্ণেও শাশ্বত পুরুষ সমাজের সহযাত্রী হল। অমন মধু-সংলাপ, কণ্ঠে অত মাধুরী কোন মেয়ের থাকে তা আগে জানেনি সে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে চারু মুখখানি দেখেছিল সে,

তেমন স্নিগ্ধ লাবণ্য আর কোন মুখে ঝরতে দেখেনি জীবনে। কিন্তু ডার্ণে তার মনের কথা মনেই রেখে এসেছে এত দিন। ফেনিল নীলাম্বুরাশির পরপারে বহু ধূলি-ধূসরিত পথ পেরিয়ে সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদ-সৌধ—যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল—আজ তা স্বপ্নময় কুহেলিকায পরিণত। তাব পর প্রায একটি বছর গড়িযে গেছে। ডার্ণে মুখেব একটি কথাতেও কোন দিন হৃদযেব দ্বাব অবারিত কবেনি লুসিব কাছে।

কেন করেনি তা সে-ই ভাল জানে। এমনি একদিন গ্রীষ্মেব এক বিকেলে কলেজ থেকে ফিবে ডার্ণে ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হল সাহোব সেই নির্জন পরিবেশে। ডাক্তাব ম্যানেটের কাছে আজ মনের গোপন ইচ্ছাটি প্রকাশ করবে সে। ডার্ণে জানে, এই সময লুসি মিস প্রসেব সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যায।

জানালার ধাবে আর্ম-চেযাবে বই নিযে বসে ছিলেন ডাক্তাব। পুবানো কর্মশক্তি আবাব ফিবে পেযেছেন। ফিবে এসেছে তাব উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা, স্থৈর্য আর কর্মোদ্যম।

ডাক্তার পড়েন বড্ড বেশী। ঘুমোন কম, তবে শ্রান্তিকে স্বাচ্ছন্দেব সঙ্গে মেনে নেন। মন প্রসন্নতায ভবে থাকে।

ডার্ণে আসতেই বই বন্ধ কবে তাকে অভ্যর্থনার জন্য হাত বাড়ালেন।

'তোমায দেখে ভাবী খুশী হলাম ডার্ণে। গত তিন-চার দিন ধবে তোমার অপেক্ষায আছি। ষ্ট্রাইভার আর সিডনী কার্টন গতকাল এখানে এসেছিল। তারাও জিজ্ঞাসা কবেছিল তোমার কথা'—

'তাদেব আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। মিস ম্যানেট—?'

'ভালই আছে। তোমায় দেখলে সবাই খুশী হবে। সংসারেব কোন কিছু কেনাকাটির প্রযোজনে বাইরে গেছে। এখনি এসে পড়বে।'

'মিস ম্যানেট নেই। এই অবসরে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

এক লহমা নীরবতায় কাটল। তার পর যেন চিন্তা-কণ্টকিত সংযত কণ্ঠেই বললেন ডাক্তার—'চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস এইখানে। বল কি বলবে?'

ডাক্তারের নির্দেশ মত চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ডার্নে। কিন্তু কথা বলা তত সহজ হল না।

'প্রায় দেড় বছর আপনাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। যা নিয়ে কথা বলতে চাই আশা করি তা—'

ডাক্তার হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তার বলা। অল্প পরে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন—'লুসির সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও তো?'

'হ্যা।'

'হঠাৎ তার সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন আমার পক্ষে। আর তুমি যে সুরে কথা কইছ তা' শোনা আরো কঠিন আমার পক্ষে।'

'আমি যা বলতে চাই, আপনার কন্যার প্রতি অকপট প্রীতিভরেই বলতে সাহস পাচ্ছি'—সসম্ভ্রমে বললে ডার্নে।

'তুমি যা বলছ বিশ্বাস করি'—বললেন ডাক্তার।

মনের প্রবল আবেগ কেমন করে দমন করবে ভেবে না পেয়ে ডার্নে ভূমিকা রচনা করতে চাইলে। বললে—'আপনার ভরসা পেলে বলতে পারি।'

'বেশ, বল।'

'আপনি হয়ত অনুমান করতে পেরেছেন কি আমার কথা? কিন্তু যে আশা-নিরাশায় আমি নিত্য পীড়িত হচ্ছি তা আপনি হয়ত অনুমান করতে পারবেন না। আমার নিভৃত সত্বার বেদনার ভার কেমন করে বোঝাব আমি অপরকে? ডাক্তার, আমি তাকে ভালবাসি—আমার

প্রাণের প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। জগৎ-সংসারে এমন ভালবাসা কেউ বাসেনি কোন দিন। একদিন আপনিও এক জনকে ভালবেসেছেন। সেই স্মৃতির সূর্যালোকে আপনি আমার মনটিকে দেখুন।

ডাক্তার মাটির দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। ডার্ণের শেষ কথায় সচকিত হয়ে বললেন—'না, না। ও-কথা থাক। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে চাই না আমি।'

ডাক্তারের আকুলতা বেদনাহত প্রাণীর আর্ত কান্নার মতই ডার্ণের কানে বাজতে লাগল বহুক্ষণ ধরে। তার সেই মিনতির ভঙ্গী দেখে ডার্ণে চুপ করে রইল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ডাক্তার আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'লুসির প্রতি তোমার ভালবাসায় আমি সন্দেহ করছি না। এ বিষয়ে তুমি নিঃসংশয় হতে পার।'

ডাক্তার চেয়ারটা ডার্ণের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু তার দিকে তাকালেন না, বা মাটি থেকেও মুখ তুললেন না। হাতের তালুর মধ্যে মুখখানি চেপে নিম্নমুখী হয়ে বসে রইলেন চুপ করে। শুভ্র শিরে মখ অদৃশ্য হয়ে রইল।

'লুসিকে বলেছ তুমি?'

'না।'

'কোন চিঠি দিয়েছ?'

'না।'

'আমার প্রতি মমতা বশেই যে আজো নিজেকে বঞ্চিত রেখেছ এর জন্য পিতৃ-হৃদয়ের ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য'—তেমনি নীরবে নতমুখে বসে তিনি শুধু একটি সস্নেহ হাত বাড়িয়ে দিলেন ডার্ণের দিকে।

'আমি তো জানি ডাক্তার, আপনাদের দুটি প্রাণীতে কি অপরিসীম মমত্ব!' শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমমিশ্রিত কণ্ঠে ডার্ণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—'একদিন

বিপরীত ভাগ্য বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল দু'জনকে, আবার এক আশ্চর্য মুহূর্তে মিলিয়ে দিয়েছে। তাই সে স্নেহ এত গভীর, এমন অনির্বচনীয়। কন্যার সঙ্গে পিতার এমন একপ্রাণ কেউ কখনো শুনেছে কি না, জানি না বটে। কিন্তু আমি তো দেখছি ডাক্তার, যখন সে আপনার গলা জড়িয়ে আদর করে, মুহূর্তে যেন সে শিশু মায়াবী হয়ে ওঠে। সেই নিষ্পাপ প্রাণ, সেই সহজ স্নিগ্ধতা! কেনই বা না হবে? অতি শিশুকাল থেকে মা-বাপ হারিয়ে সে স্নেহ-ভিক্ষু হয়ে বড় হয়েছে। এত দিনে পিতার কাছে সে মাতা-পিতার স্নেহ পাচ্ছে। স্নেহ দিচ্ছে।'

ডাক্তার তেমন ভাবে নতমুখে নিঃশব্দে বসে রইলেন। তাঁর দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে এল ডার্ণের। কিন্তু নির্বাক্ হয়ে তিনি মনের ভাব সংহত করে রাখলেন।

'ডাক্তার ম্যানেট'—ডার্ণে আবার বললে—'এ সব কথা ভেবে যত দিন পেরেছি নিজেকে নিরস্ত রেখেছি। আপনাদের দু'জনের সেই স্বর্গীয় স্নেহ-দ্যুতির ভূমিকায় আমার ভালবাসাকে টেনে আনলে কেমন হবে, তা আমি কিছুতেই স্থির করতে পারিনি। একথা আমি বহুদিন ভেবেছি—এখনও ভাবি। কিন্তু লুসিকে আমি ভালবাসি। ঈশ্বর সাক্ষী, লুসির প্রতি আমার প্রেম—'

'আমি বিশ্বাস করি'—কাতর কণ্ঠে বললেন ডাক্তার—'এর আগেও আমি ভেবেছি সে কথা। আমি বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু এ কথা কখনো মনে স্থান দেবেন না'—বললে ডার্ণে—ডাক্তারের কাতর কণ্ঠ তখনো যেন তার কানে তিরস্কারের মত বাজতে লাগল—'যদি কোন দিন তাকে সহধর্মিণী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়, আমি তাকে কখনই আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব না। যদি অতীতে কোন দিন সে কথা ভেবেই থাকি কোন আত্মসুখের

আশায়—সে স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েই আমি আজ এসে দাঁড়িয়েছি। আপনার অঙ্গ স্পর্শ করে আমি মিথ্যাভাষী হতে পারব না।'

ডার্ণে নিজের হাত ডাক্তারের হাতের উপর রাখল।

'ডাক্তার ম্যানেট, আমিও স্বেচ্ছায় ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত, অত্যাচার দুঃখ হতাশায় তাড়িত হয়ে এসেছি এখানে—আপনার মত আমিও নিজের পরিশ্রমে বাঁচার চেষ্টায় এসেছি এখানে—আপনার মত আমিও এক প্রোজ্জ্বল ভবিতব্যের স্বপ্ন দেখি। আমি শুধু চাই আপনার সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে—আপনার সঙ্গ, আপনার গৃহের ছায়াতলে একটুখানি আশ্রয় পেতে চাই। আমি চিরজীবন বিশ্বস্ত থাকব আপনার প্রতি। আপনার কন্যা, বন্ধু, সঙ্গী লুসিকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাই না, বরং আপনাদের দু'জনকে আরো এক নিবিড়তর স্নেহপাশে বদ্ধ করতে চাই।'

ডাক্তারের হাত ছিল ডার্ণের মুঠির মধ্যে। এতক্ষণ কথা বলার পর এই প্রথম মুখ তুলে তাকালেন ডাক্তার তার দিকে। মনের ভিতরে যে প্রবল সংগ্রাম চলছে তার স্পষ্ট ছাপ মুখে।

'তোমার দরদী মনের পরিচয় দিয়ে তুমি আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেছ ডার্ণে। তোমার কাছে কিছুই আমি গোপন করব না। লুসি যে তোমায় ভালবাসে এমন কোন প্রমাণ পেয়েছ কি?'

'না, তেমন কিছু পাইনি এখনও।'

'এখন তাই কি জানার সম্মতি চাইছ আমার কাছে?'

'এখন নয়। হয়ত কয়েক সপ্তাহেও সে রকম আশা পোষণের কোন কারণ না-ও ঘটতে পারে। আবার হয়ত আগামী কালই ঘটতে পারে।'

'আমার কাছ থেকে কি কোন প্রতিশ্রুতি চাও?'

'চাই না। তবে আপনি যদি উচিত মনে করেন এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'তুমি প্রতিশ্রুতি চাও ?'

'চাই।'

'কিসের প্রতিশ্রুতি ?'

'আমি ভাল করেই জানি আপনার সাহায্য না পেলে কোন আশাই নেই আমার। যদি বা তার নারী হৃদয়ের একটি কোণে কোন দুর্লভ আসন পাই, তার স্নেহময়ী কন্যার-হৃদয়ে কোন প্রতিষ্ঠা পাব না। পিতৃ-সর্বস্ব তার হৃদয়। সেখানে অন্য সবই গৌণ।'

'বৈরিতার মতই প্রেমের রহস্য অপার। অবাঙ মনস-গোচর। জানো ডার্নে, মেয়ে আমার সেদিক দিয়ে এমন রহস্যময়ী যে, তার হৃদযের কোন হদিশ পাই না আমি। তার অনুভূতি এত সূক্ষ্ম, এমন অতীন্দ্রিয় যে, আমি নিজে তা ধরতে-ছুঁতে পাই না।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সে অন্য—?'

এইটুকু বলে ডার্নে ইতস্ততঃ করছে দেখে ডাক্তার বললেন—'অর্থাৎ অন্য কারুর প্রেমে পড়েছে কি না ?'

'সেই কথাটাই আমি জানতে চাই।'

উত্তর দেবার আগে একটু ভাবলেন ডাক্তার।

'কার্টনকে তুমি নিজেই দেখেছ। ষ্ট্রিভারও এখানে আসে মাঝে-মাঝে। এই দু'জন ব্যতিরেকে আর কারুর কথা তো আমার মনে পড়ে না। যদি হয় এদের দু'জনের এক জন কেউ হতে পারে।'

একটু পরে ডাক্তার বললেন—'কিন্তু সে কথা থাক। তুমি আমার কাছে কি চাও বল ?'

'আমি যা-যা বললাম, আপনি তার সাক্ষী হযে রইলেন। আমার মত সেও যদি কোন দিন আপনার কাছে তার মনের দুয়ার খুলে দেয়, আশা করি, সেদিন আমার আপীল আপনি তার কাছে পৌঁছে দেবেন। এই আমার মিনতি রইল। আর কিছু নয়।'

'সে প্রতিশ্রুতি আমি তোমায় দিলাম ডার্ণে। কোন সর্ত-সাপেক্ষ নয়। তোমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই। তার আর আমার মধ্যে স্নেহের বন্ধন শিথিল না করে আরো দৃঢ় করাই যে তোমায় ইচ্ছা—এ আমি বিশ্বাস করি। যদি সে কোন দিন বলে তার সুখের পথে তুমি অপরিহার্য, আমি হর্ষিত মনেই তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করব। মতান্তর থাকলেও—'

ডার্ণে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বৃদ্ধের করতল নিজের মুঠোয় চেপে ধরল। বৃদ্ধ আপন মনে বললেন—'যাকে সে সারা মন দিয়ে চাইবে তার বিরুদ্ধে কোন ভয়, কোন আশংকা, নূতন-পুরানো কোন বিদ্বেষের কোন কারণ যদি কোন দিন থেকে থাকে—তার জন্য সে নিজে দায়ী নয়—লুসির মুখ চেয়ে আমি সে সব-কিছুই চিরদিনের মত মুছে ফেলব মন থেকে। লুসি আমার সব। তার সুখই সর্বাগ্রে। আমার সব অত্যাচার অনাচার দুঃখভোগের ওপর সে। কিন্তু সে কথা থাক। ও সব চিন্তা—'

কথা বলতে-বলতে কখন আবার মানুষটি নৈঃশব্দের অতলে তলিয়ে গেলেন। অপলক দৃষ্টিতে কি এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল। অবাক দৃষ্টিতে তাই দেখতে লাগল ডার্ণে।

হঠাৎ তাকে সচকিত করে দিয়ে ডাক্তার হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন—'কি যেন বলছিলে তুমি আমাকে ?'

এ কথার কি জবাব দেবে ভেবে দিশাহারা বোধ করলে ডার্ণে। তার পর মনে পড়ল তার সব কথা। তখন আশ্বস্ত চিত্তে বললে—'আপনি আমায় পূর্ণ বিশ্বাস করলেন। আমারও উচিত আপনার বিশ্বাসভাজন হওয়া। আপনার মনে পড়বে আমার বর্তমান নাম আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নাম এবং কেন আমি ইংল্যাণ্ডে এসেছি সেই কথাই আপনাকে ভেঙে বলতে চাই।'

'না, না'—ডাক্তার বাধা দিলেন ডার্ণকে।

'কিন্তু নিজেকে আমি গোপন করে রাখতে চাই না আপনার কাছে।'

'দরকার নেই—কোন দরকার নেই।'

মুহূর্তের জন্য ডাক্তার হাত দিয়ে নিজের কান ঢাকলেন। তার পর ডার্নের মুখে হাত দিয়ে বললেন—'আজ নয়। এখন নয়। যেদিন জানতে চাইব সেদিন বলো। যদি কোনদিন লুসি তোমার কণ্ঠে বরমাল্য দেয়, যদি তাই হয়, তবে বিয়ের দিন সকালে আমায় সব জানিও। বল, জানাবে তো?'

'সানন্দে সব বলব।'

'তবে আজ এসো। এখুনি লুসি এসে পড়বে। আজ রাত্রে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে তার না দেখাই ভাল। আজ এসো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

ডার্নে যখন বিদায় নিল তখনই আঁধার গাঢ় হয়ে এসেছে। তার আরও এক ঘণ্টা পরে লুসি যখন ফিরল অন্ধকার তখন নিবিড়তর। বসার ঘরে কাউকে না দেখে সে ভিতরের ঘরে এল দ্রুত পায়ে।

'বাবা! তুমি কোথায় বাবা?'—উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে ডাকলে লুসি।

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না! কেবল কানে এল শোবার ঘর থেকে মৃদু হাতুড়ি পেটার শব্দ। পা টিপে-টিপে মাঝের ঘর পেরিয়ে বাবার ঘরের দরজায় উঁকি মারল লুসি। আর তার রক্তের স্রোত যেন হিম হয়ে এল। ভয়ে ছুটে বাইরে এসে আপন মনে বলতে লাগল লুসি—'এখন আমি কি করব? কি করব এখন?'

মনের বিহ্বলতা তক্ষুনি ঝেড়ে ফেলে দিলে লুসি। ফিরে এল বাবার ঘরে। দরজায় টোকা দিয়ে কোমল স্নিগ্ধ গলায় সাড়া দিল তাঁকে। মেয়ের গলা পেয়ে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ বন্ধ হল। ডাক্তার বাইরে এলেন। দু'জনে অনেকক্ষণ একসঙ্গে ঘরময় পায়চারী করলেন।

সেদিন রাত্রে কত বার বাবাকে দেখে গেল লুসি। দেখে গেল গভীর নিদ্রায় মগ্ন তিনি। তাঁর সেই জুতা তৈরীর যন্ত্রপাতি আর অসমাপ্ত কাজ যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল।

১০

সামনে ছুটি পড়বে। তার আগে ষ্টিভারের পর্বতপ্রমাণ কাগজ-পত্রের বকেয়া মেটাবার তাগাদায় গত কয়েক দিন ধরে দিন-রাত্রি উপরি পরিশ্রম করছিলেন সিডনী কার্টন। আজ অনেক দিন পরে কাজ হালকা হওয়ায় দু'জনে প্রফুল্ল মনে বসেছিলেন।

কাজের ভার লঘু হওয়ায় নিশুতি রাত্রের যাদু লেগেছিল মনে। তার উপর মদ্যপানে মন পুলকিত। সোফায় আরাম করে বসে ষ্টিভার বললেন—'আজ একটা নতুন খবর দিয়ে তোমায় অবাক করে দেব ভাবছি সিডনী! আমি বিয়ে করছি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তবে আগেই বলে রাখছি, বিয়ে করছি কিন্তু টাকার জন্য নয়।'

'কিন্তু ভাগ্যবতীটি কে?'

'আন্দাজ কর না?'

'সে আমার দ্বারা হবে না। এই রাত্রিশেষে দুর্বল মাথায় আমি বসে-বসে পৃথিবীর সমস্ত মেয়েদের নিয়ে তোলপাড় করতে রাজী নই। তার চেয়ে তুমি বলে ফেল্‌লে ঢের সহজে মিটবে জিনিষটা।'

ষ্টিভার তেমনি ঔদাসীন্য দেখিয়ে বললেন—'আমি মানুষটা কেমন তুমি নিশ্চয়ই মনে-মনে জান। আমাকে লোকে জানে খুবই সংসারী,

হিসেবী বলে কেন তাও তুমি জান। আদালতে বল আর সমাজেই বল, ও-রকম একটা ভাব আমাকে রাখতেই হয়। কিন্তু আমার মনের মধ্যে আর একটি পুরুষ বাস করে যে কাউকে দুঃখ দিতে চায় না। সকলকে আপন করে নিতে চায়। আর বিশেষ করে মেয়েদের মহলে—'

'তা আমি জানি। কিন্তু আত্মকাহিনী রেখে বিবাহের ব্যাপারটার—?'

মুখে বিরাট গাম্ভীর্য নিযে ষ্ট্রিভার সেই বিরাট রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রস্তুত হলেন। বন্ধুর দিকে ঈষৎ অনুকম্পা-ভরে চেযে বললেন—'তোমার কাছে এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু করা এই জন্য যে একদিন তুমিই তার সম্বন্ধে আমার কাছে কৃপা করে অনেক কথা বলেছিলে।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'নিশ্চযই বলেছ। আর এই ঘরে বসে।'

সিডনী কার্টন একবার বন্ধুর প্রশান্ত মুখের দিকে তাকালেন। তার পর মদের পাত্র নিঃশেষ করে নিলেন।

ষ্ট্রিভার বললেন—'যাকে তুমি একবার সোনালী চুল-বসান পুতুল বলেছিলে সেই মিস ম্যানেটের কথা বলছি আমি। যদি আমি না জানতাম যে, তোমার কথার কোন আক-ঢাক নেই, কোন বাধন-বাধ্যতা নেই, তবে সেই দিনই আমি বিশ্রী ভাবে আপত্তি করতাম তোমার কথায। কিন্তু তোমার কথায আমি রাগ করিনি। রাগ করব কি করে? যার দৃষ্টি নেই সে যদি আমার ছবির মর্ম না বোঝে তার ওপর রাগ করব কি করে? যার সুরেলা কান নেই সে সুরের বুঝবে কি বল?

সিডনী কার্টনকে কথা কইবার অবকাশ না দিযে ষ্ট্রিভার আবার বললেন—'তা ছাড়া তুমি জান, কারুর সম্পত্তির ওপর লোভ আমার

নেই। সে প্রত্যাশাও আমি করি না। মেয়েটি ভাল। তাকে নিয়ে সুখী হতে পারলেই আমি খুশী হব। আর খুশী হবার যথেষ্ট কারণ আছে আমার। আমার অবস্থা মোটামুটি ভালই। পসার এখন আমার বাড়তির মুখে। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও কিছু পেয়েছি তুমি জান। আমার না হোক, এ সব তার তো লোভের জিনিষ! কিন্তু সে মেয়ে এ সবের যোগ্য, তা আমি স্বীকার করবই। তুমি যেন কেমন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ, মনে হচ্ছে?'

'আমি কেন আশ্চর্য হতে যাব?'

'কিন্তু এ প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমার রায় কি?'

'আপত্তি করার যুক্তি পাচ্ছি কই?'

ষ্ট্রিভার এতক্ষণে হাল্কা কণ্ঠে বললেন—'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম এত সহজে তোমার সায় পাব না। তুমি তো জান, আমি মানুষটা জেদী। কিন্তু এই ধরণের জীবন কাটানোর একটা বদল চাইছে মন। ভাবছি একটি ঘর-সংসার নিয়ে মুখ বদল করি। লুসি ম্যানেটের মত মেয়ে সংসারে যে কোন পরিবেশে নিজের মত মানিয়ে নিতে পারবে। তাই আমি আর ফেলে রাখতে চাইলাম না। মন স্থির করে ফেললাম। আর তোমাকেও বলি সিডনী, তুমি যে ভাবে চলেছ তাতে তোমার ভবিষ্যৎ ভাল নয়। টাকা-পয়সার কোন মূল্য বোঝ না তুমি, যেমন-তেমন করে দিন কাটাও। অত পরিশ্রমের সঙ্গে এই রকম অমিতব্যয় —কোন দিন দেখবে রোগে পড়বে। বিপদ ঘটবে। তাই বলছি, তুমিও কোন স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করতে শেখ।'

সিডনী কার্টন বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। দেখলেন যে, বাক্যচ্ছটায় মানুষটি যেন আকারে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। বসে-বসে আরও শুনলেন।

'তাই বলছিলাম আমার উপদেশ মত চলো। বৈরাগ্য ছেড়ে গার্হস্থ্যে

এসে উপস্থিত হও। ভদ্র দেখে এমন একটি মেয়ে খুঁজে বার কর, যার কিছু পয়সা-কড়ি আছে। তার পর তাকে বিয়ে করে নিশ্চিন্ত হও। জানবে সে তোমার বিপদের দিনের বন্দর। কথাটা ফেলো না। ভাল করে ভেবে দেখো।'

সিডনী কার্টন স্বচ্ছন্দ গলায় বললেন—'ভেবে দেখব বন্ধু—নিশ্চয়ই ভেবে দেখব।'

১১

তার ঘরে বধূ হয়ে কত বড় ভাগ্যবতী হবে ডাক্তার দুহিতা, সে কথা মেয়েটিকে জানাবার জন্য ব্যগ্র হলেন ষ্ট্রিভার। সামনেই দীর্ঘ অবকাশ আসছে। ভাবলেন, বড়দিনের উৎসব বরাবর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করবেন। কিন্তু তার আগে কথাটা তাকে জানিয়ে খুঁটিনাটি আয়োজন স্থরু করার প্রয়োজন।

কত ভাবে সেই বহুমূল্য কথাটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন মনে-মনে। কোথায় গিয়ে জানাবেন সেই শুভ সন্দেশ? অনেক চিন্তার পর ঠিক করলেন যে, সোহোতে তাদের বাড়ীতেই কথাটা পাড়বেন। এ ধরণের পবিত্র প্রস্তাব গৃহ-পরিবেশেই ভাল।

সকালে পথে বেরিয়ে ষ্ট্রিভার যখন সোহোর দিকে পা বাড়ালেন, তখনও মনের দিগন্তে তরুণ স্বপ্নের মায়া। মস্ত মজবুত মানুষটি পথ দিয়ে যখন যান, লোকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। তাঁর প্রবল ভঙ্গীর বলিষ্ঠতা দেখে লোকে বোঝে যে, মানুষটির কাছে সবই নিশ্চিন্ত নিরাপদ।

টেলসন ব্যাঙ্কের পাশ দিয়েই যাবার পথ। টেলসন ব্যাঙ্কে কাজে-কারবারে লরির সঙ্গে তাঁর পরিচয়—তা ছাড়া ম্যানেট-পরিবারের একজন বিশেষ বন্ধু হিসেবেও জানেন লরিকে। কাজেই ষ্ট্রিভারের হঠাৎ খেয়াল হল, এ সুখ-সন্দেশটি লরিকেই পরিবেশন করে যাবেন। ব্যাঙ্কের দরজা ঠেলে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলেন ষ্ট্রিভার। হোঁচট খেয়ে দু'ধাপ নীচে নেমে দু'জন মান্ধাতার আমলের কেশিয়ারকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন সেই অন্ধকার নিরিবিলি স্থানটিতে, যেখানে লাইন-কাটা বিরাট জাবদা খাতা সামনে খুলে লরি ব্যস্ত নিজের হিসেবে।

'কেমন আছেন? সব কুশল তো?'

লরি করমর্দন করলেন ষ্ট্রিভারের সঙ্গে।

'কি করতে পারি আপনার জন্য'—ব্যবসায়ী চালে প্রশ্ন করলেন লরি।

'কোন প্রয়োজন নেই, ধন্যবাদ। ব্যবসার কাজে নয়, একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছি আপনার কাছে। একটা গোপন কথা আছে।'

'তাই নাকি'—আরো কাছে কান টেনে বললেন লরি। কিন্তু দৃষ্টি রইল সামনে সজাগ।

ডেস্কের উপর কনুইতে ভর দিয়ে নিজেকে বেশ করে গুছিয়ে নিয়ে বললেন ষ্ট্রিভার—'মিস ম্যানেটের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে যাচ্ছি।'

'সত্যি?'—থুতনিতে হাত বুলোতে-বুলোতে ষ্ট্রিভারের দিকে সংশয়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন লরি।

'হ্যাঁ! আপনি কি বলেন?'

'আমি? আমি—আমি আপনার দরদী বন্ধু, খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী। এ প্রস্তাব আপনার কৃতিত্বের কথা বৈ কি। তবে কি জানেন'—বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন লরি। তার পর যেন

অনিচ্ছা ভরেই বললেন জোর করে—'আসলে, বলতে গেলে জিনিষটা আপনার পক্ষে একটু বেশী—মানে আপনিই খুব বেশী—'

'দেখুন মিঃ লরি'—বেশ বড় করে নিশ্বাস টেনে ডেস্কের উপর একটা চাপড় মারলেন ষ্টিভার সশব্দে। তারপর চোখ বিস্ফারিত করে বললেন—'আপনার কথা একটুও বোধগম্য হল না।'

লরি কলমের পালক দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলেন।

ষ্টিভার সেদিকে তাকিয়ে কথার জের টেনে আবার বললেন—'কি আপনার ধারণা? আমি তার যোগ্য নই?'

'সে কি কথা? আপনি যদি ভাবেন যোগ্য, তার চেয়ে বড়ো কথা আর কি আছে?'

'আমার সমৃদ্ধির অভাব নেই।'

'তা তো বটেই।'

'আর আমার রোজগার এখন বাড়তির মুখে।'

'তার চেয়ে আর সত্য কি আছে!'

'তবে?'—দাবী করলেন বটে ষ্টিভার। কিন্তু মনে নিরুৎসাহের অন্ত রইল না।

'এখন চলেছেন কোথায়?'—প্রশ্ন করলেন লরি।

'সোজা সেখানে'—বলে ষ্টিভার সজোরে ঘুষি মারলেন টেবিলের উপর।

'আমি হলে যেতুম না।'

'কেন?—যেন সাক্ষীর উপর হামলা করছেন, এমনি ভঙ্গীতে তর্জনী উঁচিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ষ্টিভার—'আপনি ব্যবসাদার লোক। যেতেন না যখন, নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে তার। কারণটা খুলে বলুন কেন যেতেন না?'

'সাফল্যের কিছুমাত্র প্রত্যাশা যেখানে নেই সেখানে বেবাক আসা-যাওয়ায় লাভ কি বলুন ?'

'উঃ ! এ একেবারে চরম হল।'

লরি একবার দূরের দিকে আর একবার ক্রুদ্ধ ষ্ট্রিভারের দিকে তাকালেন। আর ষ্ট্রিভার আপন মনে বিড়-বিড় করতে লাগলেন—'এই লোক ! এই লোক ব্যবসাদার—বয়স হয়েছে—অভিজ্ঞতা আছে। দাম্পত্য-সৌভাগ্যের তিন-তিনটি জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ সত্ত্বেও বলেন কি না কোন কারণ নেই ? আর বলছেন সুস্থ মাথায় ?'

'আমি যে সাফল্যের কথা বলছি তা মেয়েটির সম্পর্কেই—' ষ্ট্রিভারের কনুইতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন লরি। 'মেয়েটিই হল আদি। তার জন্যই ত সব—'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, মেয়েটির সাংসারিক বুদ্ধি কিছু নেই।'

'না, সে রকম কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—' লরির মুখ লাল হয়ে উঠল—'তার সম্পর্কে ওরকম অসম্মানসূচক মন্তব্য কারুর মুখ থেকে শুনতে আমি রাজি নই। যার রুচি এত বিকৃত, মেজাজ এমন কটু যে, আমার সামনে এইখানে দাঁড়িয়ে তার সম্বন্ধে অসংযত ভাষা প্রয়োগ করে—তাকে আমি কোন মতেই ক্ষমা করতে পারি না। তাকে উচিত মত শিক্ষা দিতে আমি পিছপা নই, এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই।'

লরির কথায় ষ্ট্রিভারের বক্তে আগুন ধরে গেল। আর সেই উত্তেজনা কি ভাবে প্রকাশ করবেন তা ভেবে ষ্ট্রিভার অন্তরে গুমরে উঠতে লাগলেন।

'আমার উপর রাগ করবেন না—আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি'—বললেন লরি।

'আপনি আমাকে নতুন কথা শোনাচ্ছেন মিঃ লরি! আমি কিংস বেঞ্চ বারের ষ্টিভার, আমাকে আপনি তার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব না করতে উপদেশ দিচ্ছেন?'

'আপনি কি আমার উপদেশ চান?'

'চাই।'

'তা দিতে আমারও আপত্তি নেই মিঃ ষ্টিভার। আমার উপদেশ আপনি নিজেই উচ্চারণ করলেন এই মাত্র।'

মুখে বিরক্তির হাসি টেনে ষ্টিভার বললেন –'চমৎকার! আপনার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না মিঃ লরি।'

লরি সে কথা কানে তুললেন না। বললেন—'দেখুন, ও-সব কথায় আমার না থাকাই ভাল। তবে তাকে আমি শিশুকাল থেকে কোলে-পিঠে করেছি, তাদের পরিবারের আমি অনেক কালের বন্ধু— তাদেরকে বিশেষ স্নেহ করি বলেই এ কথা বললাম। অবশ্য বিচারের ভার আপনার।'

'আমায় মাপ করবেন মিঃ লরি।'

'ধন্যবাদ। দেখুন মিঃ ষ্টিভার, আমি নিজে বলতে চাই না তাতে আপনি হয়ত ভুল বুঝবেন। সেটা বেদনাদায়ক হবে আপনার পক্ষে— বাপ ও মেয়ের পক্ষেও। আপনি যদি আমার উপদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, আপনি স্বচ্ছন্দে এ নিয়ে একটু বাজিয়ে দেখতে পারেন। আর যদি মনে করেন, আমার উপদেশের কোন সার আছে তাহলে বলব আর অগ্রসর না হওয়াই সব দিক থেকে সমীচীন হবে।'

'আমাকে কতক্ষণ সহরে আটকে রাখবেন?'

'মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আমি বিকেলে সোহোতে যাব— সেখান থেকে পরে আপনার চেম্বারে গিয়ে খবর দিতে পারি।'

'বেশ তাই হোক। আমি সেখানে যাব না। অবশ্য যাওয়ার মত

জরুরী তাগিদ আমারও নেই। আজ রাত্রে আপনাকে আশা করতে পারি? আচ্ছা চলি—'

যেমন এসেছিলেন, তেমনি সশব্দে বিদায় নিলেন।

যথারীতি রাত দশটায় লরি ষ্টিভারের সঙ্গে দেখা করলেন তার চেম্বারে। চারি দিকে ছড়ান স্তূপাকার কাগজ-পত্তরের ভিড়ে বসে আছেন ষ্টিভার। সকালের ব্যাপারটা যেন তিনি ভুলেই গেছেন এমন ভাব দেখালেন—এমন কি লরিকে দেখে পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আধ ঘণ্টা রীতিমত চেষ্টার পর সকালের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন লরি।

'সোহোতে গিয়েছিলাম।'

'সোহো?' ও—আমি অন্য কথা ভাবছিলাম'—সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বললেন ষ্টিভার।

'কথাবার্তায় যা বুঝলাম, আমি সকালে যা বলেছিলাম তাই ঠিক। আমি আমার উপদেশের পুনরাবৃত্তি করছি।'

'আমি আপনার ও মেয়েটির বাবার জন্য দুঃখিত। জানি, সে পরিবারে এটা চিরকাল একটা গভীর ক্ষত হয়ে থাকবে। এ সম্বন্ধে আর আলোচনা না করাই ভাল।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'একেবারে না বলতে সাহস হচ্ছে না—তবে আর প্রয়োজন নেই।'

'আছে বই কি।'

'না, প্রয়োজন নেই। ভুল করতে যাচ্ছিলাম, ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। তাতে কারুর ক্ষতি হয়নি। মেয়েরা এ রকম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আগেও বহুবার দিয়েছে। জিনিষটার এইভাবে যবনিকাপাত হওয়ায় আমি দুঃখিত, কিন্তু স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে আমি সুখীই হয়েছি। সংসারের দিক থেকে খতিয়ে দেখতে গেলে এ বিয়েতে আমার যে কোন লাভই হত না সেটা বলাই

বাহুল্য। যাক্, কোন ক্ষতি হল না কোন পক্ষেরই। মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করিনি, ভালই করেছি। এখন ভেবে দেখছি, অত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারতাম কি না সন্দেহ। মিঃ লরি, আপনি এই সমস্ত শূন্য-মস্তিস্ক দেমাকী মেয়েদের বাগে আনতে পারবেন না। যাক ও কথা। ওদের জন্য দুঃখ হয় যখন ভাবি—তবে নিজের তরফে আমি খুশীই হয়েছি। আপনার সঙ্গে আলোচনার জন্য—আপনার অমূল্য উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আপনি ওদের ভাল জানেন। আপনি ঠিকই বলেছেন—এ বিয়ে হত না।'

ষ্ট্রিভারের হঠাৎ এই শুভ বুদ্ধি উদয়ে এবং অকৃপণ শুভেচ্ছা বর্ষণে লরি এত বিস্মিত হলেন যে, রীতিমত বোকা বনে গেলেন। ষ্ট্রিভার আবার বললেন—'আর একটিও কথা নয়। আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি!'

সম্পূর্ণ ধাতস্থ হবার আগেই লরি এসে রাস্তায় নামলেন। আর ষ্ট্রিভার শোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে কড়িকাঠ গুণতে লাগলেন।

১২

ডাক্তার ম্যানেটের বাড়ীতে গত এক বছর ধরে সিডনী কার্টনের ভূমিকা নিছক দর্শকের। প্রায়ই আসেন যান। কিন্তু সে আপন খেয়ালে। যখন কথা কন, মানুষটি আলাপে ঝক্‌মক্ করে ওঠেন। কিন্তু সে মেজাজ আসে ক্বচিৎ কদাচিৎ। তাঁকে ঘিরে যেন দুর্ভেদ্য কুয়াশা। তার আড়ালে সূর্য আছে মনে হয় না।

কিন্তু এই বাড়ীর আশে পাশে যত পথ যত পাথর সব কিছুতেই তাঁর

নেশা। কত রাত্রি সেই পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ান। মদ যখন শান্তি দিতে পারে না মনে, এই সব পথে ঘুরে বেড়ান অতৃপ্ত প্রেতের মত। ভোরের আলোয় তাঁর সঙ্গিহীন ভ্রাম্যমান দেহটি চোখে পড়ে। তার পর যখন রোদে ঝলকিত হয়ে ওঠে চারি দিক, তখন তাঁর ঘোর কাটে। আবার সব মনে পড়ে। যা ভুলেছিলেন সব, যা তাঁর পাওয়ার অতীত তাও।

আজকাল আর রাত্রে ঘুমুতে পারেন না। যেদিন বা বিছানায় আশ্রয় নেন, তক্ষুনি উঠে পড়েন। সেই একখানি বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান উদ্‌ভ্রান্তের মত।

এমনি একদিন বিহ্বলের মত ঘুরতে-ঘুরতে সিডনী কার্টন এসে দাঁড়ালেন ডাক্তারের দরজায়। কি এক রুদ্ধ আবেগে যন্ত্রচালিতের মতই এসে পড়লেন যেন।

বাড়ীতে লুসি একা সংসারের কাজ করছিল। এই মানুষটিকে নিয়ে সে বড় বিব্রত বোধ করে। আজও একে একলা পেয়ে তার মনে অস্বস্তির অন্ত রইল না। কিন্তু কার্টনের মুখের দিকে চেয়ে লুসি আজ অবাক হল।

'আপনার শরীর বোধ হয় সুস্থ নেই মিঃ কার্টন ?'

'সত্যিই ভাল নেই। কিন্তু আমার এর চেয়ে ভাল থাকার কথাও নয় মিস ম্যানেট।'

'কেন নয় ? কেন ভাল ভাবে থাকেন না ?'

কোমল দৃষ্টি তুলে মানুষটির দিকে তাকাতেই লুসির সারা অন্তর ব্যাথায় ভরে গেল। দেখলে তাঁর দুটি চোখই অশ্রুসিক্ত। লুসি শুনলে তার অশ্রুরুদ্ধ কথা—'বড়ো দেরী হয়ে গেছে। আর ফেরবার পথ নেই আমার। এখন কেবল নেমে যাওয়া। ধাপে-ধাপে নীচে নামা।'

টেবিলের উপর কনুই রেখে করতল দিয়ে মুখ ঢেকে বসলেন সিডনী

কার্টন। আর লুসি দেখল, সেই অপার নৈঃশব্দের মধ্যে টেবিলটি থরথর করে কাঁপছে।

এমন করে তার নারী-হৃদয় কোন দিন কারুর জন্য কাঁদেনি। সে কথা যেন মুখ না তুলেও বুঝতে পারলেন কার্টন। তেমনি ভাবেই বললেন—'আমি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছি মিস ম্যানেট। আমায় মাপ করবেন। আমি কিছু বলতে চাই আপনাকে।'

'বলে যদি আপনার মন হাল্কা হয় মিঃ কার্টন, আপনি বলুন। আমি নিশ্চয়ই শুনব।'

'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন মিস ম্যানেট! আপনার এ মমতা আমি ভুলব না।'

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললেন কার্টন। তার পর সংযত কণ্ঠে বললেন—'আমার কথা শুনে ভয় পাবেন না। মুখ ফিরিয়ে নেবেন না যেন ঘৃণায়। কত কাল আগে মরে-যাওয়া প্রেত-শরীর বয়ে বেড়াচ্ছি আজো। আমার সমস্ত জীবনটাই একটা মরীচিকা।'

'না, না, মিঃ কার্টন। আপনার উজ্জ্বল জীবন তো সামনে। আপনি আরো কত বড়—কত বড় হতে পারেন।'

'আপনি বললেন এ কথা, শুনে বড় তৃপ্তি হল। জানি সে কত মিথ্যে, কিন্তু শুনতে বড় ভাল লাগল—বড় ভাল লাগল।'

ভিতরে চাপা আবেগে পাংশুমুখে থর থর করে কাঁপছিল লুসি। কার্টন এসে তার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। আপন-আপন গভীর দুঃখে দুঃখী দুটি নর-নারী একান্ত হয়ে দাঁড়াল।

'আপনার সামনে এই আমি দাঁড়িয়ে আছি মিস ম্যানেট! একটা মাতাল, অমিতাচারী, সংসারের জঞ্জাল। কিন্তু আমার ভালবাসা,—আমার ভালবাসা যদি আপনি কোন দিন হাত পেতে নিতেন, না—না, তার যোগ্য মর্যাদা আমি দিতে পারতাম না। হয়ত আপনাকেই আমি

অসম্মানে টেনে নামিয়ে আনতাম। আমার মত লোকের ওপর আপনার কোন প্রীতি থাকতে পারে না। তা আমি চাইও না। ভগবান করুন, তা যেন কখনো না হয়—কখনো না হয়।'

'আর কি করতে আমি পারি বলুন? আর কি করলে আপনার উপকারে লাগতে পারি আমি? এ বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারি'—করুণ মমতার অশ্রুতে বিগলিত কণ্ঠে লুসি বললে—'এমন করে আপনি আর কোন মেয়ের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন না, তা আমি জানি। আমাকে দিয়ে কি আপনার কোন উপকারই হতে পারে না মিঃ কার্টন?'

কার্টন মাথা নাড়লেন। তার পর বললেন—'না, মিস ম্যানেট। আর কেউ আমার কথা জানবে না। শুধু আপনি জেনে রইলেন যে, এই দুর্ভাগা মানুষটার স্তিমিত চেতনা আপনার কাছে স্ফুলিঙ্গ পেয়ে একবার মাত্র জ্বলে উঠেছিল। আপনি আমার স্বর্গের স্বপ্ন। স্বপ্ন বটে কিন্তু স্মৃতিতে অক্ষয়।'

'শুধু স্বপ্ন?'

'তাই বটে। তবু আমার কাছে তার দাম অনেক।'

'সে দুর্ভাগ্য আমারও বড় কম নয়। আমার সংস্পর্শে এসে আপনি অসুখী হলেন। আমাদের দেখা না হওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল।'

'ও কথা বলবেন না। আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার ভাল না হোক মন্দের ভয় ঘুচে গেল।'

লুসি ম্যানেটের করচুম্বন করলেন সিডনী কার্টন। বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললেন—'আমার কথায় কোন ক্ষোভ রাখবেন না মিস ম্যানেট! জীবনের পথ চলতে কত কথা কানে আসে, এও তার একটি। আর কোন দিন এ কথা আমি উচ্চারণ করব না। যেদিন

মৃত্যু এসে দাঁড়াবে শিয়রে, সেদিন এই সান্ত্বনা নিয়ে যাব যে, একটি নিষ্পাপ নারী-হৃদয়ে আমার দুঃখের কাহিনী জমা হয়ে রইল আর এই দুর্ভাগার জন্যে ক্লান্তিহীন ক্ষমা। ভগবান আপনার অশেষ মঙ্গল করুন।' —বলে সিডনী কার্টন সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

১৩

টেলসন ব্যাঙ্কের বাইরের দরজার কাছে একখানা টুল নিয়ে বসে থাকে জেরেমিয়া। পাশে থাকে তার ছেলে জেরি। অফিসের সময় এই রাস্তায় লোকের ভিড়ের অন্ত থাকে না। বিরাম থাকে না হৈ-চৈ কলরবের।

শুধু সেই অবিরাম জনস্রোত আর ব্যস্ততার মধ্যে টেলসন ব্যাঙ্কের প্রহরী দাঁতে কাঠি গুঁজে চুপচাপ সব লক্ষ্য করে।

এমনি একদিন বসে থাকতে থাকতে বিরাট হৈ-চৈ শুনে জেরেমিয়া উঠে এল। দেখলে একখানা শব-টানা গাড়ীর পিছনে হৈ-হৈ করে লোক ছুটছে। একটা গোলমাল পাকানোর সম্ভাবনায় দোকানদাররা ঝাঁপ নামাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। মারমুখো জনতাকে ভয় করে কিনা সবাই।

সব গণ্ডগোল ছাপিয়ে শুধু দুটো কথা বার বার কানে এল জেরেমিয়ার। স্পাই! স্পাই!

শুনে তার অবধি রক্তে আগুন লাগল। কাছাকাছি একটা লোককে পেয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল তাকে—'ব্যাপার কি ভাই? এত হল্লা কিসের?

'কে জানে!'

জেরেমিয়া আর একজনকে জিজ্ঞাসা করল।

উত্তেজনায় লোকটার গলা কাঁপছিল। বললে—'কি ব্যাপার জানি না। এক জন গুপ্তচর মরেছে। তাকে নিয়েই হৈ-চৈ লেগেছে।'

শেষ অবধি ওয়াকিবহাল লোকের কাছে পাকা খবর পেলে জেরেমিয়া।

লোকটার নাম ছিল রজার।

'স্পাই বুঝি?'

'সাংঘাতিক, স্পাই।'

'মরে গেছে?'

আর কে সাড়া দেয় কথার! সমুদ্র-গর্জনের মত জনতা তখন চেঁচাচ্ছে—'টেনে বার কর গাড়ী থেকে। টেনে বার কর।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত জনতা গাড়ী দুটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে লোকটা শবযাত্রী সেজে যাচ্ছিল সে ভয়ে চম্পট দিল পাশের গলি দিয়ে।

জনতা মহা আনন্দে লোকটার পোষাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চারি দিকে ছড়িয়ে দিল। আশে-পাশে দোকানীরা ভয়ে তাড়াতাড়ি দোকানপাট বন্ধ করে দিতে লাগল। সে-যুগে এই উচ্ছৃংখল জনতাকে লোকে দুর্দান্ত রাক্ষসের মত ভয় করত। যে-কোন-কিছু করতে তাদের বাধত না। এক দল বললে—'বার কর মড়াটাকে।' আর এক দল বললে—'দূর্, চ' না টেনে নিয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে জনা আষ্টেক লোক গাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ল—জনা বারো রইল বাইরে আর ছাদের উপরে যত জন ধরল উঠে পড়ল। এই দলে যোগ দিল জেরেমিয়া।

সরকারের লোক শবযাত্রায় জনতার এই অন্যায় হস্তক্ষেপে মৃদু প্রতিবাদ জানাতে এসেছিল, কিন্তু লোক ক্ষেপে তাকেই নদীর জলে ফেলে দেবার ভয় দেখালে। লোকটিও ভয়ে নিজের পথ দেখল।

গগনবিদারী চীৎকারে প্রাণে আতংক লাগিয়ে মদমত্ত জনতা অগ্রসর হতে লাগল। আর প্রতি পদক্ষেপেই স্ফীত হতে লাগল জনতার কলেবর। শেষ অবধি জনতা জোর করে গিয়ে ঢুকল গীর্জার কবরখানায়।

কিন্তু উচ্ছৃংখল জনতার তৃপ্তি হল না এটুকুতে। তখন সুরু হল নিরীহ পথচারীদের উপর হামলা। কত নিরীহ পথচারী যে জনতার হাতে নিগৃহীত হল তার ইয়ত্তা রইল না। তার পর আমোদের শেষ পরিণতি হল লুঠতরাজে। দোকান-বাড়ী ভেঙে লুটপাট করলে জনতা, রাস্তার মোড়ের রেলিং ভেঙ্গে তাই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। হঠাৎ খবর রটে গেল পুলিশ আসছে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে জনতাও পাতলা হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল। হয়ত সৈন্যরা এসেছিল শেষ পর্যন্ত—হয়ত আসেই নি। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতার রীতিই এই।

জেরেমিয়া শেষ পর্যায়ে এই উন্মত্ত জনতার দলে ছিল না। জনতা বাইরে গেলে সে একলা কবরখানায় বসে রইল। সেখানকার শান্ত নির্জন পরিবেশের প্রলেপে তার উত্তেজনা ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে এল। তখন ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার আগেই যাতে সেখানে পৌছতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কদমে-কদমে পা বাড়ালে। এসে দেখলে, ছেলে নিজের জায়গাটি ছেড়ে যায়নি কোথাও। কেউ তাকে খোঁজও করেনি। ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে কেরাণী বাবুরা যে-যার বাড়ী চলে গেলে বাপ ও ছেলে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

রাত্রে খাওয়ার সময় স্ত্রী জিজ্ঞেস করল—'রাত্রে বাইরে যাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাবা ?'—বায়না ধরলে ছেলে।

'না না—আমি যাচ্ছি মাছ ধরতে। তোর মা জানে। তুই কাথায় যাবি ? তুই না ঘুমুলে আমি যাবই না জেরি।'

রাত গভীর হলে জেরি শুতে গেল। তার পর কতক্ষণ জেগে রইল জরেমিয়া। একটা বাজতে যাত্রার উদ্যোগ করল সে। পকেট থেকে াবী নিয়ে আলমারী খুললে। একটি থলে, দড়ি, শাবল, শেকল—এই াতীয় আরো অনেক মাছ ধরবার সাজ-সরঞ্জাম বার করলে। তার পর জনিষগুলি গুছিয়ে নিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ড়ল।

জেরি এতক্ষণ ঘুমের ভাণ করে জেগে শুয়েছিল। বাপ বার হয়ে াওয়া মাত্র সেও উঠে পিছু নিল বাপের। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ড় ছেড়ে সিঁড়ি পেরিয়ে সটান রাস্তায় এসে নামল। ফিরে বাড়ী াকার কোন অসুবিধে নেই। নানা ভাড়াটের বাস বাড়ীটিতে। দর দরজা সারা রাত হাট হয়ে খোলাই থাকে।

বাপ যাতে না দেখতে পায়, ভয়ে-ভয়ে দেয়াল ঘেঁসে পা টিপে-পে এগুতে লাগল জেরি। ইতিমধ্যে আর এক জন লোক এসে বাপের ঙ্গে যোগ দিয়েছে, দু'জনে একসঙ্গে আগে-আগে যাচ্ছে।

আধ ঘণ্টা হাঁটার পর তারা মিটি-মিটি আলো আর পাহারাওয়ালাদের এলাকা ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তায় এসে পড়ল। এইখানে আরও এক-জন যাগ দিলে তাদের সঙ্গে।

চলতে চলতে রাস্তার ধারে এক উঁচু বাঁধের গায়ে এসে গতি রুদ্ধ হল াদের। বাঁধের পাড়ে লোহার রেলিং দেওয়া ইটের গাঁথুনি। বাধের ীর্ঘ কালো ছায়া পড়েছে রাস্তায়। তারা রাস্তা ছেড়ে একটি কানা-লিতে ঢুকল। গলির দিকটায় বাঁধের যে অংশ পড়েছে তার উচ্চতা আট কি দশ ফিট হবে। জেরি সবিস্ময়ে দেখল, তার বাবা লোহার গেট টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল—তার পর সঙ্গী দু'জনও। তারা

মাটিতে পড়ে কয়েক মিনিট নিশ্চল হয়ে রইল—তার পর হামাগুড়ি টেনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

জেরিও তাদের পদাংক অনুসরণ করল। অগ্রবর্তী দল দীর্ঘ ঘাস ঠেলে গুঁড়ি মেরে চলেছে। এটি গীর্জা-সংলগ্ন কবর-প্রান্তর। গীর্জাটাকে স্তিমিত আলোয় দেখাচ্ছিল বিরাটকায় দৈত্যের মত। জেরির গা ছম-ছম করতে লাগল। তিন জন খানিকটা হামা টেনে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর সুরু হল তাদের কাজ।

প্রথমে খোন্তা পরে শাবল—দ্রুত-হাতে কাজ করতে লাগল তারা। এই শ্মশান-নিস্তব্ধতায় গীর্জা-ঘড়ির বিশ্রী আওয়াজ শুনে ভয়ে জেরির চুল খাড়া হয়ে উঠল—ছুট দিল সে সেখান থেকে। কিন্তু তক্ষুনি কৌতূহলের তাড়নায় ফিরে আসতে বাধ্য হল। গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল—তখনও অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে তারা। স্ক্রু খোলার শব্দ পেল জেরি—ক্রমশঃ মাটি ফাঁক হয়ে গেল—এইবার কফিনের বাক্সের ডালা খুলতে লাগল তার বাবা। দেখে এত ভয় পেল জেরি যে, আবার সে ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে এবং এক মাইলের আগে আর থামল না। থামল যখন দম নেওয়ার প্রয়োজন হল। আর মনে হল কফিনের লোকটা বুঝি তাকে পিছনে তাড়া করে আসছে। এই প্রবল আতংক পিছে নিয়ে জেরি ছুটতে ছুটতে একেবারে বাড়ী—সিঁড়ি টপকে নিজের ঘরে এসে বিছানায় লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে মুখ গুঁজে শুতেই চোখের পাতা সীসের মত ভারী হয়ে এল ঘুমে। তার পর মনে রইল না কিছু।

পরের দিন সকালে খাওয়ার সময় পাতে মাছ পড়ল না। এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলে না জেরি। যথাসময়ে হাত-মুখ ধুয়ে বেশ পরিবর্তন করে বাপ ছেলেকে নিয়ে রোজকার মত কাজে চলল।

'না না—আমি যাচ্ছি মাছ ধরতে। তোর মা জানে। তুই কোথায় যাবি? তুই না ঘুমুলে আমি যাবই না জেরি।'

রাত গভীর হলে জেরি শুতে গেল। তার পর কতক্ষণ জেগে রইল জেরেমিয়া। একটা বাজতে যাত্রার উদ্যোগ করল সে। পকেট থেকে চাবী নিয়ে আলমারী খুললে। একটি থলে, দড়ি, শাবল, শেকল—এই জাতীয় আরো অনেক মাছ ধরবার সাজ-সরঞ্জাম বার করলে। তার পর জিনিষগুলি গুছিয়ে নিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জেরি এতক্ষণ ঘুমের ভাণ করে জেগে শুয়েছিল। বাপ বার হয়ে যাওয়া মাত্র সেও উঠে পিছু নিল বাপের। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘড় ছেড়ে সিঁড়ি পেরিয়ে সটান রাস্তায় এসে নামল। ফিরে বাড়ী ঢোকার কোন অসুবিধে নেই। নানা ভাড়াটের বাস বাড়ীটিতে। সদর দরজা সারা রাত হাট হয়ে খোলাই থাকে।

বাপ যাতে না দেখতে পায়, ভয়ে-ভয়ে দেয়াল ঘেঁসে পা টিপে-টিপে এগুতে লাগল জেরি। ইতিমধ্যে আর এক জন লোক এসে বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, দু'জনে একসঙ্গে আগে-আগে যাচ্ছে।

আধ ঘণ্টা হাঁটার পর তারা মিটি-মিটি আলো আর পাহারাওয়ালাদের এলাকা ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তায় এসে পড়ল। এইখানে আরও একজন যোগ দিলে তাদের সঙ্গে।

চলতে চলতে রাস্তার ধারে এক উঁচু বাঁধের গায়ে এসে গতি রুদ্ধ হল তাদের। বাঁধের পাড়ে লোহার রেলিং দেওয়া ইটের গাঁথুনি। বাধের দীর্ঘ কালো ছায়া পড়েছে রাস্তায়। তারা রাস্তা ছেড়ে একটি কানা-গলিতে ঢুকল। গলির দিকটায় বাঁধের যে অংশ পড়েছে তার উচ্চতা আট কি দশ ফিট হবে। জেরি সবিস্ময়ে দেখল, তার বাবা লোহার গেট টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল—তার পর সঙ্গী দু'জনও। তারা

মাটিতে পড়ে কয়েক মিনিট নিশ্চল হয়ে রইল—তার পর হামাগুড়ি টেনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

জেরিও তাদের পদাংক অনুসরণ করল। অগ্রবর্তী দল দীর্ঘ ঘাস ঠেলে গুঁড়ি মেরে চলেছে। এটি গীর্জা-সংলগ্ন কবর-প্রান্তর। গীর্জাটাকে স্তিমিত আলোয় দেখাচ্ছিল বিরাটকায় দৈত্যের মত। জেরির গা ছম-ছম করতে লাগল। তিন জন খানিকটা হামা টেনে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর সুরু হল তাদের কাজ।

প্রথমে খোন্তা পরে শাবল—দ্রুত-হাতে কাজ করতে লাগল তারা। এই শ্মশান-নিস্তব্ধতায় গীর্জা-ঘড়ির বিশ্রী আওয়াজ শুনে ভয়ে জেরির চুল খাড়া হয়ে উঠল—ছুট দিল সে সেখান থেকে। কিন্তু তক্ষুনি কৌতূহলের তাড়নায় ফিরে আসতে বাধ্য হল। গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল—তখনও অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে তারা। স্ক্রু খোলার শব্দ পেল জেরি—ক্রমশঃ মাটি ফাঁক হযে গেল—এইবার কফিনের বাক্সের ডালা খুলতে লাগল তার বাবা। দেখে এত ভয় পেল জেরি যে, আবার সে ছুটতে লাগল উর্ধশ্বাসে এবং এক মাইলের আগে আর থামল না। থামল যখন দম নেওয়ার প্রযোজন হল। আর মনে হল কফিনের লোকটা বুঝি তাকে পিছনে তাড়া করে আসছে। এই প্রবল আতংক পিছে নিযে জেরি ছুটতে ছুটতে একেবারে বাড়ী—সিঁড়ি টপকে নিজের ঘরে এসে বিছানায লাফিযে পড়ল। ভযে মুখ গুঁজে শুতেই চোখের পাতা সীসের মত ভারী হযে এল ঘুমে। তার পর মনে রইল না কিছু।

পরের দিন সকালে খাওয়ার সময় পাতে মাছ পড়ল না। এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলে না জেরি। যথাসময়ে হাত-মুখ ধুয়ে বেশ পরিবর্তন করে বাপ ছেলেকে নিযে রোজকার মত কাজে চলল।

১৪

প্যারিসের সেই মদের দোকান আজকাল খোলে সকাল সকাল। ভোর ছটার আগেই ভেতরে লোক ভিড় করে। শিক-লাগান জানালার বাইরে থেকে বিবর্ণ চোয়াড়ে লোকগুলো উঁকি-ঝুঁকি মারে।

সবই জমজমাট চলছে। শুধু একটি লোক নেই। সে মালিক। আর এমন সব খদ্দের যে, দোকানে এত ভিড় সত্বেও কেউ দোকানের মালিকের খবর জিজ্ঞাসা করে না। শুধু তাই কি, একবার তাকিয়েও দেখে না কেউ সেই শূন্য আসনটির দিকে, যেখানে মাদাম ত্যফর্জ বসে একলা মদ দিচ্ছেন,—গুণে নিচ্ছেন পয়সা।

কেমন যেন সব ছাড়া-ছাড়া ভাব। যেন মন নেই, মন নেই। রাজার গুপ্তচরেরা সর্বত্র নজর রাখে। তারাও মাঝে মাঝে উঁকি মারে। কিন্তু কিছুই যেন ধরতে-ছুঁতে পারে না এই দোকানের। যে যার ইচ্ছা মত মদ খায়—বসে বসে টেবিলে আঁক কাটে, তাসের আড্ডা ঝিমিয়ে থাকে। আর নির্জীবের মত বসে মেয়েটি কেবল জামার হাতা বোনে। আর মাথা নামিয়ে সতর্ক হয়ে কি যেন শোনে।

এমনি করে বেলা গড়িয়ে যায়। দুপুরের দিকে মালিক আর এক-জন সঙ্গী নিয়ে এসে দোকানে ঢুকল।

একবার চকিতে সবাই মুখ তুললে। তার পর আবার যে যার ইচ্ছা মত বসে রইল। যারা মুখ তুলেছিল সবাই একবার এদিক-ওদিক চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'কেমন আছ ভাই সব ?.ভাল ত ? হাওয়া বড়ই খারাপ পড়েছে।' স্ত্রীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিল সঙ্গীর। বললে—'এক গ্লাস মদ দাও ওকে।'

লোকটি জামার ভেতর থেকে একখানা কালো রুটি বার করলে। সেই রুটি চিবুতে চিবুতে মদ খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে দোকানদার বন্ধুকে বললে—'ঘর দেখিয়ে দি, চল। পছন্দ হবে নিশ্চয়ই।'

মদের দোকান থেকে বেরিয়ে উঠোন। উঠোন পেরিয়ে খাড়া সিঁড়িপথে উঠে সেই ছাদ-লাগোয়া ঘর। একদিন এই ঘরেই বসে এক জন বিস্মৃতস্মৃতি বৃদ্ধ জুতো সেলাই করত আপন মনে। ছোট মেয়ের পায়ের জুতো।

আর তিন জন আগে এসেই বসে ছিল। এখন সঙ্গীকে নিয়ে এসে ত্যফর্জ সতর্ক ভাবে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল—'এইবার বল।'

নীল টুপিটা হাতে নিয়ে কপালের ঘাম মুছে লোকটি বললে—'কোথা থেকে সুরু করব?'

'একেবারে গোড়া থেকে।'

লোকটি শুরু করে তার কাহিনী:

'গত বছর গরম কালে লোকটাকে আমি মারকুইসের গাড়ীর নীচে শেকলে ঝুলতে দেখেছিলাম। সন্ধ্যে হয়-হয়। সূর্য ডুবু-ডুবু। মারকুইসের গাড়ী পাহাড় ঠেলে উঠছিল। আমি হাতের কাজ রেখে সরে দাঁড়াতেই দেখলুম একটা লোক গাড়ীর তলায় শেকলে ঝুলছে।'

'এর আগে তাকে দেখেছিলে কখনো?'

'না, না।'

'এত দিন পরে লোকটাকে চিনতে পারলে কি করে?'

'তার লম্বা চেহারা দেখে। সেদিনও সন্ধ্যায় মারকুইস জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেমন দেখতে দেখ তো। আমি বলেছিলাম—'ভূতের মত ঢ্যাঙা।'

'তোমার বলা উচিত ছিল বেঁটে।'

'আমি কি তখন জানতাম স্পাই। আর তখনো তো মারকুইসকে খুন করেনি সে। তেমন কিছু বলেওনি আমাকে। আমিও নিজের কোন পরিচয় দিইনি।'

'বেশ করেছিলে। তার পর।'

মুখ-চোখে একটা রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে লোকটি আবার সুরু করল—'সেই থেকে লোকটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কত খোঁজাখুঁজি করেছি। ন—দশ—এগার মাস কেটে গেল।'

'সেদিন আমি পাহাড়ের পথে কাজে ব্যস্ত—সেদিন সূর্য তেমনি ডুবু-ডুবু। কাজের শেষে গাঁয়ে ফিরে আসার জন্য যন্ত্রপাতি জড় করছিলাম। অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে। হঠাৎ চোখ তুলে সামনে তাকাতেই দেখি, পাহাড়ের উপর থেকে ছ'জন সৈন্য নেমে আসছে। আর তাদের মাঝখানে তেমনি ঢ্যাঙা একটি লোক। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। আমি এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। কাছ বরাবর আসতেই লোকটাকে চিনতে পারলাম। সেও চিনতে পারলে আমায়।

'আমি যে তাকে চিনি, কিম্বা সে যে আমায চেনে তেমন ভাব আমরা কেউ-ই দেখাইনি। চোখে-চোখে আমাদের পরিচয় হল। আমি তাদের পিছু-পিছু যেতে লাগলাম। এমন আঁট করে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল লোকটাকে যে তার হাত দুটো ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছিল। পায়ের কাঠের জুতো-জোড়া একটু বড়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল সে। সৈন্যরা বন্দুকের গুঁতো মেরে-মেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল তাকে।

'তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারায় পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। সৈন্যরা হেসে উঠল—টেনে তুলল তাকে। মুখ দিয়ে তার রক্ত পড়ছিল। সারা মুখ ধুলোয় মাখা হয়ে গেছে। কিন্তু

মুখ মোছবার ক্ষমতা নেই। তার দুর্দশায় সৈন্যদের আমোদ দেখে কে! তারা তাকে গাঁয়ে নিয়ে এল—গাঁয়ের লোকেরা ছুটে দেখতে এল তাকে। তার পর জেলখানায় নিয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা দেখল—জেলের ফটক খুলে গেল। আর সেই রাতের গাঢ় অন্ধকারে কারাগার যেন দৈত্যের মত বিরাট হাঁ করে গিলে ফেলল তাকে।'

এতখানি হাঁ করে লোকটা আবার শব্দ করে মুখ বন্ধ করলে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে সে।

'গাঁয়ের লোকেরা ফিরে গেল। সেখান থেকে ফিরে সব জমায়েত হল ঝরণার ধারে। কানাকানি হতে লাগল কত রকম। তার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সারা গাঁ। জেলের লোহার গরাদের আড়ালে তালাবন্দী মানুষটার কথা দুঃস্বপ্ন হয়ে রইল সারা রাতের ঘুমে। জেলে যে একবার ঢোকে, জীবন্ত আর সে কখনো ফেরে না। পরের দিন সকালে রুটি খেয়ে যন্ত্রপাতি কাঁধে করে কাজে যাওয়ার আগে জেলের চার পাশটা একবার ঘুরে দেখে আসতে গেলাম। দেখলাম, ঐ উঁচুতে লোহার খাঁচায় রক্তাক্ত ধূলিমাখা লোকটা বসে আছে। হাতে তার শেকল। আমার দিকে চেয়ে সে হাত নাড়তে লাগল। তাকে ডাকতেও সাহস হল না আমার।'

জ্যাফর্জ আর বাকি তিন জন মুখ-চাওযাচায়ি করল। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে প্রতিহিংসার আগুন।

'বলে যাও—থেম না'—বললে জ্যাফর্জ।

'কদিন লোকটা রইল সেই লোহার খাঁচায়। গায়ের লোকেরা চুরি-চামারি করে দেখা-সাক্ষাৎ করত তার সঙ্গে। কিন্তু দূর থেকে। কাছে ঘেঁসত না। দিনের কাজ শেষ হলে ঝরণার ধারে জটলা চলত কিন্তু সবার চোখ মন পড়ে থাকত সেই বন্দিশালার দিকে। কানাকানি হত, হয়তো বা লোকটাকে ফাঁসীতে লটকাবে না। রাজার কাছে আপীল

হয়েছে। মারকুইসের গাড়ীর নীচে পড়ে রাস্তায় ছেলে মরে যেতে লোকটি রাগে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সে খুন করেছে। রাজার কাছে আপীল হয়েছে শুনেছি। সত্যি কি না জানি না।'

'সে কৃতিত্ব কার জান? ঘোড়ার লাথি আর দারোয়ানের চাবুক খেয়ে গ্যফর্জ সেই আপীল পৌছে দিয়েছে স্বয়ং রাজার হাতে।'

'ও কথা থাক। তুমি বল তোমার গল্প।'

'মারকুইস ছিলেন জমিদার। প্রজাদের মা-বাপ। তাদের মনিব। তাকে যে খুন করেছে তার ফাঁসী হবেই হবে। কত গুজব রটল মুখে-মুখে। রবিবার রাত্রে সারা গাঁ যখন ঘুমে অচৈতন্য তখন সৈন্যেরা এল। সারা রাত চলল মজুরদের মাটি খোঁড়া—হাতুড়ী পেটা। চলল সৈন্যদের হাসি আর গানের হল্লা। সকালে সবাই দেখলে ঝরণার ধারে মস্ত উঁচু এক ফাঁসী কাঠ তৈরী হয়েছে। গাঁয়ের লোকের কাজে ছেদ পড়ল। সবাই এসে জড় হতে লাগল সেখানে। গোয়াল থেকে গরু বের করলে না কেউ।'

'আজ সব ছুটি। তার পর দুপুর বেলা ড্রাম বেজে উঠল। লোহার শেকলে বাঁধা কয়েদীকে নিয়ে এল সৈন্যরা ঘিরে। মুখে একটা কাপড় গোঁজা, যাতে না কথা বলতে পারে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে, যেন হাসছে। ফাঁসীকাঠের মাথায় খুনের ছুরীর ফলাখানা আকাশের দিকে তোলা। সেইখানেই ফাঁসীতে লটকে দিল ওরা লোকটাকে। চল্লিশ ফুট উঁচুতে দেহটা ঝুলতে লাগল ফাঁসীকাঠে। দুলতে লাগল হাওয়ায়।'

'সে কি বীভৎস দৃশ্য! ছেলেরা মেয়েরা জল আনতে যেতে পারে না ঝরণার ধারে। সন্ধ্যায় কে আসবে সেখানে গল্প করতে! পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ আমি চলে এসেছি। যখন আসি তখন সূর্য পাটে বসেছেন। পাহাড় থেকে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখেছিলাম। সেই প্রেত-ছায়া দীর্ঘ হয়ে গীর্জার চূড়া ঢেকে ফেলেছে। ঢেকে ফেলছে জেল-খানা। সারা পৃথিবীর গায়ে যেন লেপটে গেছে। এক রাত আধ দিন

একলা হেঁটেছি। তার পর এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গেও বাকিটা দিন আর পুরো একটি রাত কখনো ঘোড়ায় কখনো হেঁটে এসেছি।'

অনেকক্ষণ কেউ-ই কথা কইলে না। অবশেষে হ্যফর্জ বললে,—'একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও না ভাই। আমরা দুটো কথা কয়ে নি।'

'তাতে কি হয়েছে। এই আমি যাচ্ছি।'—ঘরের বাইরে গেল লোকটি।

'তোমার কি মত? খাতায় নাম লেখাবে নাকি?'

'অর্থাৎ মরবার জন্য প্রস্তুত হতে বলছ?'

'বরং মাদামের ওপর ভার দাও।'

সবাই সায় দিল এ প্রস্তাবে।

'চাষাটাকে কি এখনই ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে? লোকটি কিন্তু ভারী সরল। একটু বিপজ্জনক নয় কি?'

'ও কিছুই জানে না'—হ্যফর্জ বললে—'আমি ওর ভার নিচ্ছি। থাকবে আমার কাছে। তারপর গ্রামে পাঠিয়ে দেব। ও রাজা রাণীকে দেখতে চায়। দেখুক না রবিবারে।'

'সে কি? রাজা-রাণীকে দেখলে বিগড়ে যাবে না তো?'

'দুধের তেষ্টা জাগাতে হলে বেড়ালকে দুধ দেখাতে হবে। শিকার না চিনলে কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কুকুর। কাকে টুকরো টুকরো করবে রাগে?'

লোকটি সিঁড়িতে বসে ঢুলছিল। তাকে বিছানায় শুয়ে আরাম করতে বলে নীচে নেমে গেল সবাই।

১৫

রবিবারে জ্যাকুজকে রাজা-রাণী দেখিয়ে খুশী-মনে বিদায় দিলে স্যফর্জ। তার পর স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ী করে ফিরলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক গা-ঢাকা হয়ে এসেছে। সেই অন্ধকার দিগ দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে। যে গ্রামে হাঁটা-পথে চলেছে জ্যাকুজ, সেই গ্রামের এক ঝরণার ধারে চল্লিশ ফুট উঁচুতে একটা গলিত মৃতদেহ শূন্যে ঝুলছে। আর ঝরণার জল পচে যাচ্ছে দুর্গন্ধে। স্পাই বলে, মড়ার মুখে নাকি প্রতিহিংসার তৃপ্তি দেখছে তারা। যেমন দেখেছিল একদিন রাত্রে এক জন দাম্ভিক জমিদারের মুখে মৃত্যু-ভয়ের বীভৎসতা।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ী এসে থামল প্যারিব উপকণ্ঠে। সীমান্ত রক্ষীদের আস্তানায় জ্বলে উঠল লণ্ঠনের সারি। সুরু হল পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তরের পালা। স্যফর্জের সঙ্গে দু'-এক জন পুলিশের ঘনিষ্ঠ জানা-শোনা। তাদের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা কয়ে আবার গাড়ী নিয়ে এগিয়ে গেল স্যফর্জ বাসার দিকে। গলির মুখে গাড়ী রেখে দু'জনে পায়ে হেঁটে গলির কাদা আর ময়লা ভেঙ্গে আসতে লাগল।

'পুলিশের সঙ্গে কি কথা হল?'—স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে মাদাম।

বললে—'আমাদের এদিকে নতুন স্পাই এসেছে। আরো নাকি আসবে। তবে একজনকে চেনে সে।'

'লোকটি কে?'

'জাতে ইংরেজ। নাম জন বরসাদ।'

'চেহারা কেমন ?'

'বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। লম্বায় পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি। চুল কালো—গায়ের রং ময়লা। চেহারাটি মোটামুটি সুন্দর। চোখের মণি কালো—মুখ সরু লম্বা। নাক বঁড়শীর মত বাঁকা—বাঁ দিকে একটু হেলান। অর্থাৎ মুখে শয়তানি ছাপ মাখান।'

'যা বর্ণনা দিলে কাল দেখলেই চিনতে পারব'—কথা বলতে বলতে তারা এসে মদের দোকানে ঢুকল।

স্বর্ণজ মুখে পাইপ পুরে পায়চারী করতে লাগল আর স্ত্রী সারা দিনের রোজগারের হিসেব মেলাতে বসল।

গুমোট গরম রাত। আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ। নোংরা পরিবেশে ঘরে কেমন একটা ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ।

'তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বিশ্রাম কর'—টাকা পয়সা গুলো রুমালে বাঁধতে বাঁধতে স্বামীর দিকে তাকাল মাদাম।

'যা ভিড় গেছে আজ সারা দিন। তা ছাড়া রাজ আনুগত্য দেখে একটু হতাশ হয়েও পড়েছি মনে হচ্ছে।'

'বিপ্লবের এখনও অনেক দেরী।'

'তা হোক। চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশের পালা সাঙ্গ করতে সময় লাগবে বই কি।'

'তা বললে কি হয়। বাজ পড়ে মানুষ মরতে কি সময় লাগে ?'

'কিন্তু মেঘ বিদ্যুৎগর্ভ হয় কি একদিনে ? তারও সময় লাগে। প্রস্তুতি শেষ হলেই সুরু হয় ভূমিকম্পের তাণ্ডব। সমস্ত তচনচ করে দেয় মুহূর্তে। কিন্তু ভূমিকম্প ঘটার আগে প্রস্তুতি চলে লোক লোচনের অন্তরালে। কোন-কিছু শোনা যায় না—দেখা যায় না। এইটুকু যা সান্ত্বনা। তোমায় আমি বলছি বিপ্লব আসতে সময় লাগলেও তার উদ্যোগ-আয়োজনের বিরাম নেই। একবার চারিপাশে চেয়ে দেখ।

তাকিয়ে দেখ মানুষের মুখে। কি অসন্তোষ জমা হয়েছে সেখানে। অভাবে-অনাহারে চাবুক-খাওয়া মানুষগুলোর চোখে আগুন যেন ধিকি-ধিকি জ্বলছে নিরন্তর। আগুন কি বেশী দিন ছাই চাপা থাকবে ভাব?'

স্ত্রীর চোখের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কি যেন দেখলে ত্যফর্জ। বললে—'কিন্তু কথাটা তা নয়। এত দেরী হলে তুমি-আমি কি দেখতে পাব? হয়ত তার আগে আমাদের গায়ে মাটি চাপা পড়বে।'

'তা হোক, তবু বিপ্লবের আগুনে আমরা আমাদের অর্ঘ্য দিয়েছি। যা কিছু করেছি, জীবনের ধন কিছুই ফেলা যাবে না। আমাদের কালেই দেখবে বিপ্লব আসবে। দেখে যাব বৈকি সেই মরণ-মহোৎসবে নব সৃষ্টির প্রলয়। কিন্তু আর নয়। রাত হয়েছে, তুমি শুয়ে পড়।'

দুপুর বেলা নিজের জায়গাটিতে বসে মাদাম আপন মনে বুনছিল, এমন সময় নতুন মানুষের ছায়া পড়ল গায়ে। চোখ তুলে তাকাবার আগেই মন বললে, এ নতুন লোক। আজ সকাল থেকে দোকানে খদ্দেরের আনাগোনার বিরাম নেই। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। কেউ মদ খাচ্ছে, কেউ খাচ্ছে না। গুমোট গরমে মাছির উৎপাত বেড়েছে দোকানে।

মুখ তুলে দেখে সেলাই সরিয়ে রাখলে মাদাম। পাশে ছিল একটি গোলাপ। সেটি নিয়ে মাথার চুলে পরাতে পরাতে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে।

কিম্ আশ্চর্যম্। গোলাপ ফুলটি হাতে তুলেছে মাদাম আর দোকানের সরগম যেন যাদুর মত থেমে গেল। দোকান হতে একে একে সবাই সরে পড়তে লাগল।

'সুন্দর দিন'—বললে আগন্তুক।

'তা বটে'—জবাব দিলে মাদাম।

বটেই তো। সেই হিসেব। মনে মনে মিলিয়ে নিলে সে। বয়স

চল্লিশ। পাঁচ ফুট-ন ইঞ্চি লম্বা। কালো চুল। মাটো রং, তবে চেহারাটা সুশ্রী। চোখের মণি কালো। লম্বাটে গাল, ত্যাবড়ানো মুখ। নাকের ডগাটা ঠিক তেমনি বাঁ গালের দিকে একটু বাঁকান। সারা মুখে শয়তানি ছাপ।

'এক গ্লাস মদ আর একটু ঠাণ্ডা জল।'

'সানন্দে। তবে ভাই সব একটু সাবধান।'

সৌজন্যের সঙ্গে পরিবেশন করলে মাদাম।

'চমৎকার মদ!'

এই প্রথম তার দোকানের মদের প্রশংসা করলে কেউ। আপন মনে সেলাই করে যাচ্ছে দেখে আগন্তুক একবার তার আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সারা ঘরখানির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

'চমৎকার হাত আপনার বোনায়।'

'ঐ আমার অভ্যেস।'

'প্যাটার্নটিও করেছেন ভাল।'

সহাস্য দৃষ্টি তুলে তাকালে মাদাম।

'জিনিষটা কি হচ্ছে?'

'বিশেষ কিছু নয়, সময় কাটানোর জন্য করছি।'

দুটি লোক দোকানে এসে মদের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নতুন লোককে দোকানে দেখে থমকে গেল—বন্ধুর খোঁজে এসেছিল এমনি একটা মিথ্যা ভান করে সরে পড়ল সেখান থেকে। দোকানে যারা ছিল তারাও সরে পড়েছে কখন। স্পাই চোখ কান খুলে রেখেছে—কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছু নজরে পড়ল না।

'আপনার স্বামী আছেন?'

'আছেন।'

'ছেলেমেয়ে?'

'ছেলেমেয়ে আমার নেই।'

'ব্যবসা কেমন? দেখে তো ভাল মনে হয় না?'

'বেচা-কেনা ভারী মন্দা। লোকের হাতে পয়সা নেই।'

'লোকের কথা আর বলবেন না। ওদের অভাবও যত, ওদের ওপর অত্যাচারও হয় তত। তাই বলছিলেন না আপনি?'

'ঐ রকমই বলছিলেন বটে আপনি'—ভুল শুধরে দেন মাদাম।

'মাপ করবেন,—আমিই বলেছি কথাটা। কিন্তু আপনারও কি সেই মত নয়—বলুন?'

'আমি আর আমার স্বামী'—চড়া-গলায় বললেন মাদাম—'সারা দিন মদের দোকান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে ওসব কথা ভাববার অবসর পাই না। আমাদের একমাত্র ভাবনা—বাঁচার। সকাল-সন্ধ্যা এই ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। নিজের জ্বালায় মরছি, পাঁচ জনের দিকে তাকাব কখন?'

মাদামের দোকানের ছোট কাউণ্টারে কনুই রেখে মদ খেতে খেতে লোকটা সোৎসাহে গল্প করতে লাগল মাদামের সঙ্গে। যেন কত আত্মীয়, আপন জন।

'গেসপার্ডের ফাঁসীর ব্যাপারটাই ধরুন। কী মানে হয় তাকে ফাঁসী দেবার।' দরদ যেন কণ্ঠে উথলে উঠল।

'লোকে যদি খুন করতে ছুরী চালায়, তার ন্যায্য মূল্য তাকে দিতে হবে বই কি'—কাউণ্টারের এপাশ থেকে নিরুত্তাপ জবাব দিল মাদাম—'কত দাম পড়বে সে কাজের, তা তো সে জানত। দিলেও তাই।'

'এ পাড়ায় ওর জন্যে অনেকের মনে বিদ্বেষ জন্মেছে।'—খুব গোপন

কথা নিজেদের মধ্যে রাখবার জন্যে লোকটা গলার স্বর নীচু পর্দায় নামিয়ে আনল।

'তাই নাকি?'

'আপনি লক্ষ্য করেননি কিছু?'

কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়ে মাদাম বললে—'ঐ আমার স্বামী আসছেন।'

দোকানের মালিক দোকানে ঢুকতেই স্পাই টুপি খুলে তাকে নমস্কার করল, তারপর মুখে হাসি টেনে বললে—'শুভ দিন, জ্যাকুজ।'

হুফর্জ মাঝপথে থেমে গেল—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'শুভ দিন জ্যাকুজ'—স্পাই পুনরাবৃত্তি করলে।

হুফর্জের তীব্র দৃষ্টির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

'আপনি আমাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছেন। আমার নাম জ্যাকুজ নয়— আমার নাম হুফর্জ।'

'তাই নাকি?—অপ্রতিভ হলেও লোকটা সামলে নিলে নিজেকে।

'শুভ দিন'—

'শুভ দিন'—শুষ্ক কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলে হুফর্জ।

'এতক্ষণ মাদামের সঙ্গে কথা কইছিলাম। হতভাগ্য গেসপার্ডকে নিয়ে এ অঞ্চলে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে।'

'কই, তেমন কথা আমায় তো কেউ বলেনি'—মাথা ঝাঁকিয়ে বললে হুফর্জ—'এ রকম ব্যাপার আমার কিছুই জানা নেই।'

এ কথা বলেই হুফর্জ চলে এল কাউণ্টারের পিছনে। স্ত্রীর চেয়ারের পিছনে হাত রেখে তাকাল সামনের দিকে। যে লোকটিকে গুলী করে মেরে ফেলতে পারলে দু'জনেই খুশী হত, তাকাল দু'জনেই সেই গুপ্তচরের দিকে।

এ রকম পরিস্থিতি অনেক গা-সওয়া হয়ে গেছে তার। পারিপার্শ্বিকের

প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে গ্লাসের শেষ মদটুকু নিঃশেষ করে এক চুমুক জল খেয়ে আর এক গ্লাস মদের অর্ডার দিল। মাদাম মদ ঢেলে দিয়ে আবার সেলাই নিয়ে বসলেন আর সেই সঙ্গে চলল সুরের গুনগুনানি।

'এ জায়গাটা দেখছি আপনি খুব ভাল করে চেনেন অর্থাৎ আমার চেয়ে বেশী'—বললে ড্যফর্জ।

'একটুও নয়। তবে জানার আশা আছে। এখানকার কাঙাল-মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে আমার ভারী কৌতূহল।'

ড্যফর্জ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল।

'মঁসিয়ে ড্যফর্জ, কথা বলতে বলতে আপনার নামের সঙ্গে জড়িত একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। ডাঃ ম্যানেট যখন ছাড়া পেলেন তাঁর পুরানো কর্মচারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আপনার হাতেই দেওয়া হয়েছিল। আপনিই তাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই রকম শুনেছি আমি।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'ডাঃ ম্যানেটের মেয়ে আপনার কাছেই এসেছিল এবং আপনার হেফাজৎ থেকে সে তার বাপকে নিয়ে গেছে ইংল্যাণ্ডে। সঙ্গে ছিল আর এক জন ভদ্রলোক—খুব ফিটফাট দেখতে—কি নাম যেন—টেলসন ব্যাঙ্কের মিঃ লরি।'

'যা শুনছেন সবই সত্যি।'

'ইংল্যাণ্ডে ডাঃ ম্যানেট আর তার মেয়েকে চিনতাম।'

'তাই নাকি ?'

'এখন আর তাদের কোন খবর পান না ?'

'না।'

মাদাম সেলাই থেকে মুখ তুলে বললে—'আমরা তার কোন খবরই জানি না। তাদের নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে পৌছানোর খবর পেয়েছি। তার পর একখানি কি দু'খানি চিঠি। ক্রমশঃ তারা তাদের নিজের পথ বেছে নিয়েছে—আমরা আমাদের। এর পর আমাদের মধ্যে কোন চিঠি-চালাচালি হয়নি।'

'মেয়েটির শীগগির বিয়ে হবে।'

'বিয়ে হবে?'—প্রতিধ্বনি করলে মাদাম—'অমন রূপবতী মেয়ে, এত দিনে তার বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল?'

'প্রেমের ব্যাপারে আপনারা ইংরেজরা বড্ড বেশী কুনো।'

'আমি যে ইংরেজ জানেন দেখছি।'

'আপনার কথার ধরণ দেখেই বুঝেছি। মুখের কথা থেকেই বোঝা যায় কে কোন্ জাতের।'

লোকটি হো-হো করে হেসে উঠল। তার পর মদের গ্লাস নিঃশেষ করে বললে ঃ

'হ্যাঁ, লুসি ম্যানেটের শীগগিরই বিয়ে হবে। বিয়ে হবে কোন ইংরেজের সঙ্গে নয় – এক জন ফরাসীর সঙ্গেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল যে, লুসি নাকি মারকুইসের ভাইপোকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই মারকুইসের জন্যই গেসপার্ডের ফাঁসী হল। মারকুইসের ভাইপো ইংল্যাণ্ডে অজ্ঞাতবাস করছেন। এখন তাঁর নাম চার্লস ডার্নে।'

মাদাম অবিচলিত ভাবে বুনে যেতে লাগল। কিন্তু এই তথ্যটুকু তার স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করলে সুস্পষ্ট। তার এই বিচলিত ভাব যদি স্পাই লক্ষ্য না করে থাকে তো সে স্পাই-ই নয়।

বারসাদ মদের দাম চুকিয়ে বিদায় নিল। লোকটি চলে গেলে স্বামী-স্ত্রী অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল নিজ নিজ আসনে। যদি বারসাদ আবার ফিরে আসে।

নীচু-গলায় ডিফার্জ বললে—'লুসি ম্যানেটের সম্বন্ধে লোকটি যা-যা বলে গেল তা কি সত্যি ?'

'ও যখন বলেছে খুব সম্ভব মিথ্যা। কিন্তু সত্যিও তো হতে পারে ?'

'যদি সত্যি হয় ?'

'যদি সত্যি হয—যদি বিপ্লব আসে আমাদের জীবিত কালেই, আশা করি, মেয়েটির জন্য ভাগ্য তার স্বামীকে ফ্রান্সের সীমানার বাইরে রাখবে।'

স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে মাদাম উত্তর দিলে এ কথার।

'ভাগ্য তাকে যেখানে নিযে যাবার নিয়ে যাবেই। যা তার কপালে লেখা আছে ঘটবেই। এই তো আমি বুঝি।'

'সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমাদের দরদ মেয়েটির জন্যে, মেয়েটির বাবার জন্যে। যে ঘৃণ্য কুকুরটা এই মাত্র চলে গেল তার মতই অস্পৃশ্য হয়ে রইল ওর স্বামী।'

'যখন ঘটবে, অদ্ভুত ঘটনাই ঘটবে।'

মাদাম তার সেলাই গুটিযে নিলে। স্পাইযের নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে মদের দোকানের স্বাভাবিক রূপটি ফিরে আসে।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা এল। অন্ধকারের পক্ষছাযায ঢেকে গেল চারিদিক। বেজে উঠল গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি আর দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল মিলিটারী ড্রামের গর্জন। এমনি আর এক তিমির-ঘন রাত্রি নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিযে আসছে। সেদিন গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি বারুদের গর্জনে চাপা পড়ে যাবে। একটি হতভাগ্যের আর্ত চীৎকার চাপা দেবার জন্য আজ বাজছে সামরিক দামামা। সে অনাগত রাত্রে শক্তি, সমৃদ্ধি, নবজীবন ও স্বাধীনতার দৃপ্ত ঘোষণা দিগন্ত মুখরিত করে তুলবে। কিন্তু সে রাত্রির আর দেরী কত ?

১৬

সেদিন সূর্যাস্তের সোনায সোনায় ভবে ছিল আকাশ। প্রথম বাতেব চাঁদ অতন্দ্র জেগেছে নগবীর শিযরে। জেগে ছিল দুটি অসমবযসী প্রাণী পরস্পরেব মুখের দিকে চেযে। আপন আপন চিন্তায বিভোর হযে দু'জনে নিঃশব্দে বসেছিল প্রাঙ্গণেব জাফবি-কাটা আলো-ছায়ার দিকে চেযে।

কাল তার বিযে। তাই আজকেব দিনটি লুসি বাপেব সঙ্গ ছাড়া হতে চায নি। অন্ততঃ এই একটি দিন সে পরিপূর্ণ নিজেদের জন্যে বেখেছিল।

চাঁদেব আলোয় বৃদ্ধেব শান্ত মুখে কোমল-পাণ্ডুব আভা লেগেছে। এই অসহায মানুষটিকে মুহূর্তও ছেড়ে যেতে চায না লুসি। এইবাব নিযে তাই সে সহস্র বাব পিতাকে প্রশ্ন কবলে—'তুমি সুখী হযেছ তো বাবা ?'

'হ্যাঁ মা! এমন সুখী আমি জীবনে কখনো হইনি এব আগে। বিযে হযে আমাব মেযে সুখেব ঘব বাধবে, আব আমি সুখী হবো না মা? এ আমাব কত বড় আনন্দ—'

'কিন্তু বাবা—'

'তুমি কণা মাত্র দুঃখ বেখো না মা। তুমি যবে থেকে মাতৃস্নেহে আমায বুকে তুলে নিযেছ, সেদিন থেকে নিযত আমাব এই দুর্ভাবনা ছিল যে, আমাব ব্যর্থ জীবনেব মমতায তোমাব জীবন-কুসুম না ভ্রষ্ট হয—'

বাবার ঠোঁটের উপর হাত রেখে লুসি তাঁকে নিবৃত্ত কবতে গেল,

কিন্তু পিতা তার হাত সরিয়ে দিয়ে তেমনি আবেগভরে বলতে লাগলেন—'তুমি জান না মা, আমার কারণে আমার মেয়ের জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে এ আমার কত বড় দুর্ভাবনা ছিল। তুমি নিষ্ফল হলে আমি কি করে সুখী হতাম মা ?'

'চার্লস যদি আমার জীবনে না আসত, আমি তোমাকে নিয়ে দিব্যি আরামে কাল কাটাতাম বাবা।'

মেয়ের এই সহজ আত্মপ্রকাশে বৃদ্ধ খুশীই হলেন। পুলকিত কণ্ঠে বললেন—'হতেই হবে মা। চার্লসকে যে আসতেই হবে। আর চার্লস কেন, সে না এলে অন্য কোন রূপবান ভাল ছেলে আসতই তোমার জীবনে। কিন্তু এ আমি সহ্য করতে পারতাম না মা যে, আমার অতীতের অন্ধকার বর্তমান পার হয়ে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন অবধি আঁধার করে দেবে। সে আমি কি করে সহ্য করতাম মা ?'

অতীত রোমন্থন করতে করতে পিতার সারা মুখে-চোখে একটা বিষণ্ণ বিস্মরণ আসা-যাওয়া করতে লাগল। তার আত্মমগ্নতা দেখে লুসি নিঃশব্দে বসে রইল।

'কত দিন জান মা, ঐ চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে আমি কাটিয়েছি। জেলের গরাদ দেওয়া একমুঠো ঘরে বন্দী আমি ঐ চাঁদ দেখেছি আর পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটেছি। বাইরের যে অবাধ বিশ্বভূবন অজস্র জ্যোৎস্নালোকে অবগাহন করছে তার থেকে আমি বঞ্চিত, এ চিন্তা কী দুর্বিসহ তুমি ভেবে পাবে না মা! সেই চাঁদের আলোয জেলখানার মেঝেতে গরাদের ছায়া গুণে-গুণে আমি কাল কাটাতুম।'

এই মানুষটির সঙ্গে সেদিনের বন্দীর হুতাশ মর্মবেদনার কোন মিল না পেলেও, লুসি আত্মচেতন ভাবে তার কথা শুনতে লাগল। তেমনি আত্মমগ্ন হয়ে তিনি বলতে লাগলেন—'চাঁদের দিকে চেয়ে আমি এক জনের কথা নিশি-দিন ভাবতাম। জেলের ঐ ক'টি লৌহ-গরাদ

আকাশের চাঁদের চেয়ে মধুর আর এক জনকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মাতৃগর্ভে অপ্রত্যক্ষ যাকে আমি বাইরে রেখে এসেছিলাম, এত দিনে সে কি এসেছে পৃথিবীতে? হয়ত মরেই গেছে! যদি সে বালক হয়, বড় হয়ে সে কি পিতার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে না? তার বাবা স্ব-ইচ্ছায় এমন আত্মনির্বাসন নিতে পারেন কি না, সে বিচার কি একদিন করতে বসবে না সে? তুমি বুঝতে পারবে না মা, তখন প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় আমি কেমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আবার কখনো কল্পনা-নয়নে দেখতাম একটি মেয়ে হয়েছে আমার। সেই মেয়ে দিনে দিনে বড়ো হয়ে শ্বশুর-ঘর করতে চলে গেল। বছরের গোলমাল হয়ে যেত। দেখতাম, সুখে ঘরকন্না করছে সে। নিষ্ঠুর নিয়তি তার বাবাকে কোন্ অন্ধকারের গর্ভে নিক্ষেপ করেছে, সে কথা ঘৃণাক্ষরেও সে জানে না।'

'এ সব কথা তুমি কেমন করে ভাবতে বাবা? সত্যিই যে আমি তোমার কিছু জানতাম না!'

'কত দিন ভেবেছি আমার সেই মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার জানালার বাইরে। আমায় মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছে সে। চাঁদের আলোয় তাকে কত দিন আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমাদের ঘরের বাইরে। ঠিক এমনি ধারা—ঠিক এমনি ধারা, মা! শুধু সেদিন এমন করে তাকে বুকে আঁকড়ে ধরতে পারিনি। লোহার গরাদগুলো আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকত। কিছুতেই তাকে এমনি করে বুকে জড়িয়ে নিতে পারতাম না মা! কিছুতে পারতাম না। সে যে কি কষ্ট—তবু মা, সে তো আমায় ভোলেনি। স্বপনে জাগরণে সে তো আমার কথা ভাবে। তার প্রার্থনায় সে তো দেবতার কাছে আমার কথা নিবেদন করে। এ কথা ভাবতে মন হাল্কা হয়ে যেত। মনের অন্ধকার একাকীত্বে জানু পেতে বসে আমিও তার প্রার্থনায় যোগ দিতাম। শত

বার মাথা ঠুকে বলতাম, তাকে ভালো রেখো ঠাকুর। সে যেন আমার সুখী হয়!'

গভীর ভাবাবেগে মেয়ের কাঁধে মাথা রেখে বৃদ্ধ অস্ফুট কি যেন উচ্চারণ করতে লাগলেন।

তাঁকে নিয়ে লুসি ঘরে ফিরে এল।

সেদিন গভীর রাত্রে লুসি প্রদীপ হাতে নীচে নেমে এল। ঘুমন্ত পিতার মাথার শিয়রে বসে তার তরুণ নারীহৃদয় সেদিন মমতায় বিগলিত হতে লাগল।

১৭

শুভ বিবাহের দিনটি ভোরের প্রসন্ন আলোয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিয়ের কনে, লরি ও মিস্ প্রস ডাক্তারের ঘরের বাইরে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার ভিতরে কথা বলছেন চার্লস ডার্ণের সঙ্গে।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন লরি—'এই শুভ লগ্নটির জন্যই বুঝি তোমায় আমি চ্যানেলের ওপার থেকে এনেছিলাম মা লুসি। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন!'

ডার্ণেকে নিয়ে ডাক্তার ম্যানেট এলেন। একটু আগে বৃদ্ধ যখন ঘরে গিয়েছিলেন, তখন মুখের যে ভাব ছিল, তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মুখ হয়েছে ফ্যাকাশে বিবর্ণ। লরির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন অলক্ষিত রইল না।

মেয়েকে হাত ধরে গাড়ীতে তুলে বসালেন ডাক্তার। বাকি সকলে আর একটি গাড়ীতে অনুগমণ করল তাদের। কাছে পিঠে একটি গীর্জায়

পরিচিত স্নিগ্ধ পরিবেশে নিতান্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে লুসি ম্যানেট আর চার্লস ডার্ণের শুভ পরিণয় সমাধা হল।

বাড়ী ফিরে সামান্য জলযোগের পর বিদায় দেওয়া-নেওয়ার পালা এল। বড় কষ্ট হল সে দৃশ্য দেখতে। মেয়েকে নানা ভাবে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ। শেষে তার দুটি বাহুর আকুল বেষ্টনী থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ডাক্তার কান্না-ভেজা ভারী গলায় বললেন—'চার্লস, তুমি একে নাও। আজ থেকে ও তোমার।'

গাড়ীর জানালা থেকে দুটি হাত নেড়ে বিদায় জানাল লুসি। তার পর এক সময় বর কনেকে নিযে গাড়ী চোখের আড়াল হয়ে গেল।

পিছনে পড়ে রইলেন ডাক্তার, লরি আর মিস্ প্রস। পুরানো পরিচিত ঘরে ফিরে লরি প্রথমে লক্ষ্য করলেন ডাক্তারের চেহারায় এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যে কোমল বাহু দুটি এতক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি, যাবার বেলায় সেই হাত বুঝি বিষাক্ত তীর মেরে গেছে তাঁকে।

হৃদয়ের যে আবেগকে দমন করে রেখেছিলেন এতক্ষণ, এবার তার বাধন শিথিল হয়ে গেল। আবার ফিরে এল মুখে সেই আত্মহারা উদভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টিকেই ভয় করেন লরি। যেন কত অন্যমনস্ক ভাবে ডাক্তার দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে ক্লান্ত দেহটাকে সিঁড়ি ভেঙ্গে টেনে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে।

লরি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিস্ প্রসকে বললেন—'আমার মনে হয়, এখন ওঁর সঙ্গে কথা বলা বা ওঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। আমাকে এখুনি ব্যাঙ্কে যেতে হবে—শীগগির ফিরে আসব। তার পর ওঁকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া যাবে কোন গ্রামে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হবে!'

ব্যাঙ্কে ঘণ্টা দু'য়েক দেরী হোল লরির। ফিরে পুরানো সিঁড়ি বেয়ে

উপরে উঠে এলেন একেবারে ডাক্তারের ঘরে। চাপা ঠুক-ঠুক শব্দ কানে আসতে চমকে উঠলেন তিনি।

'এ কি? কিসেব শব্দ?'

ভযার্ত মুখে মিস্ প্রস হাত কচলাতে-কচলাতে এসে দাঁড়াল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললে—'সর্বনাশ হযে গেছে। লুসিকে আমি কি বলব? ডাক্তাব আমাকে চিনতে পাবছেন না। আবাব জুতো তৈবী কবতে বসেছেন।'

তাকে সান্ত্বনা দিযে লবি ডাক্তাবেব ঘবে ঢুকলেন। বেঞ্চিটাকে আলোব ধাবে টেনে নিযে মাথা নীচু কবে ডাক্তাব কাজে মগ্ন হযে আছেন।

'ডাক্তাব ম্যানেট?'

মুহূর্তেব জন্য ডাক্তাব মুখ তুলে তাকালেন। একটি পুবানো জুতো ডাক্তাবেব হাতে। পাশেব আব এক পাটি জুতো হাতে তুলে নিযে লরি জিজ্ঞাসা কবলেন—'এটি কাব?'

'একটি মেযেব? বাইবে পববাব জুতো।' মুখ না তুলেই বিড-বিড কবে বলে গেলেন ডাক্তাব—'অনেক আগেই এটি তৈবী শেষ হওযা উচিত ছিল।'

'ডাক্তাব ম্যানের্ট, একবাব আমাব দিকে চেযে দেখুন?'

কাজ না থামিযে ডাক্তাব যন্ত্র-চালিতেব মতই মুখ তুলে তাকালেন।

'ভাল কবে চেযে দেখুন ত। আপনি কি আমায চিনতে পাবছেন না?'

কিন্তু কোন মতেই আব তাঁকে দিযে কথা বলাতে পাবলেন না লরি। শুধু বার বার নিবাক চোখ তুলে তাকিযে দেখলেন।

একটি মাত্র আশাব আলো দেখতে পেলেন লরি। ডাক্তার যতবার মুখ তুলে তাকাচ্ছিলেন, সে মুখে কেমন একটা হতবুদ্ধি কৌতূহলের

ক্ষীণ আলোক ঝিকমিক করছিল। যেন কি একটা বোঝাপড়া চলছে মনের সঙ্গে।

এ কথা লুসি যেন না জানতে পারে। বড়ো দুঃখ পাবে সে। ডাক্তারকে যারা জানে তাদেরও জানতে দেওয়া হবে না। মিস প্রসকে সাবধান করে দিলেন, কেউ দেখা করতে এলে যেন বলে দেওয়া হয় ডাক্তার অসুস্থ। কয়েক দিন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার তাঁর। লুসিকে লেখা হল ডাক্তার রুগী দেখতে বাইরে গেছেন। নিজের হাতেই ডাক্তারের লেখা তাড়াতাড়ি দু'-তিন ছত্র সেই রকম লিখে মিস্ প্রসের হাতে দিলেন। ডাক্তার ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হবেন এই আশায় লরি সব দিক বাঁচিয়ে ব্যবস্থা করলেন।

আর জীবনে এই প্রথম টেলসন ব্যাঙ্ক থেকে ছুটি নিলেন লরি। নিশিদিন ডাক্তারের সতর্ক প্রহরায় বসে কাটাতে লাগলেন।

ডাক্তারের সঙ্গে একই ঘরে জানালার ধারে আসন নিয়ে বসে লরি নিজের লেখাপড়া করে যেতে লাগলেন। লক্ষ্য করতে লাগলেন ডাক্তারের আচার-আচরণ। নির্বাক প্রহরীর মত তিনি কেবল নিজেকে তার সামনে মোতায়েন রাখার সংকল্প করলেন। যে মিথ্যা বিড়ম্বনায় পড়েছেন তিনি এ যেন তার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

যা খেতে দেওয়া হয় তাই মুখে তোলেন ডাক্তার। প্রথম দিন তিনি কাজ করলেন যতক্ষণ না অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। তার পর যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'বাইরে যাবেন ?'

পুরোনো দিনের মত মেঝেতে চারি পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তার—পুরোনো দিনের মতই নীচু-গলায় বললেন—'বাইরে ?'

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবেন ? চলুন না।' সে কথার আর জবাব পেলেন না। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে হাঁটুতে

কনুই রেখে, হাতের মধ্যে মাথা চেপে নিঃশব্দে বসে রইলেন মানুষটি। তাঁর এই মোহাচ্ছন্ন আচবণে লবিব মনে হল ডাক্তার যেন নিজেকে প্রশ্ন কবছেন—'কেন নয ?'

মিস্ প্রস আর লরি দু'জনে ভাগাভাগি করে রাত জেগে পাশেব ঘর থেকে তাব উপব নজব বাখবেন ঠিক কবলেন। ঘুমোনোব আগে অনেকক্ষণ ঘবে পাযচাবী কবলেন বটে কিন্তু শুযে পড়াব সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে অচেতন হযে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবাব কাজ নিযে বসলেন নিজের।

দ্বিতীয় দিন লবি স্মিত হাস্যে নমস্কাব করলেন ডাক্তাবকে। পরিচিত বিষয় নিযে আলাপেব সূত্রপাত কবতে চেষ্টা করলেন। ডাক্তাব কোন উত্তর দিলেন না বটে কিন্তু কথাগুলি যে তাঁর কানে গিযেছে, মনেব মধ্যে এলোমেলো ভাবে তা নিযে যে তোলপাড় চলছে তা স্পষ্ট বুঝলেন লবি। এই সাফল্যে উৎসাহিত হযে লবি মিস্ প্রসকে অনেক বাব ঘবে ডেকে এনে গল্প কবলেন—মাঝে-মাঝে লুসিকে, লুসিব বাবাকে নিযেও নানা কথা বললেন। সেই কথাব টুকবো মাঝে-মাঝে ডাক্তারেব ধ্যান ভগ্ন কবছিল—সচকিত হযে ডাক্তাব তাকাচ্ছিলেন তাদেব দিকে।

অন্ধকার গাঢ হযে এলে লবি আবাব তাঁকে জিজ্ঞাসা কবলেন—'বাইরে যাবেন ?'

'বাইরে ?'

'হ্যাঁ। বাইরে বেড়াতে। কেন নয ?'

কোন উত্তর না পেযে লবি কযেক ঘণ্টা বাইবে কাটিযে ফিবে এলেন। এসে দেখলেন ডাক্তাব জানলার ধাবে দাঁড়িযে—তাকিযে দেখছেন বাইবেব গাছপালাব দিকে। লবি ঘরে ঢুকতেই চকিত হযে সরে এলেন নিজেব আসনে।

সময়ের চাকা শামুক গতিতে এগিয়ে চলেছে। তৃতীয় দিনও এল গেল। দিনে দিনে ন'দিন পার হল।

দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটতে লাগল লরির। তবু এইটুকু সান্ত্বনা যে লুসি সুখে আছে। সে কিছু জানে না।

১৮

সতর্ক সৈনিকের মত অতন্দ্র প্রহরায় এ ক'দিন কাটাচ্ছিলেন লরি। উদ্বিগ্ন রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত শরীরে আজ ভোরের দিকে কখন লরির দুটি চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল দেখলেন সারা ঘর রোদে ভরে গিয়েছে।

চোখ মুছে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু চোখ চেয়ে যা দেখলেন স্বপ্নের চেয়ে তা অবিশ্বাস্য কম নয়। ডাক্তারের ঘরে গিয়ে দেখলেন জুতো তৈরীর জিনিষপত্তর সব সরান, জানলার কাছে চেয়ারে বসে ডাক্তার অভ্যাস মত বই পড়ছেন। অলক্ষিত থেকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করলেন লরি, দেখলেন ডাক্তারের মুখে-চোখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। সারা চেহারায় আর কোন খুঁত নেই।

এতক্ষণে লরির নিজের বিভ্রম জন্মাল। তবে কি এ ক'দিনের অভিজ্ঞতা সমস্ত দুঃস্বপ্ন? এই তো কিছুক্ষণ মাত্র আগে লরি সতর্ক প্রহরায় বসেছিলেন, যেমন বসে এসেছেন গত কয়েক দিন।

দুঃস্বপ্নই বা হবে কি করে? দুঃস্বপ্ন হলে ডাক্তারের ঘরের বাইরে সোফায় রাত্রিযাপন করতে যাবেন কেন লরি?

নানা কথা ভাবছেন এমন সময় মিস্ প্রস কাছে এসে দাঁড়াল। সেও

ডাক্তারের এই অচিন্ত্য পরিবর্তনের কথা জানাল বিস্মিত কণ্ঠে। শুনে লরির মনের সকল দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটল। কিন্তু ডাক্তারকে এখনও সযত্নে তদারক করতে হবে। আহারের টেবিলে বসার আগে তাঁকে বিরক্ত করবেন না মনস্থ করলেন লরি।

খেতে বসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই লুসির বিয়ের কথা পাড়লেন লরি। এমন ভাবে বললেন যেন মাত্র গতকাল বিয়ে হয়েছে। ডাক্তার সে কথায় যোগ দিলেন পরম আগ্রহে, কেবল দিনের গোলমাল নিয়ে তিনি যেন কিছুটা দ্বিধায় পড়েছেন সেটুকু গোপন রইল না লরির কাছে।

তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে পেয়ে লরি বললেন—'ডাক্তার ম্যানেট, আমি আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। আপনি ডাক্তার, সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে, আপনি হয়ত তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লরি বিবৃত করলেন তাঁর কাহিনী ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে। গত কয়েক দিন ধরে একটা অন্ধকার অতীত যে ভাবে ডাক্তারকে রাহুগ্রস্ত করেছিল, সে কথা লরি উপস্থাপিত করলেন ডাক্তারের কাছেই। শুধু কল্পনা দিয়ে নাম ও বিন্যাসে সামান্য বদল করে নিলেন। বললেন যে, রোগীর একটি কন্যা আছে, সেও নব-বিবাহিতা। পিতার অসুস্থতায় সে মেয়ে কত বড় দুঃখ পাবে, সে কথাও বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রতিপন্ন করতে কসুর করলেন না।

শুনে কতক্ষণ মৌন-মুখে বসে রইলেন ডাক্তার। তার পর বললেন —'তার একটি মেয়ে আছে বলছিলেন না? সে কি জানে এ সব কথা?'

'না, সে কথা সম্পূর্ণ গোপন করা হয়েছে মেয়ের কাছ থেকে। এ সংসারে আমি ভিন্ন আর এক জন মাত্র এ কথা জানে, সেও

বিশ্বাসী লোক। প্রযোজন হলে তাঁর মেয়ে সারা জীবনেও সে কথা জানতে পারবে না।'

লরির দুটি করতল সাগ্রহে টেনে নিযে ডাক্তার বিগলিত কণ্ঠে বললেন—'কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো? ভগবান আপনার মঙ্গল করুন মিঃ লরি।'

লরি এইখানেই আলোচনাব শেষ কবতে চাইলেন না। বললেন—'ডাক্তাব, আমি ব্যাঙ্কেব মানুষ। টাকা-কড়িব হিসেব-নিকেশ বুঝি। মানুষেব মন আমাব বুদ্ধিব অগোচব। আপনি আমায উপদেশ দিন। এবাব সুস্থ হযে ওঠাব পব এ বোগেব পুনবাবৃত্তিব সম্ভাবনা থাকবে কি? মানুষটিব ভাল-মন্দেব জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত ভাবিত হযে আছি।'

ডাক্তাব বললেন—'জানেন মিঃ লবি, মানুষেব অবচেতন মনেব বহস্য মন্থন করা সহজ নয। বিশেষ কবে অতীতেব একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা যে মানুষের মনেব গোপনে নিবন্তব জগদ্দল পাথবেব মত দুর্ভর ভার হযে আছে, সামান্য মাত্র অসাবধানেই তা মনেব ভাবসাম্য নষ্ট কবে দিতে পাবে। এ ক্ষেত্রেও তাই হযেছে, মেযেব মুখ চেযে মানুষটি অতীতকে ভুলে গিযেছিলেন। আবাব সেই মেযেব আসন্ন বিবহে কত দিন ধবে একটা নিঃসঙ্গতাব ভীতি তাঁব মনেব উপব প্রেতেব মত চেপে বসেছিল। সেই প্রেতটার সঙ্গেই লড়াই করছিলেন কিন্তু শেষ অবধি প্রেতকে হাব মানতে হল। জানেন মিঃ লবি, কি দিযে যে ভগবান আমাদেব মনকে তৈবী কবেছেন তা তিনিই জানেন। নইলে এত কষ্ট সহ্য কবেও মানুষ বাচে! অথচ সুখেব দিনে মন কিছুতেই ভুলতে চায না সে সব পুরোনো কথা। এমন কবে বেচে থাকাব যে কি কষ্ট!'

লরি অনেকক্ষণ তাঁব দিকে চেযে বইলেন। তাব পর বললেন 'কিন্তু ভবিষ্যতের কথা আপনি কিছুই বললেন না ডাক্তাব?'

'আমি খুবই আশাবাদী। মেঘ যখন ঘন হয়েই কেটে গেছে করুণার বাতাসে, তখন আর বোধ হয় ভয় নেই। করুণাময় হয়ত তাকে নিষ্কৃতি দিলেন।'

'কিন্তু ঐগুলো কি আর সামনে রাখা ভাল?'

'না রাখাই বোধ হয় মঙ্গল। ঐগুলোই অতীতের প্রেত।'

আরো অনেকক্ষণ দু'জনে গল্প করলেন। আর সেই গল্পে লুসির আনাগোনার বিরাম রইল না।

১৯

ক'দিন পরে স্বামীকে নিয়ে লুসি এল বাবার কাছে। সিডনী কার্টন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন তাদের আসার পথ চেয়ে। তারা আসতেই বর-বধূকে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন। লুসি দেখলে মানুষটির কোথাও বদল হয়নি।

একান্ত হওয়া মাত্র ডার্ণেকে জানালার ধারে টেনে নিয়ে গেলেন কার্টন যাতে না কেউ শুনতে পায় তাদের কথা। বললেন—'ডার্ণে, আশা করি আমাদের সম্পর্ক হবে বন্ধুর।'

'বন্ধুই তো আছি আমরা।'

'ভদ্রতার খাতিরে এ রকম বলা উচিত মানি, কিন্তু আমি শুধু ভদ্রতার কথাই বলছি না। আমি যখন বন্ধুত্বের কথা বলি, কদাচিৎ সে কথা বোঝাই।'

'কি বোঝাতে চান তবে?'—স্বাভাবিক স্নিগ্ধতার সঙ্গে প্রশ্ন করে ডার্ণে।

'যা চাই মনে এলেও মুখে বলা সহজ নয়'—হেসে উত্তর দিলেন কার্টন

—'তবুও চেষ্টা করে দেখা যাক। মনে পড়ে কি একদিন আমি একটু অস্বাভাবিক বকম মাতাল হয়ে পড়েছিলাম।'

'যেদিন আপনার আমার চেহারার সাদৃশ্যে আদালত শুদ্ধ লোক অবাক হয়েছিল। সেই দিনই ত আমি মুক্তি পেলাম। সেদিন আপনি খুব বেশী মাতাল হয়েছিলেন বটে।'

'সেই ঘটনাব অভিশাপ আমাব মনে দুঃসহ পাথবেব মত চেপে আছে। সব সময কাঁটাব মত খচ-খচ কবে বেঁধে। যেদিন বাঁচাব মেযাদ ফুবিযে আসবে হিসেব-নিকেশ ত শেষ কবতেই হবে আমাকে। ভয পেযো না। আমি উপদেশ দিতে স্থক কবব না।'

'ভয পাব কেন? আপনি বলুন।'

কার্টন হাতটাকে উদাসীন ভাবে সবিযে নিযে বললেন—'সেদিনেব সেই মাতাল মুহূর্তে তোমাকে একটুও পছন্দ হযনি আমাব। ববং অসহ্যই মনে হযেছিল। আশা কবি, ভুলে যাবে সেদিনেব কথা।'

'কবে ভুলে গেছি।'

'আবাব সেই মুখেব ভদ্রতা। ভুলে যাওযা অত সহজ নয ভাই। আমি একটুও ভুলিনি সেদিনেব কথা। তুমি হাল্কা কবে দিতে চাইলেই ত আমি ভুলে যাব না।'

'আমাব উত্তব যদি হাল্কা মনে হযে থাকে ক্ষমা কববেন আমায। আমি দিব্যি কবে বলছি, বহু দিন আগেই এ ঘটনা মুছে ফেলেছি মন থেকে। সেদিন আপনি আমাব যে মহা উপকাব কবেছিলেন তাব তুলনায এ কি অতি তুচ্ছ ঘটনা নয?'

'তুমি যেটাকে মহা উপকাব বলছ, আমি সেটাকে ব্যবসায়ে নিছক হাততালি পাওয়াব কৌশল ছাডা কিছু মনে কবিনি। যাক্, সে সব অতীতের ঘটনা।'

'সেদিন আপনি আমায় যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করেছেন আজ এখন হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেও তা নিয়ে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব না আমি '

'জান তো, আমার একটুও নীতিবোধের বালাই নেই। কোন ভাল কাজ আমি করিনি—করবও না।'

'করবেন কি না কে বলতে পারে ?'

'এ বিষয়ে আমার কথা চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে পার। যদি এই রকম একজন অপদার্থ নিগুর্ণ মাতালের সময় নেই অসময় নেই বাড়ীতে আসা-যাওয়া বরদাস্ত করতে পার, তাহলে আমি এখানে আসা-যাওযার বিশেষ অনুমতি চাইব। জীর্ণ অপ্রয়োজনের আসবাবের মত মনে কোরো আমায়। মনে কোরো একদিন সে জিনিষ কোন কাজে লেগেছিল তোমার। তোমার অনুমতির অসম্মান করব না আমি। করলেও হয়ত বা দু'-এক দিন।'

'চেষ্টা করে দেখবেন নাকি ?'

'অর্থাৎ আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ধন্যবাদ ভাই।'

সিডনী কার্টন চলে যাওয়ার পর ডার্নে কথা-প্রসঙ্গে তার কথা পাড়ল। কার্টনকে অবশ্য নিন্দিত করার কোন অভিপ্রায় ছিল না তার, কিন্তু সে সন্ধ্যার-আলোচনায় কেউ কার্টনের প্রশংসা করলে না।

কিন্তু কার্টন সম্বন্ধে এই রূঢ় সমালোচনা, তার সুন্দরী তরুণী বধূর মনে যে কোন রেখাপাত করতে পারে একথা একবারও মনে উদয় হয়নি ডার্নের। সবাই চলে গেলে ডার্নে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলে লুসি অপেক্ষা করছে তার জন্যে। তার কপালে চিন্তার কুঞ্চন-রেখা।

'আজ কি ভাবনার রাত নাকি ?'

'তাই বটে।'

'কি ব্যাপার ?'

'যদি কথা দাও যা জানবে তার অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন করবে না, তো বলি।'

'আমার প্রিয়াকে কথা দিতে পারব না, এমন কি থাকতে পারে আমার?'.

ডার্নে হাত দিয়ে লুসির কপোল থেকে সোনালী চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিল।

'আজ কার্টন সম্বন্ধে যা-যা বলেছ তার চেয়ে ঢের বেশী শ্রদ্ধা প্রাপ্য তার।'

'তাই নাকি?'

'কেন বল ত?'

'কেন, সেই কথাটি জানতে চেয়ো না। কিন্তু আমি জানি কেন সে মানুষটি শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।'

'তুমি যদি জেনে থাক তাহলেই যথেষ্ট। তবে আমায় কি করতে বল?'

'আমার একমাত্র অনুরোধ, তার প্রতি যেন ঔদার্যের অভাব না হয় কখনো। তার অবর্তমানে তার দোষ-অপরাধ লঘু করে দেখবে। আমি বলছি তার মত এত বড় মহৎ অন্তঃকরণ বিরল—সে-অন্তঃকরণের পরিচয় কদাচিৎ পাওয়া যায়। তার হৃদয়ের কোথাও গভীর ব্যথা লুকানো আছে। সেই ব্যথার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে দেখেছি আমি।'

'তাকে কোন মতে দুঃখ দেব এ চিন্তা বেদনাদায়ক আমার কাছে'—বিস্ময়াহত কণ্ঠে বললে ডার্নে—'তার সম্বন্ধে এ-রকম কোন চিন্তা কখনো আসেনি আমার মনে।'

'ওকে হয়ত আর ফেরান যাবে না। ওর চরিত্র-সংশোধন বা ওর ভাগ্যের মোড় ফেরানোর আশা হয়ত সুদূরপরাহত। কিন্তু ঐ মানুষই একদিন সুন্দর কিছু, সত্যিকার মহৎ কিছু করতে পারেন।'

সেই অপ্রেয় মানুষটির প্রতি বিশ্বাসের প্রবিত্রতায় এত সুন্দব দেখাচ্ছিল লুসিকে যে, তার দিকে চেয়ে ডার্ণের মনে হল সে যেন স্বর্গীয় কিছু দেখছে। দেখে আর তৃপ্তি মিটল না।

স্বামীর আরো কাছে সবে এল লুসি। স্বামীর বুকে হাত বেখে বললে—'আমাদের কত সুখ আর তার কত দুঃখ!'

স্ত্রীর এই মমতা ডার্ণের হৃদয় স্পর্শ করল। বললে—'এ কথা আমি চিরদিন মনে রাখব—মনে রাখব যত দিন বেঁচে থাকব।'

স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিল ডার্ণে।

২০

জীবনে বিধাতার আশীর্বাদ ক্লান্তিহীন ঝবতে থাকে। তাব স্বামী, তার বাবা, সে নিজে, মিস প্রস সকলকে নিয়ে লুসিব জীবন যেন স্বর্ণ সূত্রে গাঁথা একখানি মণিহাব। যখন হাতেব কাজ সাবা হয়ে যায়, নিঃসঙ্গ সময় পায় লুসি, অতীত-ভবিষ্যৎ তার মনকে দোলা দেয়। কালের পদধ্বনি শুনতে পায় লুসি।

দিন যায়। নতুন অভিজ্ঞতা আসে জীবনে। শরীব ভারী হয়ে মন্থব হয়ে আসে। অল্প পরিশ্রমে আজ-কাল লুসি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক অজানা জগতের আশা-আনন্দ হাতছানি দেয় তাকে। কখনো ভয় হয় যদি সে মরে যায়। ভাবতেই দুটী ডাগর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সে না থাকলে কে দেখবে শিশুর মত অসহায় তার বাবাকে। কে সেবা করবে অমন দেবতার মত স্বামীকে।

তার পর একদিন তার মাতৃস্নেহ একটি কুসুম-কোমল শিশুকন্যাকে ঘিরে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে। কন্যা হয় বধূ। বধূ হয় জননী।

লুসি মা হয়।

ছোট ছোট পায়ের ধ্বনি ওঠে সারা বাড়ীতে। শিশুর কল-কল বকুনিতে মুখর হয় লুসির ভুবন।

তারপর বোনের কোলে আর একটি ভাই হয়। লুসির জীবনে মাধুরী কানার কানায ভরে উঠতে থাকে। স্বামীর কল্যাণে সংসারের কোথাও অভাব নেই। বাবার শরীর ভাল। আর কি চাইবার রইল লুসির ?

কিন্তু ভগবানের ইংগিত বোঝা ভাব। একদিন যে স্বর্ণ কুচিটি ভগবান লুসির কোলে দিয়েছিলেন সেই ছেলেটিকে তিনি একদিন ডাকলেন তাঁর স্বর্ণকুঠীতে। মৃত্যুর পাণ্ডুর আভা-লাগা সেই ফুলের মত মখখানির দিকে চেযে লুসি তবু বিধাতার প্রতি অপ্রসন্নচিত্ত হতে পারল না। মনোহর মৃত্যুর রূপে লুসির মাতৃমন একান্ত ভাবে দেবতার চরণে বিলুণ্ঠিত হল। লুসি দেবতাকেই সমর্পণ করল দেবতার ধন।

আর সেই দিন থেকে লুসির জীবনের শত শব্দ-ঝঙ্কারের সঙ্গে গ্রথিত হযে উঠল তার বাগানের একটি ছোট মৃত্তিকা-স্তূপের নৈঃশব্দ। মায়ের কোলের কাছে বসে মেযে যখন আবোল-তাবোল বকুনি বকে, যখন পুতুল সাজায, মাযের সঙ্গে কথা হয দুই নগরের ঢঙ মিশিয়ে, তখনও মা তাকে ভোলে না। ভুলতে পারে না সেই সোনালী মুখখানি, মাটি যাকে চিরদিনের মত ছিনিযে নিয়েছে মায়ের কোল থেকে।

আর বছরে বাব ছযেক এ বাড়ীতে পা দেন সিডনী কার্টন। আসেন নিমন্ত্রণের কোন বালাই না রেখেই। সন্ধ্যা বেলাটুকু এদের পারিবারিক সাহচর্যে কাটিযে যান পুরোনো দিনের মতই। আজকাল যখন তাকে দেখতে পায় লুসি, কার্টনের মুখে মদের গন্ধ বা তপ্ততা থাকে না। তিনি এলেই অতীতের থর-থর ভূমিকায় একটা অস্ফুট স্মৃতি লুসির মনকে রোমাঞ্চিত করে। এই মানুষটির জন্য একদিন তার

কুমারী-চিত্ত মমতায় বিগলিত হয়েছিল, তা ভোলেনি লুসি। ভুলতে পারে না। কেমন করে জানে না, সিডনী কার্টন এলেই ছোট মেয়েটি অবধি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ছেলেটিও কম ভালবাসত না তাকে।

এ সংসারের স্বর্ণ-সূত্রে সিডনী কার্টনও যেন অলক্ষ্যে গ্রথিত হয়ে গেছেন একাত্ম হয়ে।

এমনি করে দিন কাটে। হাসি আনন্দে কলরবে স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলায় দোলা-লাগা সংসারে লুসির মেয়ে বছর ছয়েকের ডাগর হয়ে ওঠে।

বাবার মুখের প্রসন্নতাই লুসির যথেষ্ট পুরস্কার। বিবাহিত মেয়ের কাছে এতখানি যত্ন পাবেন এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। সে কথা একদিন নয় অনেক দিন বলেছেন তিনি নিজের মুখে। আর স্বামী! তিনি বলেন—'একলা তুমি আমাদের সকলকে ঘিরে রয়েছ, তুমি কি যাদু জান লুসি?'

সে কথার আর উত্তর দেয় না লুসি।

এমনি সময়ে লুসির অশান্তির কারণ ঘটল। নিজের নিভৃত শান্ত সংসারের শত কলরবের মধ্যে লুসি যেন বাইরের জগতের এক গম্ভীর নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। এক রুষ্ট সমুদ্রের গভীর ক্ষোভ যেন গোঙাচ্ছে। যেন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরির অবরুদ্ধ আক্ষেপ গর্জন করছে ফেটে পড়ার উন্মত্ততায়।

সতেরশ' উননব্বই সালের জুলাই মাসের এক গুমোট সন্ধ্যায় লরি ব্যাঙ্ক থেকে সোজা এলেন এদের বাড়ী। বাইরে ঝড়ের সংকেত। লুসি ও ডার্নের মাঝখানে বসে লরিও স্বামি-স্ত্রীর সঙ্গে বাইরে তাকিয়ে রইলেন অন্ধকারের দিকে। মনে পড়ল আর একদিন এমনি ঝড়ো হাওয়ার রাতে তিন জনে এমনি করে' বসেছিলেন জানলার ধারে।

'আজ সারা দিন ব্যাঙ্কে এমন কাজের ভিড় পড়েছিল যে, ভেবেছিলাম হয়ত বা আজ আর কারুর বাড়ী ফেরা হবে না'—বললেন লরি—'প্যারিসে বড় গোলমালের সম্ভাবনা। বহু লোক ভয়ে সব কিছু ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে সরিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছে। টেলসন ব্যাঙ্কের ভাগ্য ভাল। দেশ-বিদেশে তার সুনামের অভাব নেই। ডাক্তার কোথায়?'

'এই তাঁর আবির্ভাব হল'—বলে ডাক্তার স্বয়ং হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন।

'বাড়ীতেই আছেন দেখে স্বস্তি পেলাম। আজ সারা দিন এমন উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে যে, বিনা কারণেই মনটা অস্থির হয়ে আছে। বাইরে যাচ্ছেন?'

'না, না, গল্প করব আপনার সঙ্গে।'

'সেই ভাল'—বললেন লরি—'কি জানি কেন আজ সারা দিন মন উতলা হয়ে আছে। বাড়ীতে কোন ঝঞ্ঝাট নেই তো মা লুসি?'

'না'—

'মেয়ে বুঝি ঘুমুচ্ছে।'

'হ্যাঁ। অকাতরে ঘুমুচ্ছে।'

'সেই ভাল। সব নিরাপদ। সব অকাতর। এই রকমই ভাল। নাই বা হবে কেন বল? চা নিয়ে এসেছ, দাও মা। বসো এইখানে আমাদের সঙ্গে। দু'দণ্ড গল্প করি।'

লণ্ডনের ঝোড়ো আকাশের শব্দময় প্রতিধ্বনির মধ্যে প্যারিসের শত পদধ্বনি উদ্দাম বাজতে থাকে। দুই নগরের ঐক্যতান সুরু হয়।

কোথা দিয়ে কি হয় কেউ বলতে পারে না। একটা অন্ধকার অরণ্যে

দাবানল জ্বলে ওঠে। তার পর রিক্ত শাখারা যেন শাণিত তরবারির মত আকাশ বিদ্ধ করতে চায়।

কে এত অস্ত্র যোগাচ্ছে জনতার হাতে? এত বোমা বারুদ, এত ছুরি কৃপাণ বর্শা? এত কাঠের লোহার ডাণ্ডা? যে অস্ত্র পেল না সেও রক্ত-মাখা হাতে দেয়াল ভেঙে ইট-পাথর খসিয়ে নিলে।

হত্যার নেশায় উন্মত্ত জনতা আচম্বিত ঝড়ের মত ফেটে পড়ল সারা প্যারিসে। কোন পথ আর অবারণ রইল না। মাটির গর্জন আছড়ে পড়তে লাগল আকাশে। মৃত্যুর খেলায় দান ফেলতে গিয়ে প্রাণবলি দিতে কেউ নারাজ রইল না।

ঘূর্ণি যেমন একটি জলবিন্দুকে ঘিরে ঘুরতে থাকে ফেনিল আবর্তে, তেমনি দ্যফর্জের মদের দোকানে একটি লোককে ঘিরে এই জন-ঘূর্ণি পাক খেতে লাগল অবিরত। তার সারা গায়ে বারুদের গন্ধ। ঘামে-ভেজা শরীর। কাউকে ঠেলে, কারুর হাতে হাতিযার দিয়ে, কাউকে হুকুম করে, বকে, চেঁচিয়ে মানুষটা যেন একাই সর্বময়।

'তোমরা দু'জন এগিয়ে যাও। এক-একটা দল নিয়ে এগোও। মাদাম কোথায়?'

'আমি ঠিক আছি।' স্ত্রীর গলা পেয়ে দ্যফর্জ ফিরে তাকালে। আজ আর সে নিঃশব্দ রমণীর হাতে বোনর কাঠি নেই। একটি ভাবী কুঠার তার দৃঢ় হাতে, কোমরে পিস্তল আর ছোরা।

'তুমি কোথায় যাবে?'

'যাবো। এখন যাব তোমাদের সঙ্গে। তার পর মেয়েরা বেবোলে তাদের আগে আগে।'

'তবে আর বিলম্ব কেন?'—সিংহের মত গর্জন করে ওঠে দ্যফর্জ—'বন্ধুগণ, তবে আর বিলম্ব কিসের? চলো ব্যাস্টিল—'

ঐ একটি কুখ্যাত কথার উচ্চারণ মাত্রেই সারা ফ্রান্স যেন গর্জন করে উঠল—'ভাঙো ব্যাষ্টিল।'

কেল্লা-কারাগার ব্যাষ্টিল। তার চার পাশে গভীর গড়। দুটো টানা সাঁকো। পাথরের মোটা দেয়াল, আটটা বিরাট টাওয়ার। আর সেই দুর্গের অন্তরাল থেকে গোলা-বারুদের অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

তবু গড় পেরিয়ে গোলা-বারুদের ধূম্রজাল বিদীর্ণ করে গর্জনে গর্জনে এগিয়ে চলল জনস্রোত। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অবলীলাক্রমে মাড়িয়ে দিয়ে গেল মৃত্যুকে।

কোথা দিয়ে কি হচ্ছে কে জানে? শুধু এক তরঙ্গ আছড়ে পড়ার পর আব এক তবঙ্গ দ্বিগুণ বেগে আছড়ে পড়ছে। অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে এক সময পাথর ফাটল। ভিতরের কারা যেন সাদা পতাকা তুলে কি সংকেত কবলে।

'বন্ধুগণ—ব্যাষ্টিল।' তার পব আব কিছু শোনা গেল না। কেবল প্রলয-পযোধি জলে দিগ্‌দিগন্ত আলোড়িত হতে লাগল।

টানা সাঁকো পেরিয়ে ডিফর্জ যখন দুর্গেব প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল তার বুকে হাঁফ লেগে গেছে। নিঃশব্দে একবার তাকিয়ে দেখলে সে চারি পাশে। শত-সহস্র হাতিযার তাকে ঘিরে জমায়েত হযেছে ইতিমধ্যে। মাদামও আছে সে দলে।

ব্যাষ্টিল দখল করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করা সুরু হল। বিদ্রোহীদের ভয়ে ত্রস্ত প্রহরীরা সমস্ত দরজা দরাজ করে খুলে দিলে। আর সেই বিরাট কারাগাবের শত শাখা পল্লবিত ছোট ছোট অন্ধকার গলিপথ বেয়ে জনতা জলস্রোতের মত চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মুক্ত কয়েদীদের জযোল্লাসের সঙ্গে জনতার হুঙ্কার বজ্রনাদের মত বাজতে লাগল আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে অত্যাচারীদের বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে।

ব্যাষ্টিলের গভর্ণরকে ধরে নিয়ে এল এক দল। এই শয়তানটার

হুকুমে কত দিন ধরে, অসহ্য নির্যাতন সয়েছে হাজার হাজার লোক। এই একটু আগেই এর আদেশে হাজার হাজার লোক গোলা-বারুদের মুখে প্রাণ দিয়েছে। তাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে বাইরে। মানুষটার হাতে অনেক দিন ধরে নিরীহ অনাহারী লোকের খুন লেগেছিল। এখনও তার হাত সন্ত খুনে রাঙা। তবুও এই মানুষটার প্রাণের দাম হল এত দিনে। একে না মারতে পাবলে সারা ফ্রান্সের ক্ষুধা আর নির্যাতন শান্তি পাবে না। হ্যফর্জের নেতৃত্বে এক দল লোক গভর্ণরকে হোটেল অবধি নিয়ে এল। সেখানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সামনে পিছনে চাবি দিক থেকে শয়তানটার সর্বাঙ্গে ঘা পড়তে লাগল। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত দেহে।

অত্যাচারের প্রথম জয়ধ্বজা মাটিতে পড়তেই জনতা পৈশাচিক উল্লাসে নাচতে লাগল। সেই মরা মানুষটাব গলায পা দিযে মাদাম তাব মাথাটা কেটে নিলে শান্ত ভাবে।

তার পর সারা প্যারিসে ছড়িয়ে পডল তাবা।

মদের দোকানের সামনে একদিন যে তবল রক্তস্রোত বইল, তাব বঙ লাগল যাদের হাতে, রঙ লাগল যাদেব মনে, মদেব বঙেব মত আর তা ধুযে-মুছে নিলে না তারা। বিদ্রোহের পদপাতে ফ্রান্সের মাটি প্রতিধ্বনি পাঠাল আকাশে।

সমুদ্রের ওপারে আর একটি নগরে চারটি প্রাণীর নিভৃত শান্ত সংসারের সুখে কোথাও ছেদ ছিল না। তবু অজানা ভযে লুসিব বুক কাঁপে। দূর এক নগরেব অশান্ত কলবব তার বুকে প্রতিধ্বনি পাঠায। প্রিয মানুষগুলিকে আঁকড়ে ধরে লুসি আরো নিবিড় মমতায।

২১

গণদেবতার রুদ্র রোষ স্তিমিত হয়ে এল সাত দিন বিষোদ্‌গারের পরে। ঝড়ের পর প্রকৃতি হল শান্ত। অন্য দিনের মত আজ মদের দোকানে পরিচিত আসনটিতে বসেছিল মাদাম ত্যফর্জ। কোলের উপর হাত দুটি জড়ো করে চেয়ে দেখছিল নরম রোদের দিকে। আজ তার মাথায় পরিচিত গোলাপটি নেই। থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে এত দিনে। এই সাত দিনেই সারা সহরের ক্ষুধিত মানুষদের মধ্যে একটা গভীর বোঝাপড়া হয়ে গেছে। মৃত্যুর উৎসবে প্রাণে প্রাণে গড়ে উঠেছে আত্মীয়তা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের আর কোন প্রতীকের দরকার নেই।

এই তো ক'দিন আগেও পথের লোকগুলির দিকে তাকালে করুণা হোত। তাদের মুখে-চোখে ছিল নিরুপায় আক্রোশ। শুষ্ক বিবর্ণ তোবড়ান গালে অভাবী সংসারের গহ্বর দেখা যেত। ছেলে-মেয়েদের জীর্ণ চেহারায় অভাবের হাওয়া-লাগা বিকৃতা চোখে পড়ত বড় করুণ করে। কিন্তু ঐ ক'দিনে সব যেন বদলে গেছে।

দোকানে রাস্তায় লোক আনাগোনার বিরাম নেই। মানুষগুলোর চেহারায় কোথাও শ্রী লাগেনি বটে কিন্তু মুখে-চোখে কিসের যেন জৌলুষ। সে-জৌলুষ নতুন জাগা পৌরুষের। 'এত দিন বেঁচে থাকা ছিল একটা জগদ্দল পাথর, আজ বুঝেছি সেই পাথরে তোমাদের মুখ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।' শীর্ণ হাতগুলিতে খুনের শক্তি জেগেছে। যে সব নরম আঙুলে বোনার কাঁটা চলত দ্রুত, অনেক টাটকা রক্তের দাগ লেগেছে সেগুলিতে।

সকালের রৌদ্রময় পথে লোক-চলাচলের দিকে তাকিয়ে নানা কথ

ভাবছিল মাদাম। তার পাশে বসে আর একটি মেয়ে, এখানকারই এক মুদীর ঘরের বৌ, দুটি বাচ্চার মা। মেয়ে-বিপ্লবীদের দলে সেও এক জন নেত্রী।

'শুনছ, কে যেন আসছে।' সহচরীর সাড়া পেয়ে চকিত হয়ে উঠল মাদাম।

পাড়ার দূর প্রান্ত থেকে একটা কলগুঞ্জন চকিতে এসে পৌঁছল মদের দোকান অবধি। মাদাম চেঁচিয়ে হুকুম দিল—'চুপ করুন বন্ধুগণ! জ্যফর্জ আসছে।'

হাঁফ নিতে-নিতে এসে পৌঁছল জ্যফর্জ। দোকানে ঢুকেই মাথার রক্তবর্ণ টুপিটা খুলে নিয়ে সে ঘরে-বাইরের কৌতূহলী জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু যেন জিরিয়ে নিতে লাগল।

'কি হয়েছে?'

'খবর আছে।'

'কিসের খবর?'

'তোমাদের মনে আছে বুড়ো ফুলোনের কথা। যে শয়তান আমাদের না-খেতে-পাওয়া মা-বোন-ছেলে-মেয়েদের বলেছিল ঘাস খেয়ে পেট ভরাতে। সেই শয়তানটা মরে হাড় জুড়িয়েছে শুনেছিলাম কিন্তু বেটা সত্যি মরেনি।'

'তবে?'

'মরে নি বেটা। আমাদের ভয়ে বেটা মরার গুজব রটিয়েছিল। এমন কি তার কবর অবধি হয়েছিল মিছি মিছি। সেই বেটাকে তার দেশেতে খুঁজে বার করেছে আমাদের ভাইরা। নিয়ে এসেছে শেকল বাঁধা করে। তার কি শাস্তি পাওনা বল?'

সত্তর বছরের বুড়োর কানে সে জনতার রায় পৌঁছল না। যদি যেত সে আওয়াজেই তার পরিত্রাণ হত।

ঝড়ের আগে অশুভ মৌন। চোখে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের চমক। মাদাম দাঁড়িয়ে উঠতেই তার পায়ের ঠোকায় একটা ড্রাম আর্তনাদ করে উঠল।

'বন্ধুগণ, আর দেরী কেন?'

মাদামের কোমরে দীঘ ছোরা। রাস্তায় ড্রামের আওয়াজ। চকিত মৌনতার বাঁধ ফাটিয়ে কলরব উঠল রুদ্ধ প্রতিহিংসার। ফুঁসে উঠল জন-জলতরঙ্গ।

ক্ষিপ্ত পুরুষদের চেহারায়, তাদের হাতের অস্ত্রে বিপ্লবের শৌর্য। মেয়েদেব চণ্ড মূর্তিতে বিপ্লবের জিঘাংসা।

'নেমে এস, শয়তানটার বুক চিরে ফেলব। শযতান আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। খুন করেছিল আমাব মাকে। আমার বাবা না খেযে মরেছে, তবু তার দযা পাযনি।' বিপর্যস্ত বেশ বিপর্যস্ত কেশ বুক-ফাটা আর্তনাদে আকাশ ফাটিযে এগিযে এল মেয়েরা মাযেরা। 'রুটি কোথায পাবে, ঘাস খাও' বলেছিল শযতান। 'না খেযে-খেযে আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল, ফুলোন আমার কচি বাচ্চার মুখে খড় গুঁজে টানতে বলেছিল। আজ সেই অপবাধের শাস্তি দেব ওকে। জঠর-জ্বালার মৃত্যু ওর শোণিতে তৃপ্তি পাবে। কত কবরে মৃতদেহ নড়বে পৈশাচিক আনন্দে।'

ছোটো ছোটো। শযতানের ছলের অভাব নেই। হযত পালাবে, হযত ফসকে যাবে।

যে ঘরে শযতানটা ছিল এবা ক'জন আগে গিয়ে হামলে পড়ল সেইখানে। বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার মানিযেছে। হাত-পা-বাঁধা শকুনের মত পড়ে আছে ফুলোন। পিঠের উপর একগাদা খড় বাঁধা।

'ঐ খড় খাবে শযতান নিজে।'

হাতের ছোরাটি নিয়ে অস্থির খেলা খেলতে খেলতে বললে মাদাম।

এই পরিহাস মুখে মুখে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। নারকীয় অট্টরোল উঠতে লাগল দিক্-দিগন্ত কাঁপিয়ে।

সাপের সঙ্গে খেলা। দড়ি-বাঁধা অপরাধী শয়তান বেকুবের মত চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল প্রতিশোধের চেহারা। শুনতে লাগল জিঘাংসার গর্জন।

যেন একটা তাল-গোল-পাকানো-কি পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে বুড়োটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল রাস্তা অবধি। মুখে রা নেই। যে মুখে বলেছিল পাপ কথা, সে মুখে ওরা গুঁজে দিয়েছে খড়ের গাদা।

তবু মিনতির শেষ নেই। বাঁচার কাকুতি করছে হাত তুলে তুলে। চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে পায়ের পাথর। হাত তুলে শাসাতেও ছাড়ছে না একটু সুবিধা পেলে।

পথের ওপর গ্যাস-পোষ্ট। তাতে দড়ি ঝোলান। সেই দড়ি গলায় বেড় দিয়ে ওরা ঝুলিয়ে দিল ওকে। রক্তাক্ত শরীর, মুখের খড়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। হাওয়ায় দোল খাচ্ছে যেন একখানা শুকনো কাঠ। দেখে জনতার আর উল্লাসের সীমা রইল না।

সারা দিন কেটে গেল প্রতিহিংসার আগুন নেবাতে। সন্ধ্যায় জ্বলল পথে টিম-টিম আলো। যে যার ঘরে ফিরল। সেখানে অভাব তো নিত্য-সহচর। ছেলেরা কাঁদছে রুটির জন্যে। স্তূপাকার রুটি-মাংসের দোকানে লম্বা লাইন পড়েছে। তবু গল্পের বিরাম নেই। অরুচি নেই পুরোনো দুঃখের জাবর কাটতে।

কিন্তু আজ বাসি রুটি চিবোতে কষ্ট নেই। শয়তানদের রক্ত দেখে এসেছে ওরা ফোঁটা-ফোঁটা ঝরতে। দেখে এসেছে গ্যাসের আলোর নীচে শয়তানের দেহ দুলছে শেষ বারের মত। সেই ওদের পুষ্টি! এত দিনের ক্ষুধার তৃপ্তি!

রাত নিশুতি হল। তবু মদের দোকানে আজ লোক আনাগোনার শেষ রইল না। ভোর বেলা দোকান বন্ধ করল ডাফর্জ।

দুই মানুষে যখন একলা হল ডাফর্জ বৌকে বললে—'তবে কি সত্যি বিপ্লব এল বৌ?'

বৌ বললে—'এল কি গো? বিপ্লব তো মসনদে বসেছে।'

২২

আশ্চর্য দিন-বদলের পালা পড়ল।

যে গ্রামের কুয়োর ধারে একদিন সৈন্যরা চল্লিশ ফুট উঁচুতে ফাঁসীতে লটকেছিল একজনকে, ত্রাসের সঞ্চার করেছিল সারা গ্রামে, আজ সেখানে মাঠ-ঘাট-বন-কুয়ো সবই তেমনি আছে। সেই জেলখানা, সৈন্য পাহারা সবই আছে। শুধু কমেছে সৈন্যদের অত্যাচার দাপট। আজ অফিসাররাও জানে হুকুম দিলে পাহারাদাররা সে হুকুম মানবে না। জেলখানা থেকে বহু দূর অবধি চোখে পড়ে দেশ। চোখে পড়ে বন্ধ্যা মাঠ আর নিরন্ন ঘর। যেমন মানুষ তেমনি ফসল। কচি ঘাসের সবুজে হলুদের ছোপ লাগা। গাছ-গুল্ম সবই যেন কেমন খর্বাকৃতি। বাড়-বাড়ন্ত নেই কিছুরই। মানুষের ঘরেও যেমন, প্রকৃতিরও তেমনি। অত্যধিক অপচয়ে সৃজন-শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

জমিদার ভাবতেন ঈশ্বরের আদেশে তিনি ভাল করছেন। ভগবানের ভাঁড়ার ফুরোবে না কোন দিন। তাই নিঙড়ে নিতেন কঠিন হাতে। মানুষের ঘরে প্রকৃতির বুকে শোষণ চলেছিল অবিরাম। তা এত শীঘ্র ফুরিয়ে যাবে কে ভেবেছিল।

এ সব জায়গা মাড়াতেন না তো কোন দিন। যদি বা কখনো

আসতেন, টাকার জন্যে মহল পরিদর্শন করতেন। পাইক-বরকন্দাজ বেঁধে নিয়ে আসত প্রজাদের, তিনি শুষতেন তাদের রক্ত। আশে-পাশের বনে-জঙ্গলে পশুশিকারের মত এও ছিল তাঁর নেশা। সখের জন্যে গ্রাম-জনপদ বন তৈরী করতেন যাতে জন্তু-জানোয়াররা বাড়ে। মনের খেয়ালের চরিতার্থতা ঘটে। এমনি করে বন্য জীবজন্তু বেড়েছে আর বেড়েছে লক্ষ্মীছাড়া সমাজের আয়তন।

এই গ্রামের রাস্তা-সারানো মিস্ত্রী লোকটা একলা কাজ করত দিনের পর দিন। যে মাটি কাটে তা থেকে মুখ তুলে এক দিনও ভাবেনি সে, কার জন্যে সে এত খাটছে। যে মেহনত করে পেট পুরে অন্ন জোটে না, সে-মেহনত তার কিসের দরকার? শুধু কোন-কোন দিন যখন দিগন্ত-জোড়া রোদে চারদিক ঝলমল করত, তখন গাছেব ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বসে সে চেয়ে দেখত—এক এক জন অপরিচিত রুক্ষ চেহারার লোক তার পথ দিয়ে চলে যায়। পায়ে তাদের দূর-দূরান্তের ধূলো—কাঠের জুতোয় শুকনো মাটির সঙ্গে জড়ান পাতা আর শ্যাওলা।

এমনি একদিন তুপুর বেলা শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল ভয়ানক। পথের ধারে পাথরের ঢিপির উপর বসেছিল সে মাথা বাঁচিয়ে। দেখলে তেমনি এক জন লোক বৃষ্টি-শিলা মাথায় করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। জনহীন পথে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে লোকটা আসছে যেন প্রেত।

কাছে এসে লোকটা তাকে দেখে সংকেত করলে। বললে—'জ্যাকুজ।' 'জ্যাকুজ'—বলে মিস্ত্রী সাড়া দিতেই আগন্তুক বললে—'হাত দাও হাতে।' তু'জনে পাশাপাশি বসলে পাথরের ঢিপির ওপর। একটা নলে কি যেন ভর্তি করে লোকটা চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালালে। তার পর তুই আঙ্গুলে কি নিয়ে 'সেই আগুনে দিতেই দপ করে আগুন ফুঁসে উঠল। ধোঁয়া হল চারিদিকে।

'আজ রাত্তিরে?'

'আজই ?'

'কোথায় ?'

'এইখানে।'

আগন্তুক বললে—'কোন পথে গেলে সুবিধে বলত ?' চড়াই-পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে মিস্ত্রী—'ঐ পথ ধরে সামনে চলে যাবে—কূয়োর ধার দিয়ে এগিয়ে—'

'দুত্তোর কূয়োর নিকুচি করেছে। কোথায় জায়গাটা বল না।'

'গ্রামের শেষে যে পাহাড় ঢিবি তার থেকে দেখতে পাওয়া যায়।'

'ব্যাস, ঐতেই চলবে। কতক্ষণ কাজ করবে বন্ধু ?'

'ধর না কেন, সন্ধ্যে অবধি।'

'তবে যাবার আগে আমায় জাগিয়ে দেবে তুমি। দু'রাত হেঁটেছি। চোখের পাতা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠছে। আমি একটু শুয়ে পড়ছি। তুমি আমায় জাগিয়ে দিয়ে যাবে নইলে আমার ঘুম ভাঙবে না।'

'দোবো। তুমি শুয়ে পড়ো ভাই।'

সেই পাথরের ওপর পথের ধূলোয় শুয়ে পড়ল লোকটা। একটু পরেই এ কবারে অচেতন।

বৃষ্টির পর মেঘ স্তূপের আড়ালে সূর্য দেখা দিলেন। তার পর শুরু হল মেঘ-রৌদ্রের খেলা। কখনো রৌদ্রস্নান, কখনো বিচিত্র বর্ণালী। পাতায় শাখায় জলকণাগুলি হীরের কুচির মত জ্বলতে লাগল নানা রঙে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেলের ভাঁটা-স্রোতে এল সন্ধ্যা। ভেজা মাটিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোয় লোকটি। সারা গায়ে পোষাক ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে, তবু তার সাড়া নেই।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে গ্রামে ফিরবার উদ্যোগ করে মিস্ত্রী ডেকে দেয় লোকটিকে। ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসতে বসতে বলে—'পাহাড়ের থেকে তিন ক্রোশ বলেছিলে না ?'

'প্রায়।'

গ্রামে ফিরে গিয়ে কথাটা বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারল না সে। চুপি চুপি জানালে ক'জন পরম আত্মীয়কে। সেই কথা কানাকানি হতে হতে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। আজ রাতে আর খাওয়ার পর কেউ শুতে গেল না অন্য দিনের মত। বাইরে এসে বসে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আকাশের এক বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে।

গ্রামের মধ্যে জানাজানি হল। এখানকার নায়েবের কানেও কথাটা পৌঁছল। রাতের গা ঢাকা অন্ধকারে সেও ছাতের ওপর একলা দাঁড়িয়ে রইল। কি একটা অস্পষ্ট অস্বস্তিতে সারা গায়ে কাঁটা দিতে লাগল অমন তেজী পুরুষের। নীচের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় কূয়োর ধারে জটলা-করা এক দল নারী-পুরুষকে। তাদের নিথর দাঁড়িয়ে থাকাটাই যেন অশুভের সূচনা।

রাত যত গভীর হয় বাতাসের বেগ বাড়ে। মঁসিয়ের প্রাসাদের চারি পাশে বেড়-দেওয়া উদ্যান-কাননে একটি বনস্পতিও স্থির থাকে না। ঝড়ের হাওয়া কানন-বীথিকা পার হয়ে প্রবেশ করে প্রাসাদের ঘরে ঘরে। অস্ত্র-ঘরে ঝন-ঝন ওঠে ঝঙ্কার। রেশমের পর্দা তুলে ঝড় যেন খুঁজে খুঁজে দেখে তন্ন তন্ন করে। ঘর থেকে ঘরে প্রেত-কণ্ঠে সাড়া দিতে থাকে ঝড়ো হাওয়া।

আর সেই আদিগন্ত ঝড়ের পটভূমিকায় অন্ধকারের অন্তরাল থেকে চারিটি প্রাণী নিঃশব্দে বুকে হেঁটে আসে গাছেদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে। একবার এক হয় চার জনে' তারপর আবার চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু রাত্রির অন্ধকারে রুদ্র প্রকৃতির শন-শন আওয়াজ ওঠে সব কিছু ছাপিয়ে। প্রলয় রাত্রিতে বিভীষিকা তার করাল ডানা বিস্তার করে রাখে।

কিন্তু ধীরে ধীরে তিমির অন্ধকার বিদীর্ণ করে সারা প্রাসাদ কি এক ভৌতিক দীপ্তিতে উজ্জল হয়ে উঠল। সেই অস্পষ্ট আলো বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। তার পর সম্মুখদিকে দু'একটি করে লেলিহান শিখা বাতাসের তাড়নায় সর্পফণার মত দুলতে লাগল তীব্র নীল লালসায়। প্রথমে বারান্দাগুলি জ্বলতে লাগল, তার পর দরজা-জানালা-ছাত। আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

বাসায় যে ক'জন লোক থাকত, তারা ভয়ার্ত চীৎকার করে ছুটে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কে যেন ছুটে গেল নায়েব গ্যাবেলের বাড়ীর দিকে। সর্বনাশের কথা তাকে জানাতে।

পথে জেলখানার আগে কূয়োর ধারে নির্বাক জনতা। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বল-জ্বল করছে আগুনের আভায়। সে মুখে কী দেখলে ঘোড়সওয়ার সেই জানে, সপাৎ করে চাবুক হানলে সজোরে।

জেলখানার সামনে অফিসাররা দাঁড়িয়ে। পিছনে সৈন্যরা। 'প্রাসাদ পুড়ছে। আপনারা শীগগির আসুন। সব যায়।' সাড়া দিল না কেউ। অফিসাররা একবার পিছনের সারিতে সৈন্যদের দিকে তাকালে। সৈন্যরা একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আগুনের দিকে। চোখা-চোখি হল না অফিসারদের সঙ্গে। তখন অফিসাররা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে—'যাক পুড়ে। পুড়বেই তো।'

সারা গ্রামে আগুনের রোশনাই। বড় বড় কাঠের পাটাতন পড়ছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। পাথরের মূর্তিগুলো ওপর থেকে টলে পড়ছে বিকৃত বীভৎস হয়ে। আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে হাওয়া। পুড়ছে প্রাসাদ।

বাগানের গাছে গাছে আগুন লেগে গেছে। শাখায়-শাখায় পল্লবিত বৃহৎ বনস্পতির দল আগুনে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। এক শাখার আগুন প্রতিবেশী বনস্পতিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঝড়ো হাওয়ায় মুহূর্তে

মুহূর্তে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। আগুনে হাওয়ায় শন-শন করছে বন। যেন লক্ষ লক্ষ শিশু শীৎকারে উন্মত্ত হয়ে নাচছে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে।

গ্রামের বিপদ-ঘণ্টা বাজাবার ইচ্ছা ছিল নাযেব গ্যাবেলের। কিন্তু তার আগেই লোকেরা দখল করে নিয়েছে সেই বিপদ ঘণ্টা। আগুনের তালে তালে বাজছে সেই ঘণ্টা।

তার পর সবাই মিলে হানা দিল নাযেব গ্যাবেলের বাড়ী। নেমে এসো। এত দিন যত দুর্ভিক্ষ হযেছে, যতবার মুখের গ্রাস কেড়ে নিযে জমিদার ঋণের ওপর সুদ চাপিয়ে বংশ বংশ ধরে উই-খাওয়া কাঠের মত ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, সব সুদে-আসলে শেষ হবে আজ। এসো। নেমে এসো।

উত্তেজিত জনতা আর উত্তেজক আগুন। গ্যাবেল মোটা মোটা কাঠ দিয়ে দরজা বন্ধ করলে। তার পর ছাতে গিযে দাঁড়াল। যদি ওরা দরজা ভাঙে, ছাত থেকে সে লাফিযে পড়বে ওদের ওপর। মরবার আগে দু'এক জনকে মারবে।

কিন্তু কি জানি কেন, সে রাত্রে জনতা ঘরে ফিরে গেল। তারা ফিরে গেলেও গ্যাবেলের ভয় গেল না। সারা রাত সেই ভস্মাবশেষের দিকে তাকিয়ে সজাগ হয়ে বসে রইল সে।

সারা ফ্রান্সে এই আগুন জ্বলছে। কোথাও জনতার জিত, কোথাও বা সৈন্যদের। প্রলয় কালে অত সূক্ষ্ম অঙ্কের কে ধার ধাবে বল ?

২৩

প্রলয়ের আগুন ধিকি-ধিকি করে জ্বলে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল দিনে দিনে। সে আগুন যাদের স্পর্শ করল তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরদিনের মত। যারা দর্শকের মত চেয়ে দেখলে, তারাও সেই হুতাশনের প্রলয়ঙ্কর রূপে বিমূঢ় হয়ে গেল। তিন বছর ধরে দাউ দাউ করে জ্বলল সেই আগুন – তার পর ফ্রান্সের ভূমিতে শ্মশান রচনা করে ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল।

এই তিনটি বছর সমুদ্র-পারের এক নিভৃত পথের কোণে ছোট লুসির বয়সের মালায় আরো তিনটি কুসুম গ্রথিত হল। একটি নিভৃত সংসারের হাস্যময় দিন-রাত্রির কোথাও কোন বিঘ্ন রইল না। শুধু লুসির মনের ভয় যেন কাটল না কিছুতেই। পথের লোক চলাচল যখন বাড়ে, ঘরে বসে সে শুনতে পায় জনতার পদধ্বনি—সারা মন অশুভের সংকেতে দুরু-দুরু করতে থাকে। কেমন যেন বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে যায় সে।

কোথায় কারা একটা রক্তনিশানের তলায় মৃত্যুর বেদীতে প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসছে দলে দলে। তাদের পায়ের আওয়াজে দূর-দূরান্তের মানুষ নিভৃত শান্তির নীড়ে সচকিত হয়ে ওঠে আচম্বিতে।

যারা কোন রকমে বেচে গেছে জনতার প্রতিহিংসা থেকে, অনুগৃহীত সেই সব নীল রক্তের জীবেরা ফ্রান্স থেকে দলে দলে পালিয়ে এসেছে ইংল্যাণ্ডে। কেউ এনেছে সঙ্গে করে ধন-রত্ন, কেউ পালিয়ে এসেছে কেবল পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে। পুরানো খদ্দেরের দিকে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে টেলসন ব্যাঙ্ক। অসময়ে ব্যাঙ্ক তাদের বিমুখ করেনি।

সেদিন কুয়াশাচ্ছন্ন আর্দ্র বিকেল বেলা বন্ধের কিছু আগে টেলসন

ব্যাঙ্কে হৈ-চৈ ভিড়ের অন্ত ছিল না। লরি নিজের ডেস্কে বসেছিলেন, তাঁর সামনে নীচু-গলায় কথা বলছিল ডার্নে। চারি পাশের কলরবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা দু'জনে যেন গোপন কোন সলা-পরামর্শ করছিল। টেলসন ব্যাঙ্ক আগে কেবল টাকাকড়ি-সম্পত্তির কারবার করত, কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লব বেধে ওঠবার পর থেকেই এটি হয়ে উঠেছে সংবাদ-প্রতিষ্ঠান। যারা আত্মরক্ষা করে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে এসেছেন, তাদের খবর দেওয়া নেওয়ার কাজ হাতে নিয়েছেন ব্যাঙ্ক। সেই কারণেই আজকাল লোক-জন থৈ থৈ করে এখানে সব সময়। এখন টেলসনই আশা, টেলসনই ভরসা।

'কিন্তু আপনি'— বললে ডার্নে।

'বুঝেছি, আমি খুব বুড়ো হয়ে পড়েছি—না?'

'আবহাওয়ার অবস্থা অনিশ্চিত। পথ দীর্ঘ। যান-বাহন পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই। চারিদিকে অরাজকতা—এমন কি সহরও হয়ত নিরাপদ নয় আপনার পক্ষে। এমন অবস্থায়—?'

'তুমি দেখছি আমাকে থাকার চেয়ে যাওযারই যুক্তি দেখালে। সে দেশ আমার পক্ষে যথেষ্টই নিরাপদ। আমার মত বুড়ো-হাবড়াদের নিয়ে মাথা-ঘামানোর অত ফুরসৎ কোথায় তাদের? আর সহরের অবস্থা অরাজক যদি না হবে, ব্যাঙ্ক থেকে কেনই বা একজন পুরানো, বিশ্বাসী, লোককে পাঠাতে যাবে? যান-বাহনের অনিশ্চয়তা, পথের দীর্ঘতা আর শীত সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, এত বছর কাজ করার পর আজ যদি আমি ব্যাঙ্কের হয়ে এই ঝক্কিটুকু না নি তো আর কে নেবে?'

'আমার ইচ্ছা আমিও যাই আপনার সঙ্গে।'

'তুমি যাবে? ফ্রান্সে তোমার জন্ম—তুমি যাবে সেখানে? চমৎকার বুদ্ধি তোমার!'

'ফরাসী বলেই ভাবছি কথাটা বেশী করে। দুঃস্থদের প্রতি যার

দরদ আছে—যে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জমিদারী তুলে দিয়ে এসেছে তাদের হাতে, তার ভয়ের কারণ কি আছে? লোকে তার কথা শুনবেই। হয়ত তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে কিছুটা সামলাতে পারব। আপনি চলে এলে কাল রাতে লুসির সঙ্গে আমার এ নিয়েই কথা হচ্ছিল।'

'লুসির নাম উল্লেখ করতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তাকে ফেলে এই সময় ফ্রান্সে যেতে চাও?'

'অবশ্য আমি তো আব সত্যি যাচ্ছি না'—মুখে হাসি টেনে উত্তর দিল ডার্ণে।

'যে অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ-কারবার চালাতে হয় সে সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই তোমার'—চাপা-গলায় বললেন লরি—'ভগবান না করুন, আমাদের দলিল-পত্র যদি কোন গতিকে জনতার হাতে পড়ে, কত লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আজ বা আগামী কাল প্যারিস লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত, আগুনে ভস্মিভূত হবে না, একথা কে বলতে পারে? কাজেই এ সময় তাড়াতাড়ি দলিল-পত্র উদ্ধার করে কোথাও লুকিয়ে বাখার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। টেলসন ব্যাঙ্কের কর্তারা জানেন সে কথা। ষাট বছর যাঁদের নিমক খেয়েছি আজ বিপদের দিনে তাঁদের অকূলে ভাসিয়ে দেব?'

'আপনার সাহসের প্রশংসা করি আমি।'

'যতই তুচ্ছ হোক না কেন এই মূহূর্তে প্যারিস থেকে কিছু বের করে নিয়ে আসা একরকম অসম্ভব। আজই বহুমূল্য জিনিষ দলিল-পত্র নিয়ে একদল এসেছে এখানে। তারা যখন সীমান্ত অতিক্রম করছিল তাদের প্রাণ একটি সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছিল। অথচ একসময় ছিল, কত কিছুই সেখান থেকে এখানে আসা-যাওয়া করেছে। কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু এখন সকল পথ রুদ্ধ।'

'আজ রাত্রেই কি রওনা হবেন?'

'আজ রাত্রেই। এত জরুরী ব্যাপার যে আর মূহূর্ত মাত্র বিলম্ব করা অসম্ভব।'

'কেউ সঙ্গে যাবে না?'

'অনেকের নামই উঠেছে কিন্তু কেউই আমার পছন্দ নয়। শুধু জেরিকে সঙ্গে নেব। এই কর্তব্যটুকু শেষ করে আমি টেলসন ব্যাঙ্ক থেকে চিরকালের মত ছুটি নেব। যথেষ্ট বুড়ো হয়েছি। এখন পরকালের কথা ভাববার সময় হয়েছে।'

ডার্ণে যখন লরির সঙ্গে আলাপ করছিল ব্যাঙ্কের এক জন লরির কাছে এসে তার ডেস্কে একটি ময়লা মুখবন্ধ খাম রেখে প্রশ্ন করলে—'ঠিকানার কোন হদিস পেলেন?'

ডার্ণের খুব কাছে পড়েছিল খামটি। সহজেই তার নজর পড়ল ঠিকানাটার ওপর। তারই পূর্ব নাম চিঠিখানির উপরে দেখে কম বিস্মিত হল না ডার্ণে। ঠিকানাতে লেখা ছিল তার ফ্রান্সের জমিদারীর নাম। টেলসন ব্যাঙ্কের মারফত এসেছে ফ্রান্সের গ্রাম থেকে।

বিয়ের দিন সকালে ডাঃ ম্যানেট ডার্ণেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন তার আসল নাম তাদের দু'জনের মধ্যেই গোপন রাখতে। ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে যেন বেফাঁস না হয় বাইরে। কেউ জানেও না আজ পর্যন্ত—তার বৌও না। লরির কথা অবশ্য আলাদা।

লরি বললেন—'যারা ব্যাঙ্কে আসে তাদের প্রত্যেককে দেখিয়েছি চিঠিখানা। কিন্তু ঐ নামের কোন লোকের আজও পর্যন্ত হদিস পাওয়া যায়নি।'

ব্যাঙ্ক বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। লরির ডেস্কের পাশ দিয়ে চলেছে নানা লোক। লরি তাদের দিকে চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কেউ চেনেন নাকি লোকটিকে।

কেউ চেনে না। কিন্তু নানা বিরূপ মন্তব্য চলতে লাগল লোকটিকে নিযে। নানা শ্লেষাত্মক তীক্ষ্ণ, ইংগিত। ফ্রান্সের জমিদারী ফেলে ইংল্যাণ্ডে এসে বসে আছে। অথচ তার কাকাকে খুন করেছে জনতা। এতদিন সব সম্পত্তি বেওযারিশ হযে পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে। কাপুরুষ, স্বার্থপব !

ব্যাঙ্ক একে একে খালি হযে গেল। রইল বাকি শুধু লরি আর ডার্ণে।

ডার্ণে বললে—'আমি চিনি লোকটিকে।'

'তুমি এই চিঠিব দাযিত্ব নেবে? জান তো কাকে দিতে হবে?'

'ঠিক লোকের হাতেই পৌঁছে দেব। আপনি কি এখান থেকেই যাত্রা করবেন?'

'এখান থেকেই। ঠিক আটটার সময।'

'আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিতে আসব।'

ডার্ণে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এসে একটু নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে চিঠি খুলে পড়তে লাগল—

'বহু দিন প্রাণ হাতে লইযা কাটানোর পর অবশেষে প্রজাদের হাতে বন্দী হইযাছি। তার পর চলিয়াছে নিদারুণ অত্যাচার ও অপমান। পথেও অত্যাচাবের অবধি ছিল না। কিন্তু এইখানেই শেষ নয। তারা আমাব বাড়ী-ঘর জ্বালাইয়া দিযাছে।

যে অপরাধে আমাকে বন্দী করা হইযাছে, যাহার জন্য আমার বিচার হইবে এবং বিচারে প্রাণদণ্ড হইবে—তাহা এই, আমি নাকি প্রজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিযাছি। একজন দেশ-ত্যাগীর স্বপক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু আমি যে কখনই তাহাদের শত্রুতা করি নাই, সে কথা কে শুনিবে? যে দিন হইতে আপনার সম্পত্তি বাস্তত্যাগী সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহার পর আমি এক

কপর্দকও কর আদায় করি নাই। আমি কোন প্রকার শঠতার আশ্রয় লই নাই। কিন্তু কে আমার কথায় কান দিবে? তাহাদের একমাত্র অভিযোগ—আমি একজন বাস্তুত্যাগীর স্বপক্ষে কাজ করিয়াছি। কিন্তু কোথায় তিনি? সেই মহানুভব মঁসিয়ে মারকুইস এখন কোথায় দেশত্যাগী হইয়া আছেন? ঘুমের মধ্যেও আমি কাঁদি—কোথায় তিনি? ভগবানের নিকট কাতর মিনতি জানাই, তিনি কি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন না?

টেলসন ব্যাঙ্কের মারফৎ সমুদ্রের পরপারে পাঠাই আমার এই কাতর ক্রন্দন, হয়ত একদিন সেই কান্না পৌছিবে আমার মুক্তিদাতাব কানে।

আপনার বংশের সুনাম ও সম্মানের দাবীতে আমি মিনতি করিতেছি, মঁসিয়ে যেখানেই থাকুন আপনি সত্বর আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমার অপরাধ আমি আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আপনি এখন আসিয়া সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করুন।

এই ভীতির রাজ্য হইতে—এই অন্ধকার কারাকক্ষ হইতে আমায় উদ্ধার করুন। আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণিতেছি।

আপনার চিরবিশ্বস্ত

হতভাগ্য গ্যাবেল।'

পত্র পড়ে বিদ্যুৎ-সঞ্চালনের মত ডার্ণে যেন চমকে জেগে উঠল। পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরানো কর্মচারী—যার একমাত্র অপরাধ সে তার ও তার পরিবারের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেনি—আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। তার অনুযোগ-কঠিন মুখখানি ডার্ণে যেন চোখের সামনে ভাসছে দেখতে পেল।

তাদের বংশের দুর্ণাম, অত্যাচারের পরিণাম ভীতি, পিতৃব্যের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ, ধ্বসে-পড়া আভিজাত্যের রাশ আটকে রাখার প্রতি

বিতৃষ্ণা বশতঃ ডার্ণে জীবন-শিল্পে পাকা মুন্সীয়ানা দেখাতে পারেনি। মনে মনে সে তো জানে লুসির প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে এই বিবর্তিত জীবনে বদলে আসার সময় অনেকগুলি ফাঁক রেখে এসেছে পথে। এই নতুন পরিবেশের সুখ-মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। কিন্তু চারি দিকে চলেছে বিরাট ভাঙা-গড়া, অশান্তি আর ঝড়ের সমারোহ। আর ডার্ণে শুধু সময়ের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছে। প্রতিরোধের—প্রতিবাদের কোন ক্ষমতা নেই তার। হারিয়ে ফেলেছে সে ক্ষমতা। ফ্রান্স থেকে অভিজাত সম্প্রদায় আজ নানা অলি-গলি পথে বন্যার জলের মত পালিয়ে আসছে। তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে—ফ্রান্সের বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হচ্ছে তাদের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু।

কিন্তু সে তো কারুর উপর অত্যাচার করেনি। কাউকে জেলে পাঠায়নি—কারুর কাছ থেকে কর আদায় করেনি জোর-জবরদস্তি করে। সে স্বেচ্ছায় নিজের দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে এসেছে। অজ্ঞাত কুলশীল হয়ে মিশে গেছে পৃথিবীর জনারণ্যে—যেখানে নেই কেউ তার সহায়, প্রত্যাশা করেনি সে কারুর আনুকূল্য। সে নিজের চেষ্টায় অর্জন করেছে নিজের প্রতিষ্ঠা—নিজের পরিশ্রমে সংগ্রহ করছে অন্নজল।

গ্যাবেল এতদিন তাদের রস-নিঃশেষিত সম্পত্তির দেখা-শোনা করেছে—যতটুকু দেওয়া সম্ভব দিয়েছে দরিদ্র প্রজাদের হাতে তুলে।

গ্যাবলকে বাঁচাতে তাকে যেতেই হবে প্যারিসে। চুম্বক আকর্ষণের মত দুরতিক্রমণীয় এক আকর্ষণে প্যারিস তাকে হাতছানি দিচ্ছে। মৃত্যুপথযাত্রী নিরপরাধ বন্দীর কাতর আবেদনে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই তার। বংশের সুনাম, ন্যায় ও কর্তব্যের আহ্বানে সে বধির হয়ে থাকতে পারে না।

সংকল্প স্থির করে ফেললে ডার্ণে। প্যারিসে সে যাবেই। সে তো কোন

অন্যায করেনি। তার ভয কি? কিন্তু যাবার আগে লুসিকে বা তার বাবাকে জানতে দেওয়া হবে না কিছু।

উদভ্রান্তের মত ইতস্ততঃ পাযচারী করতে লাগল ডার্ণে। ক্রমশঃ টেলসন ব্যাঙ্কে ফিরে আসার সময হযে এল। লরির কাছে বিদায় নিতে হবে। প্যারিসে পৌছেই প্রথমে দেখা করবে লরির সঙ্গে। কিন্তু এখন তাঁকে সংকল্পের কথা জানতে দেওযা হবে না।

ব্যাঙ্কের দরজায গাড়ী তৈরী। প্রস্তুত হযে এসেছেন লরি।

'চিঠিখানি দিযেছি মালিককে'—বললে ডার্ণে—'লিখিত উত্তর হাতে হাতে দিয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই নে। তবে তার মৌখিক উত্তর জানতে পারেন।'

'এক্ষুণি বল, যদি কোন বিপদ না থাকে।'

'বিপদের কিছু নেই। তবে উত্তরটা দিতে হবে একজন বন্দীকে।'

'বন্দীর নাম?'

'গ্যাবেল'—

'কি বলতে হবে হতভাগ্যকে?'

'বলতে হবে মালিক তার চিঠি পেযেছে এবং আসবে।'

'কখন আসবে, দিন-ক্ষণ কিছু বলেছে?'

'আগামী কাল রাত্রে সে ফ্রান্সে যাত্রা করবে।'

'অন্য কারুর নাম বলেছে?'

'না।'

লরিকে পোষাক পরতে সাহায্য করলে ডার্ণে। ব্যাঙ্কের নিরাপদ পরিবেশ পরিত্যাগ করে তারা ছুটিতে কুযাশা-ঢাকা ফ্লীট ষ্ট্রীটে পড়ল।

'লুসি আর তার মেয়েকে আমার ভালবাসা দিও। যত দিন না ফিরি দেখো তাদের।'

ডার্ণে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। কিন্তু মুখের হাসিতে কি মনের কপটতা ঢাকা পড়ে? গাড়ী ছুটে চলল বেগে।

১৪ই আগষ্ট গভীর রাত পর্যন্ত জেগে দু'খানা চিঠি লিখল ডার্ণে। একখানি লুসিকে—প্যারিসে যাওয়ার কর্তব্যের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করে। সেখানে তার বিপদের কোনই সম্ভাবনা নেই, এ কথাও উল্লেখ করতে ভুললে না। আর একখানি চিঠি লিখল সে ডাঃ ম্যানেটকে। স্ত্রী ও কন্যার ভার তাঁর ওপর সে অর্পণ করল সেই চিঠিতে। দু'জনকেই লিখল, প্যারিসে পৌঁছেই খবর দেবে সে।

বিদায়ের দিনটি অতি দুর্বিষহ হয়ে উঠল ডার্ণের পক্ষে। আসল উদ্দেশ্যটি সংগোপন রাখতে হবে লুসির কাছ থেকে। ঘুণাক্ষরেও যেন লুসির মনে কোন সন্দেহের রেখাপাত না করে।

দিন কেটে গেল দ্রুত-পায়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে লুসিকে গভীর আবেগে আলিঙ্গন করে ডার্ণে কুয়াশা-ঢাকা রাস্তায় নেমে পড়ল।

একটা অদৃশ্য শক্তি অমোঘ আকর্ষণে তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে। এক জন বিশ্বস্ত চাকরের হাতে চিঠি দু'খানি দিয়ে এসেছে। মাঝ-রাত পেরোলে দেবে। নিরপরাধ বন্দীর আকুল ক্রন্দন কানে বাজছে ডার্ণের। সে ক্রন্দনে বধির থাকতে পারে না সে। জীবনের প্রিয়তম যা কিছু সব পিছনে ফেলে চুম্বকাকর্ষণে ছুটে চলেছে সে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

[তৃতীয় পর্যায়]

১

প্যারিসেব পথে বিড়ম্বনার শেষ ছিল না সে বছরে। দেশ আলো করে রাজা তখনও ছিলেন বটে, কিন্তু পথঘাটের অসুবিধাই শুধু নয়—দিন বদলের অন্য ঝুঁকিও বড়ো কম ছিল না। সহর-গাঁয়ে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গাদা বন্দুক নিয়ে বিপ্লবী ফৌজের ছোট ছোট দল টহল দিত, আসা-যাওয়ার পথে লোকের ওপর নজর রাখত। সীমান্ত ডিঙিয়ে আসতে-যেতে হলে পথিককে কাগজ-পত্র দেখাতে হত—সনাক্ত হতে হত—জাহাজ জাহাজ কৈফিয়ৎ দিয়েও সন্তুষ্ট কবতে না পারলে বিপ্লবীদেব শাস্তি নিতে হত। বিপ্লবীদেব আইনে ইতিহাসেব নতুন প্রত্যুষে নয়া পত্তনীর বনিযাদ। লোকের মুখে তখন এক আওযাজ—সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু। আমাদের গণতন্ত্র এক-অখণ্ড।

ফ্রান্সের জমিতে কিছু দূর অগ্রসর হতেই ডার্ণের বুঝতে বাকি বইল না যে, এর পর ইংল্যাণ্ডে ফেরার পথ তার পক্ষে শাণিত দুরত্যযা দুর্গম পথ। এই সব প্রহরীদের যারা কর্তা প্যারিসে তাদের কাগজ-পত্র দেখিয়ে তুষ্ট করতে না পারলে তার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কযেক পা অন্তর সে যেন হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে। সর্বত্র সতর্ক সন্দিহান দৃষ্টি, কারা যেন বেড়াজাল দিযে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলছে। এক এক গ্রাম উজিয়ে যাচ্ছে সে, আর পিছনে লোহার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে কারা।

নজরে থেকে থেকে ডার্ণের যেন হাঁফ ধরে যায়। এগিয়ে যাচ্ছে সে

অন্ধ মনে, হঠাৎ দেখলে কারা যেন পিছন পিছন আসছে ছায়ার মত। কতবার তাকে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের তলবে। এক পা এগোতে বিশ পা পেছোতে হচ্ছে।

এমনি একদিন হা-ক্লান্ত হয়ে ডার্নে এক গ্রামের পান্থশালায় বিশ্রাম নিচ্ছিল রাত্রে। এত দূর অবধি গ্যাবেলের চিঠিখানিই তাকে বাঁচিয়ে এসেছে। কিন্তু এই গ্রামে এসে বিপ্লবীদের কথাবার্তা শুনে অবধি তার মনের শান্তি ঘুচে গেল। একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা নিয়েই ঘুমোতে গিয়েছিল ডার্নে।

রাত্রে কাদের পায়ের আওয়াজে, গাদা বন্দুকের শব্দে চকিত হয়ে চোখ তাকাল ডার্নে। দেখলে মাথায় মোটা লাল টুপি, মুখে তামাকের পাইপ দিয়ে তিন জন লোক বন্দুক ঠুকে তার বিছানায় চেপে বসল।

'আমাদের একজন নাগরিকের অধীনে তোমাকে প্যারিসে চালান দেবার হুকুম দিয়েছি আমি।'

'প্যারিসে যাবারই ইচ্ছা আমার। তবে কোন সঙ্গী না হলেও চলবে।'

'সে কি ? তুমি হলে জমিদার—জমিদার নন্দন—তোমার সঙ্গে লোক না দিলে কি হয় ? অবশ্য তার খরচ জমা দিতে হবে আগে।'

ডার্নে শান্ত কণ্ঠে বললে—'তাতে আপত্তি করব না আমি।'

'আমাদের হাতে পড়েছ, তাই বিচারের আশা আছে। নইলে সরাসরি স্বর্গে যেতে। যাক চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নাও।'

দু'জন পাহারাদারের খরচা হিসেবে মোটা টাকা এখানকার ঘাঁটিতে জমা দিতে হল ডার্নেকে। তারা তাকে ভোর তিনটেয় নিয়ে বেরুল। রাতের শিশিরে কুয়াশায় তখনও আকাশ-মাটি ভিজে। একটু পরেই তীরের ফলার মত বৃষ্টি নামল।

সারা দিন বিশ্রাম আর গা-আঁধারি সন্ধ্যে হলেই যাত্রা। সারা রাত

যাওয়া আর ভোর হলেই বিশ্রাম। এমনি করে গ্রামের পর গ্রাম এগিয়ে যেতে লাগল ডার্নে। সঙ্গে দু'জন পাহারাদার থাকায় অস্বস্তি হলেও, নিজের নিরাপত্তার কোন আশঙ্কা ছিল না তার। প্যারিসে গিয়ে একবার পৌঁছলেই তার সমস্ত অস্বস্তি-অশান্তির অবসান ঘটবে। গ্যাবেলকে সে কারামুক্ত করবেই। মনুষ্যত্বের আবেদনে এত দূর সে ছুটে এসেছে, নিজের সামান্য অসুবিধায় কি করে এখন পিছিয়ে যাবে ?

প্রথম সহরেই ডার্নে প্রথম বিভীষিকা দেখলে। দু'জন পাহারাদারের সঙ্গে ঘোড়া বদলের জায়গায় নামতেই এক দল লোক তাকে ঘিরে ফেললে। তাদের মুখ-চোখের দিকে চেয়ে ডার্নের বুঝতে বাকি রইল না যে, তারা কি চায়। 'দেশত্যাগীর খুন চাই।' জনতার চোখে হিংসা, মুখে হত্যার মাদকতা, কণ্ঠে এক আওয়াজ—'খুন চাই, খুন চাই।'

উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচবার আশায় স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডার্নে বললে—'দেশত্যাগী কি বলছেন আপনারা ? দেখছেন না আমি স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছি দেশে।'

হাতের কুড়ুল উঁচিয়ে একটা লোক যেন তেড়ে এল তার দিকে—'দেশত্যাগী। দেশত্যাগী নও শুধু, তুমি হলে ঘৃণ্য জমিদার। তোমায় খুন করব আমরা।'

মারমুখী জনতার আক্রমণ থেকে ডার্নেকে বাঁচালে পোষ্টমাষ্টার। তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে সে সকলকে উদ্দেশ করে বলল—'তোমরা উতলা হচ্ছ কেন ভাই-বন্ধুরা ? আগে প্যারিসে এর বিচার হোক্—তার পর যা হবার তা ত হবেই।'

ডার্নেকে নিয়ে লোকটা ভিতরে গিয়ে গেট বন্ধ করে দিলে। জনতা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গেটের ওপর। কাস্তে হাতুড়ী কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল লোহার দরজায়। কিন্তু তার পর কি জানি কেন সব ঝিমিয়ে গেল। জনতা পাতলা হয়ে এল।

সে রাত্রে সহর ঘুমোলে পাহারাদারদের নিয়ে নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়ল ডার্ণে। এখানে থাকলে তার মৃত্যু অনিবার্য। আর গ্যাবেলকে বাঁচাতে এসে এ ভাবে পথে-বিপথে খুন হতে পারবে না সে।

ঠাণ্ডায় কুয়াশায় পালাতে লাগল ডার্ণে দ'জন সঙ্গী নিয়ে। ভিজে মাটির ওপর দিয়ে, আলের ওপর দিয়ে, ঝোপঝাড় পেরিয়ে, সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে ভোরের আলোর সঙ্গে প্যারিসের গেটে এসে পৌছল ডার্ণে।

গেটে সশস্ত্র সান্ত্রী। তাদের দেখেই এক দল লোক এসে বললে—'কই, কয়েদীর কাগজ-পত্তর দেখি।'

'কয়েদী?'—অবাক হল ডার্ণে। 'কয়েদী আবার কে? আমি ফরাসী নাগরিক। দেশের এই অরাজক অবস্থায় পথের বিপদ বুঝে দু'জন পাহারাদার নিয়ে এসেছি সঙ্গে। এদের খরচ-পত্তর অবধি দিয়েছি। আমি কি করে দেশত্যাগী হলাম?'

কিন্তু সে কথার জবাব দিল না কেউ। প্রহরীর হাত থেকে ডার্ণের কাগজপত্র নিয়ে লোকটা রক্ষীঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কতক্ষণ পরে ডার্ণের ডাক পড়ল। ঘরের মধ্যে একজন তাকে দেখিয়ে বললে—'কমরেড ডুফর্জ, দেখ তো এই লোকটাই ডার্ণে কি না?'

'হ্যাঁ—এই ত।'

'তোমার বয়স কত?'

'সাঁয়ত্রিশ হবে।'

'বিবাহিত?'

'হ্যাঁ'—

'কোথায় বিয়ে হয়েছিল?'

'ইংল্যাণ্ডে।'

'তা ত বটেই। বৌ কোথায় ?'

'সে ইংল্যাণ্ডে আছে।'

'বেশ, বেশ। লা ফোর্স জেলে চালান দাও কয়েদীকে।'

'জেলে কেন ?'

একের পর এক বিস্ময়ে ডার্নে যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। বললে—'জেলে কেন যাব ? আমার অপরাধ কি ? কি আইনে আমায় তোমরা জেলে পাঠাচ্ছ ?'

রূঢ় কণ্ঠের জবাব পেলে ডার্নে—'আইন ? তুমি চলে যাবার পর এ দেশে নূতন আইন হয়েছে। অপরাধেরও মানে পালটেছে।'

'আমি তোমাদের মিনতি করছি'—বললে ডার্নে—'আমি শপথ করে বলছি যে, আপন ইচ্ছাতেই আমি ফ্রান্সে এসেছি। আমাদের গ্রামের একজন লোক বড় বিপন্ন হয়ে আমায় চিঠি লিখেছিল—সেই চিঠি রয়েছে পড়ে দেখ। কিন্তু আমায় তোমরা দেরী করিয়ে দিও না মিছিমিছি—তাকে আমায় উদ্ধার করতেই হবে। সে অধিকারটুকু দাও আমায় ?'

'অধিকার ? দেশত্যাগীর আবার অধিকার কি ? যাও।'

ড্যফর্জের অনুসরণ করল ডার্নে। রক্ষী-গৃহের বাইরে এসে প্যারিসের পথে পা দিয়ে ড্যফর্জ নীচু-গলায় বললে—'ডাক্তার ম্যানেটের মেয়েকে তবে আপনিই বিয়ে করেছেন ?'

চকিত হয়ে মুখ তুললে ডার্নে। অবাক কণ্ঠে সায় দিলে।

'আমার নাম ড্যফর্জ। প্যারিসে আমার মদের দোকান আছে। হয়ত বা আমার নাম আপনার শোনা থাকতে পারে।'

'শুনেছি বই কি। আপনার বাড়ীতেই আমার স্ত্রী তার বাবাকে ফিরে পেয়েছিল।'

'স্ত্রী' এই কথাটিতে কি ছিল, ড্যফর্জ অনিশ্চিত অধীর কণ্ঠে বললে—'কিন্তু এখন এ ভাবে কেন ফিরে এলেন ফ্রান্সে ?'

'এই ত বললাম। গ্যাবেলকে উদ্ধার করতেই হবে আমায়। সে আমাদের অনেক উপকার করেছে—সে বড়ো ভাল। কিন্তু আমার কথা বুঝি সত্যি মনে হল না?'

'সত্যি হয়ত, কিন্তু আপনার পক্ষে বড় মর্মান্তিক সত্যি।'

'আমি নিজে কিছু বুঝতে পারছি না'—নিমজ্জমান ডার্নে আলাপের সূত্র ছাড়তে চাইলে না। বললে—'এবার এসে যা দেখছি এ সব আমার কল্পনার অতীত। যেন একটা ঘূর্ণিতে পড়ে আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আপনি আমার পরিচিত—আপনি আমায় সাহায্য করুন।'

'আমার দ্বারা কোন উপকার হবে না'—ড্যফর্জ মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। লোকটির কপালের ক'টি কুঞ্চন-রেখাই শুধু চোখে পড়ল ডার্নের।

তবু মিনতি-ভরা স্বরে বললে সে—'আর একটি অনুনয়। টেলসন ব্যাঙ্কের কর্মচারী মিঃ লরি এসেছেন এখানকার শাখা-অফিসে। তাঁকে আমার বড়ো প্রয়োজন। তাঁকে আপনি এই খবরটুকু পৌঁছে দেবেন যে, চার্লস ডার্নে বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হয়ে লা ফোর্স জেলে আটক আছে। শুধু এই খবরটুকু তাঁকে পৌঁছে দেবেন। কথা দিন, দেবেন?'

'দোবো'—বলে ড্যফর্জ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বললে—'দেশের সেবক আমরা। বিপ্লবের সৈনিক। আপনাদের বিরুদ্ধেই আমাদের জেহাদ। আপনার কোন উপকার আমার দ্বারা হবে না?'

আর কোন অনুনয় করা মিথ্যে জেনে নিঃশব্দে ড্যফর্জের অনুসরণ করতে লাগল ডার্নে।

আশ্চর্য লাগে যে এই দল দল বন্দীদের সম্বন্ধে লোকের যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলেরাও নীরবে তাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ময়লা জামা-কাপড় পরে চাষী-মজুররা ক্ষেত-খামার কল-কারখানায় যায়, এ দৃশ্য দেখা যেমন লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে—সুসজ্জিত ভদ্রলোকেরা

আজকাল দলে দলে জেলে যাচ্ছে, ফাঁসীতে ঝুলছে,—সেও যেন লোকের চোখসওয়া হয়ে গেছে। তাই নতুনত্বের কোন কৌতূহল নেই লোকের চোখে।

একটা সরু গলি বরাবর আসতেই ডার্ণের কানে গেল বক্তৃতার আওয়াজ। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে এক জন লোক উত্তেজিত কণ্ঠে রাজার বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিল। রাজা ও রাজ-পরিবারের লোকেরা এত কাল ধরে দেশের লোকের কি সর্বনাশ করে এসেছে তারই হিসেব দাখিল করছিল লোকটা। বিষাক্ত তার ভাষা—কর্কশ ভঙ্গী। এই প্রথম জানতে পারলে ডার্ণে যে, রাজা বন্দী হয়েছেন বিপ্লবীদের হাতে। সমস্ত বৈদেশিক রাজপুরুষেরা ফ্রান্স ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গেছেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় বিপদের এতখানি গুরুত্ব বোঝেনি ডার্ণে। এত দিনে বিপদের সম্বন্ধে সচেতন হল সে। বুঝল যে, ক্রমাগত বিপদের জালে সে জড়িয়ে পড়ছে—তলিয়ে যাচ্ছে বিপদ-সমুদ্রের গভীরতায়, যেখান থেকে মুক্তির আশা অস্পষ্ট। এমন জানলে কখনই সে এই ভাবে বিপদ বরণ করতে আসত না। স্ত্রী-কন্যার সুখ-নীড় থেকে ছিটকে এসে এমনি করে প্রাণ বিপন্ন করত না খুনীদের হাতে। গণদেবতার রোষ যে এমন নৃশংস ভয়াল, তা কি ভাবতে পেরেছিল সে এই ক'টা দিন আগে?

কিন্তু এক দিনে কতটুকুই বা জানতে পারলে ডার্ণে? দেখতে পেলে এখানকার নরক-লীলা? রক্তস্রোত আর মৃতদেহের স্তূপ তখনো ত চোখে পড়েনি তার—কানে আসেনি মৃত্যুর আর্তনাদ আর জল্লাদী জনতার উল্লাস।

আতঙ্কের কালো ছায়ায় আবৃত তার চেতনার আকাশে সবই যেন মায়াচ্ছন্ন। শুধু এই অনুভূতিটুকু স্পষ্ট যে, স্ত্রী-কন্যার কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হল। নিশ্চিত নিরাপদ গার্হস্থ্য জীবনের দিন-রাত্রি ফুরিয়ে

গেল তার। তার পর? সে কথা ভাবার আগেই গুফর্জ তাকে লা ফোর্স জেলের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিল।

এক জন প্রহরীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে গুফর্জ বললে—'মঁসিয়েদের আর এক জন।'

'বটে! ওদের আরো কত আছে বাবা?'

প্রহরীদের পাহারা, কত অন্ধকার ঘর-বারান্দা পেরিয়ে, কত সিঁড়ি ভেঙে ডার্নে অবশেষে একটা বড় হলঘরে এসে দাঁড়াল। সেখানে একগাদা নারী-পুরুষকে বস্তার মত বন্দী করে রেখেছে প্রহরীরা। ডার্নে আসতেই সবাই একসঙ্গে উঠে তাকে অভ্যর্থনা করলে। আর সে অভ্যর্থনারই বা কত রূপ কত ভঙ্গী! অন্ধকার চাপা নীচু ছাতের ঘরে দুর্গন্ধ আর ময়লার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই সব বিচিত্র বিবিধ নারী-পুরুষের সাদর আপ্যায়নে ডার্নে যেন মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হল। তবে কি জীবিত-লোক থেকে সে এসে পড়ল মৃত্যুলোকে? এরা কি সব প্রেত? সংসারের যত রূপ, যত দর্প, যত হাসি আনন্দ আভিজাত্য—যৌবন-জরার যত ধারা সব যেন এই প্রেতলোকে সমবেত হয়েছে। এরা কি সব জীবন্ত মানুষ, ভাবলে ডার্নে। জীবন্ত যদি তবে এদের চোখে এমন মৃতের চাউনি কেন? মরার আগেই তবে কি এরা মরে নিশ্চিন্ত হয়েছে? ভাবতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতিহীন হয়ে গেল ডার্নের।

এলিয়ে এল সর্বাঙ্গ। তবে কি এই ক'দিনের নিরন্তর আতঙ্কে আতঙ্কে তার মনই দুর্বল হয়ে পড়েছে? স্বপ্ন দেখছে নাকি তার জ্বরগ্রস্ত মন? এ মায়া না মতিভ্রম, কিছুই স্থির নির্ধারণ করতে পারলে না ডার্নে।

প্রহরী যখন তার গায়ে হাত দিল, সম্বিত ফিরে এল ডার্নের।

'চল'—

'কোথায়?'

প্রহরী তাকে নিয়ে গেল লোহার গরাদ-দেওয়া নির্জন সেলে।

'এখানে আমি একলা থাকব নাকি ?'

'তা জানি না।'

'আমি কাগজ-কলম কিনতে পারব ?'

'তাও জানি না। তবে আপাততঃ খাবার কিনে খেতে পার। লোক আসবে সময় মত—তাকে জিজ্ঞেসা করলেই সব জানতে পারবে।'

প্রহরী চলে যাবার পর একলা ঘরে পায়চারী করতে লাগল ডার্ণে। 'আর কি ? ফুরিয়ে গেলাম আমি।' পায়ের নীচে পাতা ময়লা দুর্গন্ধ মাদুরে পোকা গিস্‌গিস্ করছে। দেখে আতঙ্কিত হয়ে ভাবলে ডার্ণে—'এরা বোধ হয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। মরা অবধি কি আর ওদের তর সইবে ?'

২

প্যারিসে যে বিরাট প্রাসাদের একাংশে টেলসন ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস, তার সামনে দেয়াল-ঘেরা মস্ত উঠোন। উঠোন পেরিয়ে লোহার শক্ত গেট। বাড়ীর যিনি মালিক ছিলেন, বিপ্লব সুরু হবার দিন থেকেই তিনি পলাতক। এক দিন যাঁর চর্ব্যচোষ্য-ভোজ্য-পানীয়ের ব্যবস্থায় চার জন পাচক-বামুন হিমসিম খেত, তিনি নিজে পাচকের ছদ্মবেশে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে বেঁচেছেন। বনে দাবাগ্নি জ্বলে উঠলে প্রাণভয়ে পশুরা যেমন পালায়, এই সব বড়লোকেরা তেমনি বিপ্লব-বহ্নির ভয়ে কে কোথায় পালিয়েছেন, তার ঠিকানা নেই।

যাবার সময় সবাই টেলসন ব্যাঙ্কে টাকা-জহরৎ গচ্ছিত রেখে গেছেন। কিন্তু যেদিন বিপ্লব শেষ হবে, সেদিন ক'জন আসবে দাবী নিয়ে ?

প্রাণের হিসেব পাওয়া যাবে ক'জনের ? ঘাতকের হাত এড়িয়ে ফাঁসীর দড়ি থেকে পিছলে পড়ে, জনতার আক্রোশ বাঁচিয়ে যে ক'জন এখনো জেলে দুর্গে প্রাণ নিয়ে শুষছে—তাদের হীরে-জহরতে ধূলো জমছে ব্যাঙ্কের গোপন ঘরে। আর তারই হিসেব মিলিযে নিতে এসেছেন লরি এত দূর।

সারা বাড়ী এখন দখল করছে বিপ্লবীরা।

সেদিন রাতের নিরালায আগুনের ধারে বসে সেই সব হতভাগ্যদের কথা চিন্তা করতে করতে নির্ভীক মানুষ্যটিরও সমস্ত শরীর শিহরিত হযে উঠেছিল। কাঁচের জানালা খুলে, শার্সি তুলে একবার উঠোনের রক্তাক্ত খুনী যন্ত্রটার দিকে চোখ পড়তেই ত্রস্তে লরি চোখ ফিরিযে নিলেন। শার্সি-জানালা সশব্দে বন্ধ করে দিযে বসলেন।

উঁচু পাঁচিলের পাহারা ডিঙিযে নিশীথ রাতের কলরব ভেসে আসছে পথ থেকে। সে একটানা একঘেযেমির মধ্যে এক-এক বাব প্রেতকণ্ঠের অমর্ত আর্তনাদ উঠছে বুক কাঁপিয়ে, যেন মৃত্তিকার বুকফাটা কান্না কারা পৌঁছে দিতে চাইছে আকাশে।

'ভগবানকে ধন্যবাদ। আজকের এই ভীষণ বাতে আমার কোন প্রিযজন নেই এ সহরে। এ বিপদের দিনে ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন।'

একটু পরেই গেটের ঘণ্টা সশব্দে বেজে উঠতেই চকিত হযে লরি ভাবলেন—'ঐ আবার ওরা ফিরে এল।'

কান পেতে অনেকক্ষণ শুনলেন। কিন্তু উঠোন থেকে জনতার কোন উল্লাস-ধ্বনি এল না। শুধু একবার গেটেব ভারী দরজা খোলার শব্দ হল—তার পর সব নিঝ্ঝুম, চুপচাপ। •

একটা অস্বস্তিকর উত্তেজনা পেয়ে বসল যেন। ব্যাঙ্কের প্রহরীরা সবাই বিশ্বস্ত। চারি দিকেই তাদের সশস্ত্র সতর্ক পাহারা। ভযের

কিছু নেই। তবু এই নির্বান্ধব দেশে নিজের জীবনের চেয়ে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার কথাটাই শতবার করে লরির মনকে আলোড়িত করতে লাগল।

উঠে প্রহরীদের কাছে যাবেন কিনা ভাবছেন এমন সময় তারই দরজা খুলে অচম্বিতে যে দু'জন নর-নারী ঘরে প্রবেশ করল, তাদের দেখে লরির বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ডাক্তার ম্যানেটের সঙ্গে এসেছে লুসি। তার সারা মুখ-চোখে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতা। হাত বাড়িয়ে আশ্রয়-ভিক্ষা করে যেন ছুটে এল লুসি। তাদের দেখে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লরি বললে—'তোমরা এখানে কেন? এখানে কি?'

বিপর্যস্ত বিবর্ণ মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতেই যেন জীবন-বিন্দু স্থির হয়ে আছে। আকুল কণ্ঠে কেঁদে বললে সে—'তিনি কোথায়?'

'কার কথা বলছ তুমি? কি হয়েছে চার্লসের?'

'সে এখানে এসেছে।'

'প্যারিসে?'

'তিন চার—ক'দিন হয়েছে ঠিক মনে নেই—কিছুই মনে করতে পারছি না আমি। কার চিঠি পেয়ে কাকে যেন উদ্ধার করতে তিনি আসছিলেন প্যারিসে। আমরা কিছুই জানি না। সীমান্তেই নাকি তিনি ধরা পড়েছেন। ওরা তাকে জেলে আটকে রেখেছে।'

বৃদ্ধের অস্ফুট আর্তনাদ শুনলেন লরি আর সেই মুহূর্তে শুনলেন উঠোনে উন্মত্ত জনতার কল-গর্জন এসে পড়ল।

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক্তার ম্যানেট প্রশ্ন করলেন—'বাইবে ও কিসের আওয়াজ?'

'ওদিকে তাকাবেন না ডাক্তার ম্যানেট। দোহাই আপনার। বাইরে মুখ বার করবেন না।'

এতক্ষণে ডাক্তার একবার ভয়হীন প্রসন্ন হাসি হাসলেন। তার পর পর্দার দড়িতে হাত রেখে বললেন—'ভয় নেই বন্ধু। প্যারিসের সঙ্গে আমার বড়ো মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, জান। আর প্যারিসই বা বলি কেন, সারা ফ্রান্সে এমন কোন বিপ্লবী আজ নেই যে আমায় ব্যাষ্টিল দুর্গের বন্দী জেনে আমার দেহ স্পর্শ করবে। যদি স্পর্শ করেও, সে শুধু আমাকে বুকে করে জয়োল্লাস করবার জন্যেই করবে। যে নির্যাতন এক দিন সয়েছি, সেই আমার রক্ষা-কবচ। তার জোরেই সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি। জানতে পেরেছি আমাদের চার্লসের খবর—আসতে পেরেছি এখানে। চার্লসকে আমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবই। সেই কথাই আমি বলছিলাম লুসিকে। কিন্তু তুমি বলো এ গোলমাল কিসের?'

'কথা শুনুন ডাক্তার। দয়া করে দেখা দেবেন না। না লুসি, তুমিও বাইরে মুখ বের করো না।' লুসিকে সাপটে নিজের কাছে টেনে নিলেন লরি। বললেন—'অত ভয়ের কি আছে? চার্লসের কোন অমঙ্গলের কথা আমি শুনিনি। ও যে এই সময়ে প্যারিসে এসেছে এ কথা, ঘুণাক্ষরেও আমি জানি না। কোন্ জেলে আছে সে?'

'লা ফোর্সে।'

'শান্ত হও লুসি—এ আত্মহারা হবার সময় নয়। আমি যেমনটি বলব সেই রকম করো—দেখবে চার্লসের কোন অমঙ্গল হবে না। আজ রাত্রে আর কিছু করবার নেই। এখন বাইরে যাওয়া অসম্ভব। এসো তোমায় আমি পিছনের ঘরে লুকিয়ে রাখি। তোমার বাবার সঙ্গে একটু নিরিবিলি আলোচনা করতে দাও আমায়। জীবন-মৃত্যুর সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এখন অধীর হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

লুসিকে পাশের ঘরে ঠেলে দিয়ে দরজায় চাবী দিলেন লরি। তার

পর ডাক্তারের কাছে এসে জানলা খুলে দিলেন। পর্দা সরিয়ে দু'জনে তাকালেন উঠোনের দিকে।

দেখলেন সেই রক্ত-পিপাসিত নারী-পুরুষদের দিকে। এই উঠোনে বিপ্লবীরা বসিয়েছে এক শাণ দেওয়ার যন্ত্র। নিরিবিলিতে অস্ত্র শাণিত করে নিয়ে এরা ছুটে যাচ্ছে হত্যার নেশায়। আবার এক দল আসছে। নিরন্তর এই রক্ত-মিছিলের তরঙ্গ দোল খাচ্ছে এই উঠোনে। রক্ত-মাখা অস্ত্র দিয়ে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে এক বীভৎস নারকীয় জীবন যেন পেয়ে বসেছে প্যারিসকে।

এক ঝলকে দেখে দু'জনে সরে এলেন জানলার কাছে থেকে। ডাক্তার একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন লরির দিকে।

'এরা জেলের বন্দীদের হত্যা করছে। আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তবে আর দেরী করবেন না। এদের দেখা দিন—নিজের পরিচয় দিন। ওদের বলুন এখুনি আপনাকে লা ফোর্স জেলে নিয়ে যেতে। কত দেরী হয়ে গেছে জানি না—কি সর্বনাশ হল বুঝতে পারছি না। কিন্তু আর একটি মুহূর্ত নষ্ট হতে দেবেন না। যা করবার এখুনি করতে হবে।'

ডাক্তার মুহূর্তে লরির হাতে মৃদু চাপ দিলেন। তার পর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। লরি আবার জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন।

মানুষটির বয়সে পলিত-কেশে আত্মবিশ্বাসে কি ছিল কেমন করে জানবেন লরি, কিন্তু তিনি দেখলেন সবাই চাপা গুঞ্জনে তাঁর কথা শুনলে। তার পর সেই জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলেন ডাক্তার। রুদ্ধশ্বাস লরি কিসের প্রতীক্ষা করছিলেন—এমন সময় তার কানে এল—'বিপ্লবী ম্যানেট জিন্দাবাদ! লা ফোর্সের বন্দীকে বাঁচাতে হবে। পথ দাও। পথ ছেড়ে দাঁড়াও।'

লরি শুনলেন উদ্বেলিত সহস্র কণ্ঠে জিগীরের প্রতিধ্বনি। ঘটনার

এই আকস্মিক উত্তেজনায় কম্পিত বক্ষে লরি আবার জানলা বন্ধ করে দিলেন। পর্দা টেনে দিয়ে ছুটে গেলেন লুসির ঘরে। লুসিকে বললেন কেমন করে তার বাবা জনতার সাহায্য নিযে চার্লসকে খুঁজে বের করতে গেলেন।

এতক্ষণে লরি দেখলেন যে, লুসির সঙ্গে মিস্ প্রস ও তার কন্যাও এসেছে। কিন্তু লুসি তার কথা শুনল কিনা তা বুঝতে পারলেন না লরি। স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় মুহ্যমান নারী তাঁর পায়ের কাছে বসে রইল। রাত যেন জগদ্দল পাথরের মত বুকের উপর চেপে বসেছে।

শিশুটিকে বিছানায় শুইযে দিয়ে তার পাশে বসে থাকতে থাকতে কখন মিস্ প্রস নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এ রাত কত দীর্ঘ মনে হচ্ছে। অধীর প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নেই। নিস্তব্ধ রাত্রির পটভূমিকায লুসির চাপা কান্নার অর্ধস্ফুট গোঙানি শুনতে লাগলেন লরি বসে বসে।

আরো দু'বার গেটের ঘণ্টা বেজেছিল। উত্তেজিত জনতার কলস্বর ছাপিযে শাণ-কলের ঘড়-ঘড় শব্দও শোনা গেল কতক্ষণ। লুসি ভয-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেসা করলে—'ও কিসের শব্দ ?'

এক সময় দিগন্তে দিনের আলো ফুটে উঠতে লাগল। লরি আস্তে আস্তে লুসির কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সাবধানে জানলা খুলে বাইরে তাকালেন।

তাকিয়ে দেখলেন বাইরে। দেখলেন সূর্যের আলোয় পৃথিবীও রাঙা হয়ে গিয়েছে। উঠানের ঐ যন্ত্রটির সর্বাঙ্গেও দেখলেন রক্তের দাগ। কিন্তু এ লাল সূর্যের আলোয় নয়। কোন দিন শেষেই এ লাল মুছে যাবে না।

৩

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে কাজ-কর্ম সুরু হল। লরি মনে মনে ভাবলেন যে চার্লস একজন দেশত্যাগী অভিজাত—তার স্ত্রী-কন্যাকে ব্যাঙ্কের আশ্রয়ে রেখে ব্যাঙ্ককে বিপদগ্রস্ত করা কোন মতেই সমীচীন হবে না। সে অধিকার নেই তাঁর। লুসি ও তাব মেয়ের জন্য তিনি নিজের নিরাপত্তা, ধনসম্পদ—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে একটুও দ্বিধা করবেন না কিন্তু যে বিরাট দাযিত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত, সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করাব চিন্তা অসম্ভব। ব্যাঙ্কের নিরাপত্তাব ব্যাপাবে কোন দুর্বলতা তিনি মনে স্থান দিতে পারেন না।

প্রথমেই মদেব দোকানের মালিক ভ্যফর্জের কথা তাঁর মনে পডল। তার মদের দোকানটি খুঁজে বের করতে পারলে হত। তার পব তাব সাহায্যে একটি নিরাপদ বন্দর। কিন্তু তখনি মনে পড়ল সে দোকান ত এখন বিপ্লবের ঘাঁটি। হযত এই বিপ্লবের সঙ্গে সক্রিয ভাবে জড়িত ভ্যফর্জ।

দুপুব গড়িযে গেল। ডাক্তারের দেখা নেই। লুসির সঙ্গে কথাবার্তায লরি জানতে পারলেন যে, ডাক্তার ব্যাঙ্কের কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া নেওযার কথা বলেছিলেন। লরির কাছে কথাটা ভাল লাগল। তিনি তখনই একটা নিভৃত নিরাপদ আস্তানাব খোঁজ করতে বেরোলেন। পেয়েও গেলেন সুবিধা মত একটি। পাড়াটি নির্জন, পরিত্যক্ত। বহু লোক ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিযেছে সে-মহল্লা থেকে।

লুসি, তার মেয়ে ও মিস্ প্রসকে তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ীতে পাচার করলেন লরি। বিশ্বস্ত জেরিকে রেখে এলেন তাদের পাহারায।

সারা দিনের কাজ-কর্মের মধ্যে নানা চিন্তা-আশঙ্কার ক্লান্তিতে এক সময় বেলা গড়িয়ে গেল। ব্যাঙ্ক বন্ধ হল। একাকী নিজের ঘরে ফিরে এসে বসলেন লরি। কত কি ভাবতে ভাবতে কখন যেন অন্যমনস্ক হয়েছিলেন এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দে চকিত হয়ে উঠলেন লরি। সঙ্গে সঙ্গেই একটি মনুষ্য-মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে লোকটি তাঁকে নাম ধরে ডাকল।

'আপনি আমাকে চেনেন?'

লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি। বলিষ্ঠ গড়ন। মাথায় কাল কোঁকড়ান চুল।

'আপনি আমাকে চেনেন?'—পাল্টা প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে।'

'হয়ত আমার মদের দোকানে।'

'আপনি কি ডাক্তার ম্যানেটের কাছ থেকে আসছেন?'—লরি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, তার কাছে থেকেই আসছি।'

'তিনি কিছু বলেছেন?'

ডিফর্জ লরির কম্পিত হস্তে এক টুকরো কাগজ দিলেন। ডাক্তারের নিজের হাতে লেখা চিঠি পড়তে লাগলেন লরি।

'চার্লস নিরাপদে আছে। আমি এখনও এ স্থান ত্যাগ করতে পারছি না। লুসির জন্য চার্লসের লেখা দু'-এক লাইন পাঠাচ্ছি। পত্রবাহককে লুসির সঙ্গে দেখা করতে দিও।'

লা ফোর্স জেল থেকে লেখা।

চিঠি পড়ে লরি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। যেন একটা ভারী বোঝ নেমে গেল বুক থেকে।

'তাঁর স্ত্রী যেখানে আছেন সেখানে আমায় নিয়ে চলুন।'

'চলুন।'

হ্যফর্জের কথাবার্তা বিরস-রূঢ় লাগল লরির কানে। তবু টুপি পরে তাকে নিয়ে উঠোনে এলেন লরি। দেখলেন উঠোনে দু'জন স্ত্রীলোক। তাদের মধ্যে একজনের হাতে বোনার কাঠি। দেখেই মনে পড়ল লরির।

'মাদাম হ্যফর্জ নিশ্চয়?'—সতের বছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন আজও ঠিক সেই একই মূর্তিতে দেখতে পেলেন মাদামকে।

'উনিও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

'হ্যাঁ! পরে দেখলে যাতে তাঁদের চিনতে পারে। তাঁদের সাবধানের জন্যেই এটা প্রয়োজন?'

লরিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

নানা অলিগলি অতিক্রম করে তাঁরা লুসির বাসায় এসে পড়লেন। লুসি একা বসে কাঁদছিল। স্বামীর খবর পাওয়া গেছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে লরির হাত জড়িয়ে ধরল। তার পর কম্পিত বুকে শতবার পড়লে সেই চিঠি ঃ

'প্রিয়তম,

সাহস হারিয়ো না। আমি ভালই আছি। এখানকার লোক-জনদের উপর তোমার বাবার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। চিঠির উত্তর দিতে হবে না। খুকুকে চুমু দিও।'

চিঠি পড়ে মাদামের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় বিগলিত হল। মাদামের দুটি হাত নিয়ে গভীর প্রীতিতে চুম্বন করলে অশ্রু-সজল লুসি। কিন্তু মাদাম ঝাপট দিয়ে হাত সরিয়ে নিতেই ভয়ার্ত চোখ তুলে লুসি তাকালে তার দিকে। দুটি মর্মভেদী দৃষ্টির শীতলতা সূচিবিদ্ধ করতে লাগল লুসিকে।

এই বিশ্রী পরিস্থিতিকে একটু হাল্কা করার জন্য লরি আশ্বাস দিয়ে

বললেন—'ভয় কি লুসি? পথে-ঘাটে এখন নির্বিচারে ভয়ানক খুন-জখম চলেছে। মাদামের যাঁরা প্রিয়জন তাদের তিনি ভাল করে চিনে রাখতে চান। আমি ঠিক বলিনি মঁসিয়ে দ্যফর্জ?'

বলতে বলতে লরি নিজেই মাঝপথে হোঁচট খেয়ে থেমে গেলেন। ঐ তিন জনের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজেরই যেন সাহস হল না।

দ্যফর্জ মুখ আঁধার করে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

লরি আবার বললেন—'তোমার মেয়েকে নিয়ে এস লুসি। মিস প্রসকেও আসতে বল। সবার পরিচয় করিয়ে দাও। উনি আবার ফরাসী ভাষা জানেন না।'

লুসির কচি মেয়েকে নিয়ে মিস প্রস আসতেই মাদাম দ্যফর্জ সেলাই বন্ধ করে এই প্রথম লুসির সঙ্গে কথা বললেন—'এই বুঝি মেয়ে?' বোনাব কাঠিটি মেয়ের দিকে বাড়িয়ে দেখালে মাদাম—যেন নিয়তির তর্জনী নির্দেশ করলে।

'হ্যাঁ, আমাদের এই একটিই।' বলতে কান্নায গলা বুজে এল লুসির। অজানা আশঙ্কায ভীত ত্রস্ত নীচু হয়ে মেয়েকে বুকে চেপে আড়াল করে ধরল মা।

'যথেষ্ট হয়েছে'—স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে মাদাম—'দেখা হল—এবার চল।'

মাদাম চলে যাবার উপক্রম করতেই লুসি মাদামের পোষাক চেপে ধরে মিনতির সুরে বললে—'কথা দিন, আমার স্বামীর কোন অমঙ্গল হবে না। কথা দিন, তার কোন অনিষ্ট করবেন না। আবার যেন তার দেখা পাই।'

মাদাম তাকে থামিয়ে দিয়ে কটু কণ্ঠে বললে—'তোমার স্বামীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য এখানে আসিনি আমরা। ডাক্তার ম্যানেটের মেয়েকে দেখার জন্যেই এসেছিলাম।'

'তবে আমার মুখ চেয়ে আমার স্বামীকে ক্ষমা করুন। তাঁর সন্তানের মুখ চেয়ে তাঁকে বাঁচান। এই আমার মেয়ে হাত জোড় করে তার বাপের হয়ে মিনতি করছে। আপনাকেই আমাদেয় ভয় অন্য কাউকে নয়।'

'তোমার স্বামী কি যেন লিখেছেন চিঠিতে? তোমার বাবার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তিনি তাকে বাঁচাবেন, তাই না?'

এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল লুসি—'দয়া করুন আপনি। প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। দয়া করুন আমায়। আপনিও নারী—আপনি আমার ব্যথা বুঝতে পারবেন।'

কিন্তু বেদনা-বিদ্ধ রমণীর কাতরতার প্রত্যুত্তরে মাদাম অবিচলিত শুষ্ক কণ্ঠে সঙ্গিনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—'মা বৌ আমরাও কম দেখিনি, যাদের স্বামীরা বহু কাল ধরে জেলে পচেছে। যারা দুঃখ-দারিদ্র্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যাচারে-অপমানে নির্যাতিত হয়েছে দিনের পর দিন, যাদের কপালে চিরদিন মিলেছে শুধু বঞ্চিতের অবহেলা, অনাহার, অসম্মান।'

লুসির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—'তুমিই বিচার করে বল না। এত জনের বদলে এক জনের দুঃখে অত বিচলিত হলে কি আমাদের চলে?'

তিন জনে নিঃশব্দে ঘর থেকে বিদায় নিলে লরি হাত ধরে তুলে নিলেন লুসিকে। বললেন—'ধৈর্য ধর লুসি। এখন চাই শুধু সাহস। অনেকের তুলনায় ভাগ্য এখনও আমাদের প্রতি প্রসন্ন। এখন ভয়ে মুষড়ে পড়লে চলবে না।'

৪

ডাক্তার ফিরে এলেন পুরো চার দিন পরে। এ ক'দিনে এগারোশ' বন্দী নারী-পুরুষ হত হয়েছে বিপ্লবী জনতার বিচারে। দিন-রাত্রি অবিরাম চলেছে মরণ-তাণ্ডব, দেখে এলেন ডাক্তার। কিন্তু সে সব কথা লুসির কাছে কিছুমাত্র ভাঙলেন না তিনি। লুসি শুধু জানলে যে বন্দি-হত্যা হচ্ছে বটে কিন্তু তার ডার্ণে আজও অক্ষত আছে।

লরিকে শুধু গোপনে বললেন সে কথা। ড্যফর্জ বিপ্লবীদের বিচার-সভায় তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আঠার বছর তিনি নিজে রাজ-কারাগারে কাটিয়েছেন সে কথা জেনে বিপ্লবীরা তাঁকে অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে গ্রহণ করেছে নিজেদের দলে। সেই জোরে তিনি চার্লস ডার্ণেকে প্রায় মুক্ত করেছিলেন কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে, আজও যার রহস্য পরিষ্কার হয়নি তাঁর কাছে, তাকে সদ্য মুক্ত করা সম্ভব হল না বিচার-সভার রায়ে। তবে এটুকু আশ্বাস তিনি আদায় করে তবে জেল থেকে এসেছেন যে, যত দিন না মুক্তি পাবে তত দিন ডার্ণে জেলেই থাকবে। তার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখবে বিপ্লবী আদালত।

যে বীভৎস দৃশ্য সব দেখে এলেন ডাক্তার, তার ফলে আর একবার যদি তাঁর স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, এই ভয়ে লরি অন্তরে অন্তরে পীড়িত হচ্ছিলেন। ডাক্তারের চোখেও বোধ হয় তা ধরা পড়ল। বললেন—'ভয় করবেন না লরি! দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ঈশ্বর আমায় যে শক্তি দিয়েছেন, কোন কারাগারের লৌহ-গরাদ তা আটকাতে পারবে না। একদিন মেয়ে

আমায় বুকে তুলে নিয়ে বাঁচিয়েছিল, আজ তার স্বামীকে সর্বনাশের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে আমি তার হাতে দিয়ে বলব, এই নাও মা, তোমার বুড়ো ছেলের প্রতিদান। ঈশ্বরের কৃপায় আমি তা করতে পারবই লরি।'

ডাক্তারের শান্ত মুখ, দৃঢ় ভঙ্গী আর উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে লরি দেখলেন, দীর্ঘ দিনের রুদ্ধ শক্তি যেন ডাক্তারের বৃদ্ধদেহে নব যৌবনের জোয়ার এনেছে। আর অবিশ্বাসের কারণ রইল না লরির।

বৃদ্ধ বয়সে ম্যানেট আবার প্যারিসে ডাক্তারী করতে সুরু করলেন। ধনী-নির্ধন, বিপ্লবী, রাষ্ট্রদ্রোহী, মুক্ত বন্দী—সমস্ত আহত রোগগ্রস্ত নর-নারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। তাঁর ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় অল্প দিনের মধ্যেই সারা প্যারিসে ডাক্তার ম্যানেটের নামে জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। তিনটি জেলখানারই ডাক্তার হলেন তিনি—বিশেষ করে লা ফোর্স কারাগারে যেখানে তাঁর জামাই ডার্নে বন্দী। সেখানে তাঁর গতিবিধি হয়ে উঠল অবাধ অবারিত। ডার্নের নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ করে ডাক্তার তাঁর কর্তব্য করতে লাগলেন। মেয়েকে তিনি দিনের পর দিন অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা দিতে পারলেন যে তার ডার্নে ভালই আছে। এক দিন সে মুক্তি পেয়ে তার স্ত্রী-কন্যার কাছে ফিরে আসবেই।

কিন্তু এত চেষ্টা তাঁর সার্থক হল না। বিপ্লবীদের বন্ধু ও হিতকামী হয়েও এই পরম প্রিয়জনের মুক্তির কোন উপায় করতে পারলেন না ডাক্তার। বিপ্লবের দুর্বার বন্যায় বার বার তাঁর চেষ্টা ভেসে যেতে লাগল।

বিপ্লবের আর এক নবযুগ এল। রাজার বিচার করলে প্রজারা। গিলোটিনে রাণীর মাথা কাটা পড়ল। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু—এই ঘোষণা নিয়ে গণতন্ত্র সদম্ভে প্রতিষ্ঠা করল নিজেকে। নতরদামের উন্নত শীর্ষে দিন-রাত্রি উড়তে লাগল কৃষ্ণ পতাকা। মাটির কাছাকাছি

থেকে তিন লক্ষ মানুষ যেন একসঙ্গে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল অত্যাচারের বিরুদ্ধে। দীর্ঘকাল ধরে এক দল লোক যে অন্যায়ের বীজ বপন করেছিল ফ্রান্সের দিকে দিকে—ছড়িয়েছিল পাহাড়ে, অরণ্যে, কোমল জমিতে, কঙ্করিত মাটিতে—দক্ষিণের উজ্জ্বল আকাশের নীচে—উত্তরের মেঘল ছায়াবৃত মৃত্তিকায়—তারা সব রক্তবীজের মত অঙ্কুরিত হয়ে পত্রে পল্লবে শাখায় বিশাল হয়ে দেখা দিল। হঠাৎ এক দিন এল মৃত্যুর বন্যা। এল সর্বনাশের ঢল। আকাশ থেকে নামল না—উঠল মাটি বিদীর্ণ করে। আর সেই দুর্যোগময় দিন-রাত্রিতে পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল স্বর্গ।

শান্তি রইল না—ক্ষান্তি রইল না। করুণা-মমতার অবকাশ রইল না। ঝড়ের অন্ধকারে দিন-রাত্রি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। হিসেব রইল না কালের। একদিন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটা গোটা জাতি দেখলে তার রাজার মুণ্ডচ্ছেদ হল। আট মাস কারাগারে থেকে, নিরাভরণ বিধবার বেশে এক দিন তার সুন্দরী রাণীও জনতার পৈশাচিক মত্ততার ভূমিকায় লুণ্ঠিত-শির হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল।

এক দিন পবিত্র ক্রুশ থাকত বুকে-বুকে। কিন্তু ক্রুশ যা দিতে পারেনি —গিলোটিনের ধারাল লোহা তাই পারলে। তাই ক্রুশ ফেলে লোকে সাগ্রহে সানন্দে গিলোটিনের প্রতীক বইতে লাগল আদর করে। গিলোটিন শুধু প্রতীক নয়—গিলোটিনই হল দেবতা!

এই আতঙ্কের রাজ্যে শুধু এক জন মানুষ নিষ্কম্প চিত্তে কাজ করতে লাগলেন। আপন শক্তিতে অসীম বিশ্বাসী মানুষটি যেন সকলের মধ্যে থেকেও রইলেন একাকী। যেন বিষাক্ত ঘূর্ণীর মধ্যে একটি মাত্র অমৃত-বিন্দু। তাঁর কাছে সবাই আপন। তাঁর কাছে সব দুয়ার অবারিত। এমনি করে আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে আড়াল করে রাখলেন তিনি ডার্নেকে পনেরো মাস।

এত মৃত্যু, এত হত্যা! চতুর্দিকের এই নরক-লীলার মধ্যে তবু বিশ্বাস আঁকড়ে রইলেন ডাক্তার। মেয়েকে তিনি যে কথা দিয়েছেন তা তিনি রাখবেনই। ফিরিয়ে এনে দেবেন ডার্নেকে। লুসির মুখে আর একবার হাসি ফোটাবেন।

এমনি করে ডিসেম্বর এল। দক্ষিণের নদীতে মৃতের স্তূপ জমে পচতে লাগল। সারি-বাঁধা বন্দীদের গুলী করে হত্যা করতে লাগল বিপ্লবীরা। গিলোটিনের লোহার ওঠা-পড়ার বিরাম রইল না। নিরবধি রক্তস্নান করতে লাগল মেদিনী। আর দেশ জুড়ে ছিন্নশির অভিজাতদের দেহের উপর উন্মাদের মত নৃত্য করতে লাগল জনতা।

৫

দেখতে দেখতে এক বছর তিন মাস গড়িয়ে গেল। লুসি রোজই শিউরে ভাবে আগামী কাল গিলোটিনে স্বামীব মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। শাণ-বাঁধান পথ প্রতিদিন মৃত্যু-পথযাত্রী বন্দীদের পায়ের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। কত সুন্দরী কিশোরী, কত সুকেশা সুনয়না তরুণী, কত যুবা, প্রৌঢ় বৃদ্ধ—কেউ বড় ঘরের, কেউ বা পর্ণকুটীরের। কিন্তু সবাই এক পথের যাত্রী। গিলোটিনেব ধারাল লোহার তলায় সবাই এক। বিপ্লব জানে শুধু দুটি পথ—এক সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা আর এক মৃত্যু। মৃত্যুর সহজ পথের মুখেই এই গিলোটিন।

এ সর্বনাশা বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হলেও একটি দিনের জন্যও লুসি অন্য সবার মত উপায়হীন নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ল না। একদিন একটি দীর্ঘকাল বন্দী পলিতকেশ বৃদ্ধের সকল দায়িত্ব নিজের ছোট্ট বুক পেতে নিয়েছিল সে—আজ নিজের দুর্দিনেও তাঁকে তেমনি সযত্নে সবলে

আঁকড়ে রইল লুসি। সকল বিপদ-আপদে একনিষ্ঠ সেবা করতে লাগল তাঁকে।

আবার সংসার গুছিয়ে বসল লুসি। স্বামী নেই, এ-বাড়ীর কোথাও তেমন চিহ্ন রাখলে না। তার জন্যে ঘর সাজালে। যেখানকার যেটি তেমনটি করে সাজিয়ে রাখলে তার পুরানো বাড়ীর মত। সে ত জানে বাবার কথা মিথ্যা হবে না। স্বামীকে সে ফিরে পাবেই। প্রতিদিন ঘুমের আগে বহু বন্দীর মধ্যে এক জন বিশেষ বন্দীর মুক্তি-কামনায় সে আকুল প্রার্থনা জানায় বিশ্বপতির কাছে।

এ পনেরো মাসে চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি লুসির। শুধু সোনালী রঙের জৌলুস হয়তো বা একটু ফিকে হয়েছে। দুর্যোগের যে মেঘ-স্তূপ তার মনের আকাশকে নিরন্তর অন্ধকার করে রাখে, কোন কোন রাত্রে বাবার পায়ের কাছে বসে সে রুদ্ধ বেদনা অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে। তিনি তখন মেয়েকে সান্ত্বনা দেন।

'ভয় কি মা? আমার অজান্তে চার্লসের কোন অমঙ্গল হবে না। তাকে আমি বাঁচাবই।'

বাবার প্রবল আশ্বাসে মনে বড় শান্তি পায় লুসি।

এমনি এক দিন সন্ধ্যায় বাবা বাড়ী ফিরে এসে বললেন—জেল-খানার উঁচু দিকে একটা জানলায় আমাদের চার্লসকে মাঝে মাঝে দাঁড়াতে দেয় ওরা। এই বিকেল তিনটে নাগাদ। অবশ্য সব দিনই যে দাঁড়াবে তা নয়। সেই সময় তুমি যদি মা রাস্তার কোন বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক সে তোমায় চোখের দেখা দেখতে পাবে। কিন্তু তুমি হয়ত তাকে দেখতে পাবে না। আর দেখতে পেলেও চেনার যেন কোন সংকেত কোরো না—করলে তার মহা বিপদ হবে।'

'কোথায় সে জায়গা বাবা, দেখিয়ে দাও আমায়। আমি রোজ যাব সেখানে।'

পরদিন থেকে লুসি রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। ঘড়ির কাঁটাতে দুটো বাজলেই লুসি ছুটে যায়। চারটে বাজাব আগে আর বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় না। আবহাওয়া ভাল থাকলে মেয়েকেও নিয়ে যায়, নয় ত একাই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এইখানে আঁকা-বাঁকা গলি পথের শেষে অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার একটা ছুতোরের দোকান। এই লোকটাই এক সময় রাস্তা মেরামতীর কাজ করত।

তৃতীয় দিন একই ভাবে এক জাযগায দাঁড়িয়ে থাকতে লুসি ছুতোবের নজরে পড়ল। পরের দিন আবার আসতেই সে জিজ্ঞেস করলে—'আবার এসেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'সঙ্গে আবার একটি খুকু রয়েছে। তোমার নিশ্চয ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হোক, বেশ বেশ। আমার কাজ কাঠ কাটা। ঐ যে করাত দেখতে পাচ্ছ ওই দিয়ে গিলোটিন করা যায়।'

লোকটির কথার ধরন দেখে লুসি ভয়ে কাঁপতে লাগল। এখানে এলে ওর চোখে পড়বে না এ হতেই পারে না কিছুতেই। এর পর থেকে লোকটির শুভেচ্ছা পাবার উদ্দেশ্যে লুসিই আগে কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। মাঝে মাঝে মদের পয়সাও দিত। লোকটিও তা হাত পেতে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা দেখাত না।

অত্যন্ত কৌতূহল প্রকৃতির লোকটি। লুসি যখন জেলের ছোট্ট জানলার দিকে চেয়ে আত্মহারা হয়ে থাকে, লোকটিও লুসির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকায জেলের দিকে। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে কি দেখে সে।

শীতের তুষার-কুচি, বসন্তের ঝড়ো হাওয়া, গ্রীষ্মের তপ্ত রোদ আর হেমন্তের বাদল ধারায়—সকল ঋতুতেই লুসি প্রতিদিন দুটি ঘণ্টা কাটায়

ওখানে দাঁড়িয়ে। যাবার বেলা জেলখানার দেয়ালে বার বার চুমু খায়। বাবা বলেছেন চার্লস জানতে পেরেছে যে লুসি সেখানে আসে। স্বামী মাঝে মাঝে দেখতে পায় তাকে। রোজ দেখা না পেলেও মাঝে মাঝে যে দেখতে পায় তাতেই খুশী সে।

এমনি করে ডিসেম্বর এল। চারি দিকের বিভীষিকা উন্মত্ততার রাজ্যে একটি মানুষ শুধু অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। বন্দী, প্রহরী, বিপ্লবী, দেশদ্রোহী বিচার করছেন না। তিনি ডাক্তার ম্যানেট।

এমনি এক তুষার-ঝরা দিনে লুসি যথাসময়ে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে হাজির হয়েছে। আজ কি এক শুভ আনন্দ-উৎসবের দিন। আসার সময় লুসি লক্ষ্য করেছে গৃহে গৃহে পতাকা উড়ছে—পতাকায় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী।

ছুতোরের দোকানটি আজ বন্ধ। দেখে খুশী হল লুসি। যাক্, একটি দিন ত সে একলা কাটাতে পারবে।

হঠাৎ লুসি শুনতে পেল, বহু কণ্ঠের জয়োল্লাস আর উদ্দাম পদশব্দ। এক মুহূর্ত পরেই দেখতে পেল এক বিরাট মিছিল জেলের দিকে এগিয়ে আসছে। বিপুল জনতার কণ্ঠে বিপ্লবের গান। পদক্ষেপে জন-জাগরণের বলিষ্ঠ পৌরুষ। নৃত্যছন্দে সন্ত্রাস-জাগানো বেপরোয়া উদ্দামতা।

একাকী এই জনতার মুখোমুখী হয়ে ভয়ে-ত্রাসে অভিভূত লুসি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কাঁপছিল থর-থর করে। পালকের মত সাদা তুষার পড়ছে নিঃশব্দে। সাদা আর নরম। লুসি ভয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। মিছিল সরে যেতেই চোখ তুলে দেখলে বাবা সামনে দাঁড়িয়ে।

‘বড় ভয় করছিল বাবা!’

‘ভয় কি মা! ওরা কেউ তোমার ক্ষতি করবে না।’

'আমি নিজের জন্যে ভয় করি না বাবা। কিন্তু যখন ভাবি এদের কৃপার উপরই তাঁর জীবন—'

'এদের কৃপার বাইরে শীগগিরই সরিয়ে আনব মা চার্লসকে। ও আজ জানলায় দাঁড়িয়েছিল। সেই কথাই ত বলতে এলাম তোমায়। আজ তোমার উপর নজর রাখতে কেউ নেই এখানে। ঐ উঁচু জানলাটার দিকে চেয়ে তুমি তোমার ভালবাসা জানাতে পার।'

'তাই রোজ জানাই বাবা।'

'চার্লসকে এক দিনও দেখতে পাও না নিশ্চয়?'

'না বাবা'—অঝোরে কাঁদতে লাগল লুসি। তুষাবে কার পায়ের শব্দ হতেই দু'জনে চকিত হয়ে দাঁড়াল।

মাদাম ডুফর্জ।

নমস্কার জানালেন ডাক্তার।

শুকনো প্রতি-নমস্কার করল মাদাম। বাপ মেয়েতে দেখলে নিষ্কলঙ্ক তুষার-জমা রাস্তার উপর দিয়ে একটা অশুভ কালো ছায়া হেঁটে চলে গেল।

'আগামী কাল চার্লসের বিচার হবে।'

'আগামী কাল?'

'বৃথা সময় নষ্ট করার সময় কোথায়? আমিও প্রস্তুত। আরো সতর্ক থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাকে ট্রাইবুন্যালের সামনে হাজির করা হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই করা যাবে না। এখনও নোটিশ পায়নি সে। আমি ভিতর থেকে জেনে এসেছি। তোমার ভয় করছে না তো মা?'

লুসি এ কথার সঠিক উত্তর দিতে পারলে না—'তোমার মুখের কথাই আমার প্রাণ বাবা।'

'আস্থা হারালে চলবে না মা। ভাবনার কাল শেষ হয়েছে। কয়েক

ঘণ্টার মধ্যেই তাকে মুক্ত করে এনে তোমার হাতে সঁপে দেব। তাকে বাঁচানোর জন্য সব কিছুই করেছি। এখন একবার লরির সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

ডাক্তার ম্যানেট হঠাৎ কথা বন্ধ করলেন। ভারী চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিসের শব্দ তাঁরা ভাল করে জানেন।

'লরির সঙ্গে দেখা করতে হবে।' পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার। টেলসন ব্যাঙ্কের প্রাচীন কর্মচারী ঐ লরির প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁদের আজও একটুও টলেনি। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্তরের সঙ্গে টাকা-জহবত বার বার দাবী করছে বিপ্লবীরা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হচ্ছে দিনের পর দিন। তবু তিনি চেষ্টা করতে কসুর করছেন না। যে যা বিশ্বাস করে রেখে গেছে, তা রক্ষা করতে প্রাণপণ করছেন।

আকাশে অমঙ্গলের পিঙ্গল আভা। কুযাশা উঠছে সেইন নদী থেকে। আসন্ন রাত্রির সঙ্কেত। ব্যাঙ্কে যখন পৌঁছলেন ম্যানেট, রাত গাঢ় হযে এসেছে। মঁসিয়ের প্রাসাদ শূন্য পরিত্যক্ত পড়ে আছে।

বাড়ীর উঠোনে ধূলো আর ছাইয়ের গাদার উপরে বড় বড় হরফে লেখা—জাতীয সম্পত্তি। গণতন্ত্র এক অখণ্ড। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা —নয মৃত্যু।

লরির ঘরের ভিতর চেয়ারে ঐ অদৃশ্য মানুষটি কে? চেয়ারে ঝোলান যাব ঘোড়সওযারের কোট। মুখ যার দেখতে পেলে না তারা? ঐ নতুন মানুষটি কে যার কাছ থেকে উত্তেজিত ভাবে উঠে এসে তিনি লুসিকে বুকে তুলে নিলেন। দরজার বাইরে এসে আবার মুখ ঘুরিযে কাকে শুনিযে বললেন—'কাল বিচারের জন্য চালান দেবে।'

৬

জেলের ভিতর নিত্য ট্রাইবুন্যাল বসছে। বিপ্লবদ্রোহীদের বিচার চলছে অবিরাম। আগামী কাল যাদের বিচার হবে তাদের নামের তালিকা বের হয় আগের দিন সন্ধ্যায়। জেলাররা বন্দীদের পড়ে শোনায় সে নামের তালিকা। বলে—'শোন বন্ধুরা, খবরের কাগজে তোমাদের নাম বেরিয়েছে।'

নাম পড়েছে আগামী কালের বিচার-সভায়। যে তালিকায় ডার্নের নাম তাতে সব শুদ্ধ তেইশ জনের নাম পড়েছে। তাদের মধ্যে পাত্তা পাওয়া গেল সব শুদ্ধ কুড়ি জনের। একজন বন্দী ইতিমধ্যেই মরে বেচেছে আর দু'জনের বিচারের আগেই ফাঁসী হয়ে গেছে। লোকের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে তাদের নাম।

পরদিন পনের জনের বিচারের শেষে চার্লস ডার্নের ডাক পড়ল। আগের পনের জনের বিচারে সাক্ষীদের ভিড় ছিল না। বিচার হয়ে রায় দিতে সময় লাগল ঘণ্টা দেড়েক। রায় হল গিলোটিনে মাথা দিয়ে মৃত্যু।

পালকের টুপি মাথায় বিচারকেরা নিজেদের আসনে সমাসীন। জুরীরা বসে আছেন আর রয়েছে দর্শকবৃন্দ। এত দিন যারা ছিল সমাজের নীচুতলার বাসিন্দা, অবর, অধঃপতিত, অনাহারী, আজ তারা জুরীর সামনে বসেছে। বসেছে বিচারকের আসনে। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশ সশস্ত্র। মেয়েদেরও কারুর কারুর হাতে কোমরে ছুরী-ছোরা ঝুলছে। দর্শকদের প্রথম সারি অলঙ্কৃত করে বসে আছে ডাফর্জ। সীমান্ত অতিক্রম করার পর এই প্রথম তাকে দেখল ডার্নে। ডাফর্জের

পাশেই মাদাম। মাদাম দু'-এক বার ফিস্‌ফিস্ করে কি বললে দ্যফর্জের কানের কাছে মুখ নিয়ে। আর প্রেসিডেণ্টের আসনের নীচেই বসে আছেন শান্ত সমাহিত ডাক্তর ম্যানেট। তাঁর পাশে মিঃ লরি। বিপ্লবীদের দলে এঁরাই দু'জন বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

বিপ্লবীদের উকিল ডার্নেকে দেশত্যাগের অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। আইনের বিধানে দেশত্যাগীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার যোগ্য। ফ্রান্সের সীমানায় ধৃত হয়েছে আসামী। মৃত্যুই তার শাস্তি।

'রাষ্ট্রের শত্রুর মাথা চাই। গিলোটিন'—বলে চীৎকার করে উঠল সশস্ত্র জনতা। হত্যার নেশায় উন্মত্ত জনতার মুখে ঐ আওয়াজ যেন লেগেই আছে। শান্ত করার জন্য হাতুড়ী পেটালেন প্রেসিডেণ্ট। আবার জিজ্ঞেস করলেন বন্দীকে—দেশত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে বহুদিন বাস করেছে, এ সত্য অস্বীকার করে কি আসামী?

ডার্নে অস্বীকার করতে পারলে না সে-কথা।

আসামী নিজেই দেশত্যাগের কথা স্বীকার করেছে। আর কিছু বলবার আছে তার?

আছে বই কি। আইনের বিধানে একে দেশত্যাগী বলে না।

কেন নয়?

'কারণ স্বেচ্ছায় আমি রাজ-উপাধি ত্যাগ করেছি—ত্যাগ করেছি অরুচিকর আভিজাত্যের অধিকার। দেশত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম স্বাধীন জীবিকার খোঁজে। বিলাসী ধনীদের মত অত্যাচারিত নিরীহ ফরাসী প্রজাদের শ্রমার্জিত অন্নে লোভের ভাগ বসাইনি।'

'আসামীর উক্তির কি প্রমাণ আছে?'

'ডাঃ ম্যানেট ও নায়েব গ্যাবলকে আমি সাক্ষী মানছি।'

'কিন্তু আসামী ত বিয়ে করেছে ইংল্যাণ্ডে।'

'বিয়ে করেছি সত্যি, কিন্তু কোন ইংরেজ মহিলাকে নয়।'

'আসামীর স্ত্রী কি ফরাসী নাগরিক ?'

'হ্যাঁ। প্রিয় ফ্রান্স তার জন্মভূমি।'

'আসামী স্ত্রীর নাম ও বংশ-পরিচয় দিক।'

ডাক্তার ম্যানেটের কন্যা—লুসি ম্যানেট আসামীর বিবাহিতা পত্নী। ডাক্তার ম্যানেট এখানে উপস্থিত আছেন। মহান্ আদালত তাঁকে জেরা করতে পারেন।'

এই উত্তরে ক্ষুব্ধ জনতা মন্ত্রমুগ্ধ ভূজঙ্গের মত শান্ত হল। মহান্ ডাক্তারের জয়ধ্বনিতে বিচার-সভা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

প্রেসিডেণ্ট আবার প্রশ্ন করলেন—'কেন সে এত দিন বিদেশে বসবাস করছে—এই ক্রান্তিকালে কেন বিনা অনুমতিতে ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করতে এসেছিল ?'

এত দিন সে ফিরে আসেনি তার কারণ স্পষ্ট। ফ্রান্সে যে সম্পত্তির ভোগ-অধিকার স্বেচ্ছায় সে ত্যাগ করে গিয়েছিল তা ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের আর কোন উপায় ছিল না তার এখানে। ইংল্যাণ্ডে সে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষকতা করে নিজের ও পরিবারের অন্ন উপার্জন করে। বর্তমানে সে এসেছে এক ফরাসী নাগরিকের কাতর আবেদনে—তার অনুপস্থিতিতে লোকটির নাকি প্রাণ-সংশয় ঘটেছে। সেই হতভাগ্য নাগরিককে রক্ষা করার জন্যই নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে ফিরে এসেছে ফ্রান্সে। রাষ্ট্রের চোখে তার এই উদারতা কি অপরাধ বলে গণ্য হবে ?

জনতা সমস্বরে রায় দিল—না।

আবার প্রেসিডেণ্টের হাতুড়ী বেজে উঠল জনতাকে শান্ত করার জন্য। কিন্তু শান্ত হল না জনতা—ক্রমান্বয়ে জিগীর তুলতে লাগল—'না—না। আসামী নিরপরাধ।'

'যার প্রাণ বাঁচাতে এসেছিল আসামী তার নাম ?'

সে আসামীর দ্বিতীয় সাক্ষী। নাগরিক গ্যাবেল।

যে চিঠিখানি লিখেছিল গ্যাবেল, সীমান্তরক্ষীরা সেটি আসামীর অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, হয়ত প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে রাখা দলিলপত্রের মধ্যেই সেটি পাওয়া যাবে।

চিঠিখানি যাতে থাকে তার জন্যে পূর্বেই ব্যবস্থা করেছিলেন ডাক্তার। চিঠিখানি আদালতে পড়া হল। চিঠির সত্যতা প্রমাণের জন্য গ্যাবেলকেও প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে হাজির করা হল।

সওয়াল জবাবে সাক্ষী জানাল, এ্যাবয জেলে সে এত দিন বন্দী ছিল। মাত্র তিন দিন আগে তাকে ট্রাইবুন্যালের সমক্ষে হাজির করা হয়েছিল। চার্লস ডার্নে ধরা পড়ায় তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিচারে মুক্তি পেয়েছে সে।

এবার ডাক্তার ম্যানেটের জেরা সুরু হল। ডাক্তারের জনপ্রিয়তা, একনিষ্ঠতা ও উত্তরের স্পষ্টতায় প্রভাবান্বিত হলেন বিচারকেরা। দীর্ঘ কারাবাসের পর যখন মুক্তি পেয়েছিলেন বন্দীই তাঁর নূতন জীবনের প্রথম বন্ধু। তাঁর কন্যার প্রতিও পরম স্নেহশীল সে। ফ্রান্সের অভিজাত শাসন তন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে ডার্নে ইংল্যাণ্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসিতের জীবন যাপন করছে। সেখানেও ইংল্যাণ্ডের ধনিক সরকার তাকে সে দেশের শত্রু ও যুক্তরাজ্যের বন্ধু হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। ইংরেজ ভদ্রলোক মিঃ লরি, যিনি এখানে বিচার-সভায় উপস্থিত আছেন সেই বিচারের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ডাক্তার ম্যানেটের বক্তব্য শোনার পর জুরীরা সমস্বরে বন্দীকে নির্দোষ বলে রায় দিলেন। মুক্তি পেল বন্দী। ট্রাইবুন্যালের রায়ে জনতার সন্তোষের অবধি রইল না। যে জনতা এখুনি হত্যার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল, তারাই এই অভিজাত শত্রু বিপ্লবী বন্ধুকে সাগ্রহে তুলে নিলে। বন্দীর মুক্তি-বার্তা ঘোষিত

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের বাইরে আনন্দের রোল উঠল।

ডার্ণেকে একটি বড় চেয়ারে বসিয়ে রক্তপতাকা উড়িয়ে জনতা তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল তুষার-ঢাকা পথ দিয়ে। ডাঃ ম্যানেট আগেই বাড়ী ফিরে এসেছিলেন লুসিকে খবরটি দিতে। ডার্ণে এসে যখন তার সামনে দাঁড়াল আবেগের আতিশয্যে বিবশ হয়ে তার কোলে ঢলে পড়ল লুসি।

লরিও এলেন হাঁফাতে-হাঁফাতে। চিরবিশ্বস্ত মিস্ প্রসও এল। ডার্ণে সকলকেই তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল বারে বারে।

দু'জন একান্ত হলে লুসি বললে—'রোজ আমি ভগবানকে ডেকেছি। প্রতিদিন তাঁর কাছে তোমার মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাতুম।'

'তোমার বাবা আমার জন্যে যা করেছেন, আজকের ফ্রান্সে তা আর কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। কী অমানুষিক—'

এক দিন তিনি যেমন মেয়ের কোলে মাথা রেখেছিলেন আজ ছোট্ট মেয়ের মত পরম নির্ভয়ে বাবার বুকের উপর তেমনি মাথা রাখল লুসি। মেয়েকে যে তিনি সুখী করতে পারলেন, এই তাঁর পরম গৌরব।

'অমন করে কাঁপছিস কেন মা? ঐ দেখ না তোর চার্লসকে আমি নিয়ে এসেছি। কাঁদছিস কেন মা লুসি?'

৭

তবু কেন যেন লুসির ভয় ঘোচে না। কি এক নামহীন আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

চারি দিকের পরিবেশ কেমন যেন চাপা ছমছমে। মৃত্যু নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে সারা দেশটা। হত্যা হয়েছে নেশা। হিংস্র হয়ে উঠেছে নারী-পুরুষ। অহেতুক সন্দেহের বশে বা হীন প্রতিহিংসার জন্যে কত নিরীহ লোকের প্রাণ যাচ্ছে গিলোটিনের শাণিত কোপে। এ কথা কেমন করে ভুলে থাকবে লুসি যে তার স্বামীর মতই কত নিরপরাধ নির্দোষ লোক জনতার কোপে জীবন হারালে। তারাও ত কোন কন্যা-জননী-জায়ার আদরের ধন—পরম প্রিয়জন। তবু ভাগ্যবতী সে, কেন না সে-নিষ্ঠুর নিয়তির বজ্রমুষ্টি থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছেন বাবা। এ সব যখন ভাবে লুসি, কান্না ঠেলে আসে চোখের দু'তট ছাপিয়ে। শীত-সন্ধ্যার কালো পক্ষচ্ছায়ায় ঢেকে যায় চারি দিক। নিষ্প্রদীপ পথে শব-শকটগুলির ভয়াবহ ঘড়-ঘড় শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ কানে আসতেই লুসি স্বামীর কাছে আরো ঘন হয়ে বসে। কাঁপুনি বাড়তে থাকে বুকের।

বাবা তাকে অভয় দেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন—রক্ষা করেছেন মেয়ের স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। এক দিন তিনি ছিলেন প্রায় উন্মাদ—স্মৃতিভ্রংশ দুর্বল। আজ বিরাট বনস্পতির মত তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে সবাই—এ তাঁর কম সৌভাগ্য নয়।

চারি দিকের এই ভীতি ও অবিশ্বাসের রাজ্যে মানুষের স্বাভাবিক

জীবনই যেন বানচাল হয়ে গেছে। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জিনিষ-পত্তর কেনাকাটি করা হয় প্রতি সন্ধ্যায়—তাও স্বল্প পরিমাণে নানা ছোট-ছোট দোকান থেকে যাতে না সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সব রকম গুজব আর ঈর্ষার সংক্রমণ থেকে শত হাত দূরে থাকাই এখন প্রয়োজন। যত দিন না এ দেশ ত্যাগ করে তাঁরা নিরাপদে যেতে পারছেন ইংল্যাণ্ডে।

আগুনের ধারে ঘন হয়ে বসে লুসি স্বামীকে নিয়ে। নাতনীকে নিয়ে বসেন বাবা। লরিও এখুনি ব্যাঙ্ক থেকে এসে পড়বেন। মিস্ প্রস আলো জ্বেলে দিয়ে যায় ঘরে। ঠাকুর্দার হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়ে নাতনী পরীর গল্প শুনছে উৎকর্ণ হয়ে চারি দিক নীরব নিঝুম।

'ও কিসের শব্দ'—হঠাৎ আঁতকে উঠল যেন লুসি।

ডাক্তার ম্যানেট গল্প বলা থামিয়ে বললেন—'মা, তুমি বড্ড ভয়কাতুরে হয়ে পড়েছ আজকাল। একটুকুতেই অত ঘাবড়ে যাও কেন? সাহসিনী হও মা।'

ধরা-গলায় ফ্যাকাশে মুখে বললে লুসি—'আমার মনে হল, সিঁড়িতে যেন কাদের পায়ের শব্দ পেলাম।'

'সিঁড়ি ত মড়ার মত নিঃসাড় পড়ে আছে মা।'

কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় করাঘাত হল।

'ঐ যে বাবা। তুমি লুকিয়ে পড়। বাবা, বাঁচাও ওকে।'

'কেন উতলা হচ্ছ মা। তোমার চার্লসকে আমি বাঁচিয়ে এনেছি। বাঁচিয়েছি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ছিঃ, এ কি দুর্বলতা তোমার! আমি দেখছি কে।'

ডাক্তার ম্যানেট বাতি হাতে দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন মেঝেতে ভারী পায়ের শব্দ করে মাথায় লাল টুপি, হাতে পিস্তল, কোমরে ছোরা, রুক্ষ চেহারা চার জন লোক ঘরে প্রবেশ করল।

'চার্লস ডার্নে আছেন'—বললে প্রথম জন।

'কে খোঁজ করছে তার?' প্রশ্ন করল ডার্নে।

'আমি। আমরা। আপনাকে চিনি আমরা—আজকের ট্রাইবুন্যালের বিচারের সময় দেখেছি। চার্লস ডার্নেকে রাষ্ট্রের বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।'

লুসি আর মেয়ে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। তবু ডার্নেকে চার জনে ঘিরে ফেলল।

'কেন আবার আমাকে বন্দী করা হচ্ছে জানতে পারি কি?'

'এক্ষুণি আবার সোজা জেলে ফিরে যেতে হবে এইটুকু মাত্র বলতে পারি। আগামী কাল সব জানতে পারবেন। আগামী কালই বিচার হবে।'

ডাক্তার ম্যানেট এতক্ষণ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বক্তার হাত চেপে ধরে বললেন—'ওকে চেনেন বললেন। আমায় চেনেন কি?'

'চিনি বই কি।'

'আপনি আমাদের সকলেরই পরিচিত ডাক্তার। আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ।'

তাদের মুখের দিকে উদাসীন দৃষ্টি মেলে নীচু-গলায় বললেন ডাক্তার—'এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও, কেন ওকে আবার বন্দী করার হুকুম হল। কি ওর অপরাধ?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম লোকটি বলল—'সাঁ আতয়া'র বিপ্লব পার্টি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। এই লোকটি সেখান থেকেই আসছে'—দ্বিতীয় লোকটিকে দেখিয়ে দিল প্রথম।

'কি অভিযোগে?'

'এর বেশী আর জানতে চাইবেন না ডাক্তার। দেশ আমাদের কাছে যা দাবী করছে বিপ্লবী হিসেবে তা হাসিমুখে স্বীকার করতেই হবে

আমাদের। রাষ্ট্রের দাবী প্রথম। জনতার দাবী লঙ্ঘন করবে কে?'

'আর একটি কথা'—ডাক্তার প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন—'অভিযোগকারী কারা তাদের নাম জানতে পারি কি?'

লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে অবশেষে নীচু-গলায় বললে—'এ প্রশ্ন বে-আইনী। তবে আপনি যখন জানতে চাইছেন বলছি। অভিযোগকারীদের নাম— মদের দোকানের ত্যফর্জ ও মাদাম। আরো এক জন আছেন।'

'কে সে?'

'সত্যি জানতে চাইছেন?'—বলে এক অদ্ভুত দৃষ্টি হানলে লোকটি—'এ প্রশ্নের জবাব আজ নয়। আগামী কাল আদালতে সব জানতে পারবেন। কিন্তু আর নয়। চলুন চার্লস ডার্ণে।'

৮

মুক্তির দু'ঘণ্টার মধ্যেই চার্লস ডার্ণে বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হয়েছে এ সংবাদ মিস্ প্রস আর তার সঙ্গী কেউই জানতে পারেনি। তারা তখন প্যারিসের পথে সংসারের সওদা করতে ব্যস্ত। মুদীর দোকানের খুঁটিনাটি কেনার পর বাড়ী ফেরার পথে হঠাৎ প্রসের মনে পড়ল মদের কথা। ভাল মদের আশায় দু'জনে কাছাকাছি একটি দোকানে গিয়ে উঠল।

পথের কলরব আর থমথমে আবহাওয়ার পর এই দোকানটির নির্জন শান্তিতে এসে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্রস। ইংগিতে দেখিয়ে দিল দোকানীকে কোন মদ কতখানি তার দরকার।

একটি লোক একখানি কাগজ থেকে কি যেন পড়ে শোনাচ্ছিল লাল টুপী-পরা সঙ্গীদের। সেই শব্দ ভিন্ন সব স্তিমিত এখানে। উত্তাল উন্মত্ত নগরীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে এটি যেন একটি নিভৃত শান্ত দ্বীপ। এখানে বিপ্লবীদের মাথার টুপীর রঙও যেন ফিকে লাল মনে হল এই সন্ত্রস্ত বিদেশী খরিদ্দারদের চোখে। দোকানের এক কোণে দু'জন লোক ফিসফিস করে কথা কইছিল। এক জন উঠে চলে যাবার সময় তার মুখোমুখী হতেই প্রস বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল। দুই হাতে করতালি দিলে উল্লসিত হয়ে।

চকিতে সমস্ত দলটি ঘুরে দাঁড়াল তাদের দিকে। আজকাল এ-রকম হঠাৎ আর্ত চীৎকার ওঠার মানেই খুন হওয়া। কে খুন হল দেখতে মুখ ফেরাতেই তাদের চোখে পড়ল দু'টি স্তব্ধ বিস্মিত নরনারীর মুখ।

দু'-জনে মুখোমুখী। একজনের সর্বাঙ্গে ফরাসী বিপ্লবীর সাজ আর একজন ইংরেজ। প্রসের অবাক চোখের চাউনিতে এক জনের সমস্ত বাক্য-প্রবাহ যেন নিরুদ্ধ স্তব্ধ। সঙ্গী জেরির চোখেও বিহ্বল বিমূঢ়তার অবধি নেই।

চাপা রূঢ় গলায় ইংরেজীতে বললে লোকটি—'কি চাও তোমরা এখানে ?'

দু'টি হাত সশব্দে জড়ো করে নিয়ে কণ্ঠে মমতা মাখিয়ে বললে প্রস—'সলোমন—আমার সলোমন। এত দিন পরে এমনি করে তোর দেখা পেলাম ভাই।'

'ও নামে খবরদার ডাকবে না আমায়'—ভয়ার্ত চঞ্চল চোখে চারি দিকে তাকিয়ে বললে লোকটি—'খবরদার ডাকবে না। খুন করাবে নাকি আমায়।'

'কেন অমন নিষ্ঠুরের মত কথা কইছিস ভাই ? কি আমি করেছি তোর ?'

'কথা কইতে চাও ত চুপচাপ জিনিব নিয়ে বাইরে চলে এস। সঙ্গের ও লোকটা কে?'

'ও জেরি।'

'ওকেও চলে আসতে বল। আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছে কেন? আমি কি ভূত নাকি?'

প্রস দাম মিটিয়ে দিলে মদের। সেই অবসরে লোকটা তার সঙ্গীদের ফরাসী ভাষায় কি সব বুঝিয়ে দিতেই তারা নিঃশব্দে যে যার আসনে ফিরে গেল। আবার সব ঝিমিয়ে পড়ল দোকানের ভিতরে।

বাইরে নিরিবিলি গা-ঢাকা আঁধারে দাঁড়িয়ে সলোমন বললে—'কি চাও বল?'

'একটা মিষ্টি কথা বল্ ভাই। কেন অমন শুকনো-গলায় কথা কইছিস?' নিতান্ত দায় গোছের করে বোনের ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল সলোমন—'হল ত?'

ঘাড় দুলিয়ে সাড়া দিল প্রস। তেমনি নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

'তোমরা আমায় অবাক করতে পারোনি। শুধু তোমরা কেন—ইংল্যাণ্ড থেকে এখানে যারা আসে কেউই আমার নজর এড়ায় না। কিন্তু আর নয়—এবার আমায় নিষ্কৃতি দাও। আমি এদের অফিসার, তোমাদের সঙ্গে ভাব করতে গেলে আমার নিজের প্রাণ-সংশয়।'

'বলিস কি ভাই'—প্রসের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না—'ওখানে থাকতে তোর কত ভরসা আমরা করতাম। তুই ছিলি দেশের ভবিষ্যৎ। আর এখানে বলিস কি তুই—তুই হলি বিপ্লবীদের অফিসার? এর চেয়ে যে—'

'ঠিক জানি'—বোনের কথায় থাবা দিয়ে বললে সলোমন—'ঠিকই

বুঝেছি—তুমি আমার মরণই চাও। তারই ব্যবস্থা করতে এসেছ এত দূর।'

আচম্বিতে লোকটির কাঁধে হাত দিয়ে জেরি বললে—'একটা কথা। আপনার নাম জন সলোমন না সলোমন জন?"

'তার মানে?'

'আপনার বোন বলছে সলোমন। আমি জানি জন। কি নাম ছিল আপনার সমুদ্দুরের ওপারে?'

'তাতে কি দরকার?'

'দরকার আছে বই কি। তুমি হলে গিয়ে বেলী জেলের গোয়েন্দা। তোমার নামটার দরকার আছে বই কি। জানা নামটা পেটে আসছে মুখে আসছে না।'

'ওর নাম বরসাদ'—বলতে বলতে সকলকে অবাক করে দিযে উপস্থিত হলেন সিডনী কার্টন। বললেন—'ভয় পেযো না মিস্ প্রস। কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছি মিঃ লবির ওখানে। তিনিও কম অবাক হননি আমায় দেখে। কিন্তু সে কথা যাক্, তোমার ঐ করিৎকর্মা ভাইটির সঙ্গে দুটো কথা আছে আমার। এখানকার জেলের টিকটিকি—'

ফ্যাকাশে মুখে বরসাদ প্রতিবাদ করার উপক্রম করতেই সিডনী কার্টন তাকে থামালেন—'চুপ কর জেলের টিকটিকি। আজ বিকেলে জেলের পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তোমায় প্রথম দেখতে পেযেছিলাম আমি। ঐ মুখ। ঐ মুখ কি মানুষ সহজে ভুলতে পারে? কিন্তু ঐ মুখ আর তোমার ঐ সব বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে চাল-চলন দেখেই একটা মতলব এসেছে আমার মাথায। তোমাকে দিয়েই ঠিক হবে। সেই তখন থেকে তোমার পিছু ছাড়তে পারিনি দেখছ না—'

'কি মতলব আপনার ?'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতে চাও ত বলতে পারি। কিন্তু সে তোমার পক্ষে হবে সাংঘাতিক। তার চেয়ে চল না কেন টেলসন ব্যাঙ্কের নিরিবিলিতে—'

'আপনি কি ভয় দেখাচ্ছেন নাকি ?'

'ভয়ের কথা আমি বলেছি ?'

'তবে টেলসনেই বা যেতে বলছেন কেন ?'

'সে কথা নাই শুনলে বরসাদ ?'

'অর্থাৎ আপনি কারণ বলবেন না ?'

'তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই'—বললেন কার্টন।

সিডনী কার্টনের মুখ-চোখের বেপরোয়া ঔদাসীন্য দেখে বরসাদের বুঝতে বাকি রইল না যে এ মানুষটির সঙ্গে তার কোন ফাঁকিই চলবে না। বিষাক্ত হিংস্র সাপ মুহূর্তে বশ হল। তবু বোনের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললে বরসাদ—'আমার যদি কোন ক্ষতি হয় বুঝব যে তোমার জন্যেই তা হল।'

'থাক থাক—খুব হয়েছে'—ধমক দিয়ে উঠলেন কার্টন—'অকৃতজ্ঞ অমানুষের মত কথা বলো না। তোমার দিদিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাই, নইলে সামান্য ব্যাপারের জন্যে তোমার সঙ্গে এমন ভদ্রতা আমার না করলেও চলত। তুমি আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাবে কি না ?'

'চলুন যাচ্ছি।'

'কিন্তু তার আগে তোমার দিদিকে নিরাপদে পৌছে দিতে হবে। আসুন মিস্ প্রস, আমার হাত ধরুন। এই সময় এমন অরক্ষিত অবস্থায় পথে বেরোনো আপনাদের ঠিক হয়নি। চল বরসাদ, এগোও।'

ভাই তার যত অন্যায়ই করুক, তবু স্নেহময়ী প্রস তার কোন ক্ষতির

কথা ভাবতে পারে না। সিডনী কার্টনের আশ্চর্য আচরণের অর্থ না বুঝে তার দিকে মিনতিভরা চোখে তাকাল প্রস। দেখলে সেই মানুষটির প্রসন্ন চোখে কি এক অবোধ্য উজ্জল দীপ্তি। সেই দীপ্তিতে মনের কুয়াশা কেটে গেল প্রসেব—অজানিত আশঙ্কা দূর হল।

প্রস ও তার সঙ্গীকে পথের বাঁকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এগিয়ে গেলেন কার্টন টেলসন ব্যাঙ্কের দিকে। জন বরসাদ ওরফে সলোমন প্রস তার সঙ্গী হল।

সান্ধ্য আহার সেরে গন্‌গনে আগুনের মুখোমুখী বসেছিলেন লরি। কার্টনের সঙ্গে অপরিচিত লোকটিকে দেখে সবিস্ময়ে তাকালেন তাদের দিকে।

'মিস্ প্রসের ভাই—ববসাদ।'

পরিচয় শুনেই লরি সামান্য বিচলিত হলেন, বললেন—'নামটাব সঙ্গে যেন পরিচয হযেছিল কোন সময়ে। মুখ দেখেও চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।'

'বোসো ববসাদ'—বলে সিডনী কার্টন নিজেও আসন নিলেন। তার পর সেই পরিচয় স্পষ্ট করে দেবার জন্যে বললেন—'চেনা বৈ কি। ও-মুখ কেউ ভুলতে পারে না সেই কথাই বলছিলাম এতক্ষণ ওকে। বেলী জেলেব বিচাবে বাজসাক্ষী ববসাদকে মনে পডবে আপনার।'

আগন্তুকের দিকে ঘৃণাভরে তাকিযে আছেন লবি। দেখে কার্টন বললেন—'তবু ভাল যে বরসাদ মিস্ প্রসের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হযনি। কিন্তু তার চেযেও গুরুতর দুঃসংবাদ আছে মিঃ লরি। ডার্নে আবার গ্রেপ্তার হযেছে।'

'বলেন কি?'—অতর্কিত ধাক্কায় অভিভূত হযে পড়েন লরি—'বলেন কি মিঃ কার্টন! এই যে ঘণ্টা দুই হল ওকে নিরাপদে গৃহে প্রতিষ্ঠিত

করে এলাম। এখুনি একবার ওদের খবর নেবও ভেবেছিলাম। কিন্তু কি হল কিছুই ত বুঝতে পারছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না। এই বরসাদ সব খবর জানে। ওর মুখেই আমি খবরটা প্রথম শুনলাম। আশ্চর্য হবেন না মিঃ লরি। মদ খেতে খেতে আর এক টিকটিকিকে জানাচ্ছিল বরসাদ খবরটা। আমি তা শুনে ফেলি। তাকে নিরাপদে জেলেও পৌঁছে দিয়েছে এতক্ষণে ওরা। কি, আমি ঠিক বলিনি বরসাদ?'

লরির সপ্রশ্ন চোখের দিকে চেয়ে কার্টন বললেন—'কাল আবার বিচার-সভায় হাজির হতে হবে তাই বলছিলে না তুমি বরসাদ? হয়ত এবারও ডাক্তার ম্যানেটের আত্মীয়তা তাকে মুক্ত করতে পারবে। কিন্তু কি জানি কেন এবার আমি বড়ো নার্ভাস হয়ে পড়ছি মিঃ লরি। ডাক্তার ম্যানেটের প্রতিপত্তি মনে রাখলে ডার্ণের পুনর্বিচারের কথাটা কেমন যেন অসংলগ্ন বোধ হয়—'

'কিন্তু ডাক্তার হয়ত আগে জানতেই পারেননি।'

'জানা-না-জানার প্রশ্ন নয় মিঃ লরি। বিপ্লবীরা ত জানে যে ডার্ণে তাদের ডাক্তারের প্রাণের প্রাণ। তবে?'

এ কথার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না লরি। এই অকল্পনীয় বিপদের সম্মুখীন হয়ে নিতান্ত বিচলিত ভাবে বসে রইলেন বক্তার মুখের দিকে চেয়ে।

শান্ত কণ্ঠে বললেন সিডনী কার্টন—'এ বড় ছন্নছাড়া সময় মিঃ লরি। জীবন-মৃত্যুর এই বেহিসেবী জুয়োখেলায় পণের পরোয়া রাখলে চলবে না। দান ফেলতেই হবে—কেউ জিতবে, কেউ সর্বস্ব খোয়াবে। ডাক্তার জিতুন, আমি হারার দান ধরছি। আজ আর প্রাণের দাম নেই। নইলে এখুনি যাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলাম—কাল হয়ত তাকে হারাতে হবে। না মিঃ লরি, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এই জুয়ো

আমি ধরব। ভগবান না করুন, যদি হারার ঘুঁটি পড়ে আমাদের, এই বরসাদ তাকে বাঁচাবে।'

'ভাল তাস আছে ত হাতে?'

বরসাদের কণ্ঠে চকিত হয়ে তাকালেন সিডনী কার্টন। বললেন—'দেখা যাক, কি তাস ওঠে হাতে। মিঃ লরি, আমি একটু গলাটা ভিজিয়ে নেবো।'

'সানন্দে'—বলে লরি তাঁর দিকে পানপাত্র এগিয়ে দিলেন।

গলা ভিজিয়ে নিয়ে একবার আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন কার্টন। তার পর বরসাদকে লক্ষ্য করে বললেন,—'ভয় কি? তাস যা পেয়েছি হাতে মোক্ষম জিনিষ। জাতে ইংরেজ—নাম ভাঁড়িয়ে ফরাসী। আগে ছিলে ফরাসী রাষ্ট্রের শত্রু ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের চর—এখন ডিগবাজি খেয়ে ফরাসী বিপ্লবের গোয়েন্দা টিকটিকি। এ কি সোজা তাস ভাবছ বরসাদ! এখনো ত মাইনে খাচ্ছ ইংরেজ রাজার—কি বল?'

'আমি টেক্কা মারছি বরসাদ, তুমি তাস ফেলো। এই ত কাছেই বিপ্লবীদের আড্ডা, গিয়ে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি চলো। তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই—ভেবে বল।'

বরসাদের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সিডনী কার্টন আর এক পাত্র মদ নিজে ঢেলে নিলেন। তার দিকেও এগিয়ে দিলেন এক গ্লাস, তার পর শান্ত কণ্ঠে বললেন—'ভাল করে ভেবে তাস ফেলবে বরসাদ। আমি তোমায় সময় দিচ্ছি।'

তার জালিয়াতির কথা বেফাঁস হলে বিপ্লবীদের হাতে কি চরম শাস্তি সে পাবে, সে কথা ভেবে বরসাদ অন্তরে অন্তরে শিহরিত হল। এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব তার পক্ষে। গিলোটিনের ধারাল লোহা সমস্ত দেশ জুড়ে তার আতঙ্কিত ছায়া বিস্তার করে রেখেছে—তার থেকে পরিত্রাণ নেই কোন বিশ্বাসহন্তার।

রক্তহীন মুখে কার্টনের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বরসাদ অনেকক্ষণ। তারপর লরির দিকে ফিরে বললে—'আপনিও ত জ্ঞানী লোক—বয়োবৃদ্ধ। আপনিই বলুন ত, ওঁর মত ভদ্রলোকের পক্ষে এই ধরণের হীন কাজে নেমে আসা কি উচিত, না ওঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠাব পক্ষে মানায়? আমি ত গোয়েন্দা—চর—টিক্‌টিকি—আমি ত অন্নের জন্যেই এই ইতরামি করছি, কিন্তু তাই বলে উনিও যদি সেই নোংবামিব মধ্যে—আপনিই বলুন—'

ঘড়ির দিকে তাকিযে কার্টন যেন আপন মনেই বললেন—'বৃথা বাক্য ব্যয কোরো না বরসাদ। আমার হাতে সময বেশী নেই—আমি তাস ফেলেছি, তোমার যা করবার করো।'

'আমার দিদিকে আপনি শ্রদ্ধা কবেন শুনেছি—সে ক্ষেত্রে আপনাব পক্ষে—'

'তোমার মত ভায়ের হাত থেকে আমি তাকে মুক্তি দিতে চাই বরসাদ। তোমার বক্তব্য তুমি বলে ফেল—আমাব হাতে সময বড় কম।'

তবু তাকে বশ কবতে পারছেন না দেখে অধৈর্য কণ্ঠে কার্টন বললেন—'শুধু তাই নয়। আমার হাতে রঙের বারো তাস আছে বরসাদ। যে টিক্‌টিকির সঙ্গে তুমি কথা কইছিলে, তাব নাম কি, কি জাত তার?'

'ফরাসী—'

'মিথ্যে কথা। ইংরেজ। তার ফবাসী আলাপে স্পষ্ট বিদেশী টান আমি শুনেছি। তুমি আমায ধাপ্পা দিতে পারবে না ববসাদ—সে-চেষ্টাও তুমি করো না। সে হল ক্লাই। পুরানো বেলী জেলেব সেও এক দাগাবাজ গোয়েন্দা টিক্‌টিকি। যতই ছদ্মবেশ ধরো, আমাব চোখকে তোমরা ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'আপনি এইবার ভুল করলেন স্যার। ক্লাই ত কবে মরে গেছে। তাকে আমরা লণ্ডনে কবর দিয়েছিলাম। লোকটাকে কেউ দেখতে পারত না, তাই ভয়ে তার শবযাত্রায় আমি যোগ দিতে পারিনি, কিন্তু তার মৃতদেহ আমি নিজ হাতে কফিনে দিয়েছিলাম যে! এই দেখুন না তার সার্টিফিকেট আমার কাছে রয়েছে। দেখুন হাতে করে—এ ত আর জাল নয়।'

'নিজের হাতে কফিনে দিয়েছিলে, না?'

কাঁধের উপর লৌহ-মুষ্ঠির চাপ পড়তেই চমকে ফিরে তাকাল বরসাদ। তারপর হঠাৎ সামনে জেরিকে দেখে আমতা-আমতা করে বললে—'হ্যাঁ—'

'তাকে বের করে নিয়েছিল কে?'

'তার মানে?'

'তার মানে সব জিনিষটাই বানানো-সাজানো। কফিনের ভেতরে মাটি-পাথর দিয়ে তোমরা ভেবেছিলে খুব লোক ঠকিয়েছ। কিন্তু আমি জানি আর আমার দুই বন্ধু তারা জানে—'

'তুমি কেমন করে জানলে—'

'তাতে তোমার কি বিশ্বাসঘাতক। তোমার মত লোককে খুন করলেও গায়ের জ্বালা জুড়োয় না। দেশে-বিদেশে কত নিরীহ লোককে তুমি ফাঁসীতে, গিলোটিনে পাঠালে—'

উত্তেজিত জেরিকে হাত ধরে শান্ত করলেন কার্টন। বললেন—'তোমার কত রহস্য আমরা জানি দেখছ ত বরসাদ। তোমায় গিলোটিনে পাঠাবার তুরুপের টেক্কা এই আমার হাতে ধরা—কি বলতে চাও বল?'

'আমায় দয়া করুন'—কাতর কণ্ঠে বললে বরসাদ—'আমার অপরাধ এই আমি কবুল করছি। কি করব, ইংল্যাণ্ডে থাকলে ওরা

আমায় নিশ্চয় প্রাণে মারত। তাই প্রাণভয়ে আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। আর ক্লাইকে এমন করে না মৃত্যুর অভিনয় করালে সবাই মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলত সেদিন,—কিন্তু এই লোকটা—এই লোকটা কি করে জানতে পারলে— ? আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

এতক্ষণে নির্বিষ নির্বীর্য বরসাদ আত্মসমর্পণ করলে কার্টনের কাছে। বললে—'আমার ডিউটির সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কী প্রস্তাব ছিল আপনার বলুন। সাধ্যমত আমি তাতে রাজী হব। আমার মাথা এখন আপনার হাতে—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার আর দাম কি ? বলুন আপনি।'

সিডনী কার্টন স্পষ্ট প্রশ্ন করলেন—'জেলে তোমার অবাধ গতিবিধি শুনেছি। এ কথা কি সত্যি ?'

'খানিকটা সত্যি বটে।'

'যখন-তখন আসতে-যেতে পার ? স্পষ্ট জবাব দাও।'

'পারি।'

শুনে সিডনী কার্টন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'এতক্ষণের সমস্ত কথাবার্তার সাক্ষী রইলেন এরা দু'জন। এস এবার আমরা পাশের ঘরে যাই। সেখানে আমার শেষ কথা তোমায় নিভৃতে বলব।'

৯

সিডনী কার্টন জেলের গোয়েন্দা বরসাদকে নিয়ে পাশের একটি নর্জন আঁধার কক্ষে একান্ত হলেন। দু'জনের নিম্ন-কণ্ঠ পরামর্শ লরির জাগ কানে পৌঁছল না। কতক্ষণ পরে দু'জনে বাইরে এলেন।

'কথাবার্তা তাহলে ঐ ঠিক রইল বরসাদ। আমার দিক থেকে মি নিঃশঙ্ক থাকবে'—গোয়েন্দাকে বললেন কার্টন। তার পর তাকে

বিদায় করে অগ্নিকুণ্ডের সামনে লরির মুখোমুখী একটি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে কি কথা হল জানতে চাইলেন লরি।

'বিশেষ কিছু নয়'—বললেন কার্টন—'বন্দীর সঙ্গে একবার দেখা করবার ব্যবস্থা পাকা করলাম।'

এ কথা শুনে লরির মুখের আলো এক ফুৎকারে নিবে গেল।

'এর বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। এর বেশী কিছু করতে হলে ঐ লোকটির মাথা গিলোটিনের নীচে ঠেলে দেওয়া হবে।'

'কিন্তু ট্রাইব্যুনালের বিচারে মন্দ কিছু যদি ঘটে, শুধু দেখা করলেই ত তাকে বাঁচান যাবে না।'

'সে কথা আমিও বলি না।'

লরি যে কত ভালবাসেন এই পরিবারটিকে তা জানেন কার্টন। ডার্নের দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হওয়ায় নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন তিনি। দুর্ভর দুশ্চিন্তায় মানুষটি যেন হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। কার্টন দেখলেন সামনের মানুষটির দু'টি চোখের তট উপচে টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'নিখাদ সোনার মত খাঁটি মানুষ আপনি। এদের অকৃত্রিম বন্ধু। আমার কথায় যদি আঘাত পেয়ে থাকেন ক্ষমা করবেন আমায়'—কার্টনের গলার স্বর নিবিড় মমতা মাখানো,—'আমার বাবা যদি পাশে বসে এমনি নিরুপায়ের মত কাঁদতেন আমি দেখতে পারতুম না।'

কার্টনের মুখে এই ধরনের কথার জন্য লরি একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। এই লোকটির সম্বন্ধে তার মনে কোন দিনই ভাল ধারনা ছিল না। কিন্তু এই বেদনার্ত সঙ্কটকালে তার স্নিগ্ধ ভাষণে পুলকিত হয়েই লরি হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। সাগ্রহে তার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন।

'লুসির কথা ভাবছি আমি। তাকে এই ব্যবস্থার কথা জানানো

চলবে না। ডার্নের সঙ্গে তার দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়। আর ভগবান না করুন, সত্যি যদি কোন অমঙ্গল ঘটে শেষ অবধি সে হতভাগিনী হয়ত ভাববে আগে থেকে আমরা তাকে খারাপটা সম্বন্ধেই জানান দিয়ে রেখেছিলাম।'

ততটা ভাবেননি লরি। তাই অবাক হয়ে তিনি কার্টনের মুখের দিকে তাকালেন। ভাবলেন, সত্যিই কি তবে কার্টনের মনে এত সব উদয় হয়েছে?

'শুধু কি তাই। হয়ত আরো হাজারো ভাবনায় কণ্টকিত হবে সে। তাতে তার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। দয়া করে আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না তাকে। আমি কি করতে পারি দেখি! তার চোখের আড়াল থেকেই আমি আমার যথাসাধ্য করব—এ শুধু আপনিই জেনে রইলেন। সংসারে আর কাউকে আমি জানাতে চাই না। আপনি এখন যাচ্ছেন ত তার কাছে? আজ রাত্রে নিশ্চয় ও একলা বোধ করবে।'

'আমি এখুনি যাব সেখানে।'

'সেই ভাল। আপনাকে বড়ো ভালবাসে, বিশ্বাস করে লুসি। কত দিন তাকে দেখিনি। এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাকে।'

'উৎকণ্ঠায় কাতরা। মনে তার সুখ নেই। কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগে তাকে দেখতে।'

'আহা!' বলে কার্টন আর কথা কইলেন না।

কিন্তু সে ত শুধু একটা শব্দ নয়। যেন একটা বুক-ফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। যেন একটা চাপা কান্নার অস্ফুট আর্তনাদের মত শোনাল সে-শব্দ লরির কানে। চমকিত হয়ে তিনি ফিরে তাকালেন কার্টনের দিকে।

দেখলেন আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছেন কার্টন। গায়ে তার রাইডিং কোট। দেখলেন তাঁর মুখের উপর দিয়ে একটা কুয়াশা মুহূর্তে

সরে গেল। দেখলেন যেন উজ্জ্বল ঝরঝরে দিনে পাহাড়ের উপর দিয়ে সঞ্চরমান একটা আলো-ছাযার ঝিলিমিলি চঞ্চল পায়ে চলে গেল চোখের আড়ালে। উদ্দীপ্ত আগুনের আভায় সেই স্নুন্দর মুখে ততোধিক স্নুন্দর করুণা।

মাথার বাদামী চুলগুলি অনেকদিন অমার্জিত। কানের দু'পাশ দিয়ে সেগুলি অবিন্যস্ত, দীর্ঘ। এত দিন পরে আজ প্রথম আবিষ্কার করলেন লরি যে স্নুন্দরই দেখতে সিডনী কার্টন। কিন্তু সে সৌন্দর্যে বড় নিষ্করুণ ঔদাস্য। অবহেলায় অনাদরে সে রূপ কত মলিন হয়ে পড়েছে। যেন আপনার মনের কারাগারে মানুষটি বন্দি-জীবন যাপন কবছেন কত দিন। তারই ছাযা পড়েছে সে-মুখে।

'আপনার এখানকার কাজ শেষ হযেছে নিশ্চয ?'

'হ্যা, যা করা সম্ভব শেষ করে এনেছি। এদের এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ দেখে প্যাবিস ছেড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। যাবার পাসপোর্টও পেযে গেছি। যাবার জন্য আমি ত প্রস্তুতই হচ্ছিলাম।'

কথা বলতে বলতে দু'জনেই হঠাৎ নীরব হযে গেলেন। এক সময় কার্টন বললেন—'ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কত দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি পিছনে ফেলে রেখে এসেছেন।'

'তা প্রায আটাত্তর হবে।'

'একটি সফল স্নুন্দব জীবন। সকলের ভালবাসা শ্রদ্ধা পেযেছেন। প্রতিটি মুহূর্ত কর্মে মুখর। আজ আটাত্তর বছবের শেষে সহজেই অনুমান করা যায কোথায় আপনার স্থান। যখন অপনাব অবর্তমানে এ পদ শূন্য থাকবে, কত লোক আপনার জন্যে ভাববে।'

'আমি অকৃতদার একলা মানুষ। আমার জন্যে চোখের জল ফেলবে না কেউ।'

'এ কথা কি করে বলছেন ? লুসি কাঁদবে আপনার জন্য। কাঁদবে তার মেয়ে।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। সেটুকুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। যা বললাম তা আমার মুখের কথা। মনের কথা নয়।'

'আজ যদি এই দীর্ঘ নিরালা জীবনের শেষে ভাবেন যে কারুর ভালবাসা প্রেম পাইনি জীবনে, পাইনি কারুর শ্রদ্ধা-প্রীতি, কারুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে এতটুকু স্থান পাওয়ার মত কিছু করিনি, করিনি স্মরণযোগ্য কোন মঙ্গল কর্ম—তাহলে আপনার এই আটাত্তর বছর আটাত্তরটি অভিশাপের ভারা বোঝা হয়ে চেপে বসতো জীবনে। সত্যি নয়, বলুন ?'

'সত্যি বই কি।'

কার্টন অগ্নিশিখার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, কয়েক মিনিট নীরব বিরতির পর আবার বললেন—'শৈশবের দিনগুলির কথা কি মনে পড়ে না। যখন মায়ের কোলে মাথা রেখে তাঁর আদর খেতেন ? সে সব স্মৃতি কি সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ?'

লরির মনও দ্রবীভূত হল। স্নেহ-সজল নরম কণ্ঠে বললেন—'আজ থেকে কুড়ি বছর পেরিয়ে—না, না আরো অনেক কালের সেতু পেরিয়ে বহু মধুর স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। তারা সব ঘুমিয়ে আছে মনের পালঙ্কে। মনে পড়ছে মায়ের কথা—আরো অনেক সঙ্গী-সাথীর কথা যখন প্রবেশ করিনি সংসারের বিচিত্র রঙ্গভূমিতে। যখন আমার এত দোষও ধরা পড়েনি লোকের চোখে।'

'কিন্তু দোষের তুলনায় আপনি অনেক ভাল ছিলেন।'

'তা হয়ত ছিলাম।'

সর্বাঙ্গের অলসতা ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ আলাপের সূত্র ছিন্ন করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন কার্টন।

'কিন্তু তোমার এখন যুবা বয়স'—লরি পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসতে চেষ্টা করলেন।

'হ্যাঁ, এখনো আমি বুড়ো হয়ে পড়িনি। কিন্তু আমার তারুণ্যও আমার বয়সোচিত নয়। বাঁচার স্পৃহা আমার মিটে গেছে।'

'তুমি কি এখন বেরুবে?'

'লুসিদের বাড়ী পর্যন্ত যাবার ইচ্ছা আছে। জানেন ত আমার অস্থির স্বভাব! অনেক রাত পর্যন্ত যদি আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়াই ভয় পাবেন না যেন। আবার ঠিক দেখা হবে সকালে। কাল কোর্টে যাচ্ছেন ত?'

'তা যেতে হবে বই কি। কিন্তু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।'

'আমিও থাকব সেখানে জনারণ্যে মিশে। আমার স্পাই আমার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে রাখবে। হাত ধরুন আমার।'

কার্টনের হাত ধরলেন লরি, তার পর দু'জনে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে এলেন উঠোনে—উঠোন থেকে রাস্তায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন তারা। কার্টন তাকে বাড়ীর দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিয়েই চলে এলেন। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলেন না। একটু গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—দরজা বন্ধ হলে আবার ফিরে এলেন—স্পর্শ করলেন দরজায় যেখানে লুসি হাত রেখেছিল। শুনেছে, লুসি রোজই জেলখানায় যায়। এই পথ দিয়েই ত তার নিত্য যাওয়া-আসা। 'তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমিও যাব এই পথ ধরে।'

রাত দশটার সময় কার্টন জেলখানার সামনে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে লুসি নিত্য এসে দাঁড়ায়। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দোর-গোড়ায় বসে পাইপ টানছিল করাতী। কার্টন তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলেন।

শেষে লোকটাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে খানিক দূরে একটি স্তিমিত আলোর নীচে থেমে একটুকুরো কাগজে কি যেন লিখলেন পেনসিল দিয়ে। পথ-ঘাট যেমন অন্ধকার তেমনি অপরিচ্ছন্ন। সেই ময়লা জমা আলোহীন পথের অনেকখানি ঘুরে কার্টন এক ওষুধের দোকানের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। দোকানী তখন নিজের হাতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছিল।

কার্টন সেই চিরকুটটি দোকানীর সামনে খুলে ধরলেন।

'আপনার নিজের জন্যে ?'

'হ্যাঁ'—

'পুরিয়া দুটোকে আলাদা রাখবেন। মিশে গেলে কিন্তু মারাত্মক ফল দাঁড়াবে।'

'খুব জানি।'

দোকানী দুটো ছোট পুরিয়া দিল কার্টনের হাতে। কার্টন পুরিয়া দুটো কোটের পকেটে চালান করে, দাম মিটিয়ে দিয়ে দোকান ত্যাগ করলেন।

কালকের আগে আর কিছু করবার নেই। কিন্তু আজ আর চোখে কিছুতেই ঘুম আসবে না।

আকাশে মেঘের ভেলা ভাসছে। পৃথিবীর জনারণ্যে ঘুরে-ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত তাঁর মন বার বার পথ হারিয়ে ফেলেছে। আবার ফিরে পেয়েছে পথের নিশানা। এত দিনে বুঝি জানতে পেরেছে পথের শেষ কোথায়! বহুদূর-কাল যৌবনের দিনগুলির মধুময় স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। সেদিন তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল কত উজ্জ্বল—বহু সম্ভাবনা-পূর্ণ। প্রতিভাশালী বলে খ্যাতি ছিল বন্ধু-মহলে। এমন সময় বাবা মারা গেলেন। মা কয়েক বছর আগেই গতায়ু হয়েছিলেন। পিতার শেষ সৎকারের সময় পুরোহিত যে গুরু-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন আজও যেন তা স্পষ্ট

কানে বাজছে।—'আমিই জীবন—আমিই মৃত্যু। আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মৃত্যুর দ্বার পেরিয়ে সে অমর লোকে প্রতিষ্ঠিত হয।'

নীচে আলো-আঁধারির সতরঞ্চ পথ। উপরে আকাশে মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা।

উদ্যত কুঠারের নীচে প্রাণ-ভযে ভীত শহরের নির্জন পথে একাকী ঘুরতে ঘুরতে নিহত নিরীহ লোকগুলির জন্য এবং এখনও যারা অন্ধকার কারাকক্ষে পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, তাদের কথা মনে হতেই কার্টনের হৃদয ব্যথায টন-টন করে উঠল।

চারি দিকের এই মৃত্যু ও ভীতির রাজ্যে শুধু সামযিক ছেদ পড়েছে।

মুহূর্তের জন্য মানুষ সব ভুলে শান্তিময নিদ্রার কোলে আশ্রয নিযেছে। একটিও গাড়ী নেই পথে। চারিদিক নীরব নিঝুম। রাতের প্রহর গড়িযে চলেছে। এক সময বিবর্ণ বিশীর্ণ মৃত চাঁদ আর তারাগুলি নিয়ে রাতও নিঃশেষ হল।

পূর্ব-গগনে নবীন সূর্য সহস্র রশ্মিতে ভাস্বর হযে উঠল। কার্টন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী থেকে বহু দূরে নদীর ধারে এসে পড়েছেন। এক সময নদীর পাড়েই ঘুমিযে পড়লেন তিনি।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে যখন বাড়ী ফিরলেন, দেখলেন লরি ততক্ষণে বেরিযে পড়েছেন। কোথায গেছেন তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না কার্টনের। হাত-মুখ ধুযে সামান্য কিছু খেযে তিনিও পা বাড়ালেন আদালতের দিকে।

আদালত-প্রাঙ্গণ বহু পূর্বেই জনতার স্পন্দনে মুখরিত হযে উঠেছে। তারই এক কোণে আসন নিলেন কার্টন। দেখলেন, লরি ডাক্তার ম্যানেটের পাশে বসে আছেন। লুসিও এসেছে—বসেছে তার বাবার

পাশে। কিছু পরেই বন্দীকে আনা হল। সেই একই জুরী—একই বিচারকেরা।

আসামী দেশত্যাগী ফরাসী নাগরিক চার্লস ডার্নে। গতকাল মুক্তি পেয়েছিল কিন্তু পুনরভিযুক্ত করা হয়েছে। অত্যাচারী অভিজাত শ্রেণীর এক জন। প্রজাতন্ত্রের শত্রু।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন—'গোপনে না প্রকাশ্যে—কি ভাবে আসামীর বিচার হবে?'

'প্রকাশ্যে'—দাবী জানাল জনতা।

'অভিযোগকারীদের নাম?'

'আর্নেষ্ট ডিফার্জ। সাঁ আঁতোয়ার মদওয়ালা।'

'আর কেউ?'

'তার স্ত্রী মাদাম ডিফার্জ।'

'আর?'

'ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ম্যানেট।'

এ কথায় আদালতে তুমুল অট্টরোল উঠল। ডাক্তার ম্যানেট রক্তহীন পাংশুমুখে কাঁপতে লাগলেন। বললেন—'মহামান্য প্রেসিডেন্টকে আমি জানাচ্ছি এ জঘন্য মিথ্যা—জালিয়াতি। আপনি জানেন আসামী আমার মেয়ের স্বামী। আমার মেয়ে এবং তার প্রিয়জনেরা আমার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমার কাছে। আমি আমার মেয়ের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি এ কথা যে বলে, সে মিথ্যা ষড়যন্ত্রকারী কে? কোথায় সে?'

'বিচলিত হবেন না ডাক্তার। রাষ্ট্র যদি আপনার সন্তানের বলিদান চায় হাসিমুখেই তা মেনে নিতে হবে ডাক্তার।'

প্রেসিডেন্টের এই ভর্ৎসনায় জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। ডাক্তার ম্যানেট বসে পড়লেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। উদ্‌ভ্রান্তের

মত তিনি তাকালেন চারিদিকে। লুসি বাবার কাছে ঘেঁসে বসল।

প্রথমে ছ্যফর্জের জেরা সুরু হল। তার নিজের কারাবাসের কাহিনী। ডাক্তারের অধীনে সে কাজ করত যখন, তখন তার বালক বয়স। তার পর সে ডাক্তারের মুক্তি-কাহিনী, তাঁর মানসিক অবস্থার কথা একে একে বিবৃত করে যেতে লাগল।

'ব্যাষ্টিল জয় করতে ত আপনি খুবই সাহায্য করেছিলেন ?'

'তা কিছুটা করেছিলাম।'

'ব্যাষ্টিল অধিকারের পর কি কি দেখেছিলেন সেখানে ?'

ছ্যফর্জ স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে সুরু করল তার কাহিনী।

'বন্দী নর্থ টাওয়ারের একশ' পাঁচ নম্বর সেলে বন্দী ছিলেন। আমারই তত্ত্বাবধানে তিনি সেখানে জুতা সেলাই করতেন। ব্যাষ্টিল অধিকারের পর আমি সেই সেল পরীক্ষা করি। একজন বন্দীর সাহায্যে আমি সেই সেলে প্রবেশ করি। মাননীয় জুরীদের এক জন সেদিন সেখানে বন্দী ছিলেন। পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানের পর চিমনীর একটি গর্তে পাথর সরিয়ে একখানা দলিল খুঁজে পাই। এই সেই দলিল। ডাক্তার ম্যানেটের লেখা সেই দলিলটি আমি মহামান্য প্রেসিডেন্টের হাতে সমর্পণ করছি।'

'দলিল পড়া হোক'—আওয়াজ তুলল জনতা।

আদালত ঘরে নামল নিস্তব্ধতা। বন্দী মমতা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর দিকে। লুসি দিশেহারা চোখে চেয়ে আছে বাপের মুখের দিকে। ডাক্তারের দৃষ্টি পাঠকের উপর স্থির নিবদ্ধ। আর জনতা উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। সুরু হল দলিল পড়া।

১০

—'ব্যাষ্টিল দুর্গের নির্জন কারাকক্ষে বন্দী আমি ডাক্তার ম্যানেট। এই দলিলটি লিখে রাখছি সবার অলক্ষ্যে। কেউ জানতে পারেনি—কেউ জানতে পারবে না এমন ভাবে একে আমি লুকিয়ে রাখব। এই ঘরের চিমনীর দেয়ালে একটি নিরাপদ গহ্বর তৈরী করেছি, তার মধ্যেই এটিকে আমি সযত্নে লুকিয়ে রাখব। কোন দিন কোন দয়ালু লোক হয়ত এটিকে আবিষ্কার করবে। তখন লোকে জানতে পারবে আমার দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা, আমার অত্যাচার নির্যাতনের কথা। কিন্তু সেদিন হয়ত আমি থাকব না।

চিমনীর ঝুলের সঙ্গে গায়ের রক্ত মিশিয়ে কালি তৈরী করেছি। মরচে-ধরা লোহার সূচীমুখ সেই রক্তমাথা কালিতে ডুবিয়ে আমি লিখছি আমার কথা। আমার আশাহীন আনন্দহীন বন্দি-জীবনের চরম অবমানণার কথা। শরীর আমার ভাল নেই। যে ভাবে চলেছে তাতে অধিক দিন আর আমার মস্তিস্ক সুস্থ থাকবে না। কিন্তু আজ এই এখন যা লিখছি তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অসংলগ্নতা নেই—মিথ্যা বানানো কিছু নেই। আমার এই সব কথা এক দিন দরবারে আমায় পেশ করতেই হবে—সে মানুষের আদালতেই হোক আর ভগবানের বিচার-সভাতেই হোক।

সতেরশ' সাতান্ন সালের ডিসেম্বর মাসে এক মেঘলা রাতে সেইন নদীর ধারে একলা বেড়াচ্ছিলাম। শীতে কুয়াশায় রাত নিঝুম।

এমন সময় দুরন্ত বেগে একখানা গাড়ী আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। চাপা পড়ার ভয়ে আমি ত্রস্ত পায়ে সরে দাঁড়ালাম। আর সেই

মুহূর্তে শুনলাম ছুটন্ত গাড়ার জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন আরোহী গাড়োয়ানকে হুকুম দিলে গাড়ী রুখতে।

গাড়ী থামতেই কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলে। সাড়া দিয়ে যেতে যেতে গাড়ীর আরোহীরা ততক্ষণে পথে নেমে পড়েছে। দুটি লোক আপাদমস্তক ভারী পোষাকে ঢেকে আমার দু'পাশে সম্ভ্রম ভরে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখলাম দু'জনকে আশ্চর্য এক রকম দেখতে। দু'জনেই প্রায় আমার সমবয়সী।

'আপনি ডাক্তার ম্যানেট ?'

'কি প্রয়োজন বলুন।'

'আপনার বাসার গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি নদীর ধারে বেড়াতে এসেছেন। সেই আশায় এত দূর অবধি গাড়ী ছুটিয়ে আসছি। দয়া করে গাড়ীতে উঠুন।'

গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি। দুটি সবল যুবা আমার দু'পাশে। দু'জনেই সশস্ত্র। আমি অসহায় অস্ত্রহীন। শীতের রাত্রি নির্জন।

'কিন্তু কি প্রয়োজন বলুন আগে। কি রোগ, রোগীর অবস্থা কেমন, সে-সব না জেনে আমার যাওয়ার অর্থ হয় না।'

'দক্ষিণার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না ডাক্তার। আপনার পারিশ্রমিক যথোচিত পাবেন। আর রোগী—সে আপনি স্বচক্ষে দেখেই যা হয় ব্যবস্থা করবেন। আপনার মত খ্যাতনামা ডাক্তারকে রোগ সম্বন্ধে আমরা কি উপদেশ দেব। চলুন ডাক্তার—দেরী করবেন না।'

নিরুপায় হয়ে আমি গাড়ীতে উঠলাম। উল্কা বেগে গাড়ী ছুটল। প্যারিসের সীমানা পেরিয়ে গ্রামপথে বাজতে লাগল চাকার ঘর্ঘর। কত পথ পার হল গাড়ী, তা ঠাহর হল না ঠিক। এক সময় নির্জন পথের পাশে একটা বাগানবাড়ীর গেটে থামল আমাদের গাড়ী। আমার

সঙ্গীরা নেমে সদরে ঘণ্টাধ্বনি করল। কিন্তু দরজা খুলতে দেরী হল অনেক। যে লোকটা দরজা খুলে দাঁড়াল তার মুখে ঘুঁষি মারল এক জন প্রচণ্ডবেগে, তার পর আমায় নিয়ে দু'জনে বাগানবাড়ীর অন্দরে পা বাড়াল।

আশ্চর্য হবার মত কিছু নয়। বাড়ীর লোকজনদের কুকুর-বেড়ালের মত মারধোর করাটা বড়লোকদের বাড়ীর নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগল এই দু'জনের চেহারা দেখে। এক রকম মুখ-চোখ সর্বাঙ্গ। এরা দুটি যমজ ভাই বলেই আমার সন্দেহ হল।

বাড়ীর ভিতর পা দেওয়া মাত্রই একটি আর্ত কান্না-মেশান গোঙানি আমার কানে এসেছিল। সিঁড়ি ভেঙে আমরা যত ওপরে উঠতে লাগলাম সে-আওয়াজ বেশী করে কানে বাজতে লাগল। গিয়ে দেখলাম প্রচণ্ড জ্বরের তাড়সে অস্থির একটি মেয়েকে।

সদ্য-ফোটা যেন একটি ফুল। কুড়ি বছরও বয়স হয়নি, বোধ হয়। দুটি হাত দু'পাশে বিছানার সঙ্গে বাঁধা। মাথার চুল বিপর্যস্ত ছিন্ন। রোগের পাণ্ডুরতায় সেই সুন্দর মুখে একটা অপার্থিব প্রভা থর-থর করে কাঁপছে।

অস্থির আক্রোশে মেয়েটি বিছানার ধারে মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছিল। আমি তাকে সযত্নে তুলে শোয়ালাম। তার পর তার বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে বসলাম।

সারা মুখের মধ্যে দুটি চোখের দৃষ্টিতেই যেন প্রাণ ধক-ধক করে জ্বলছে। সে চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নয়। উন্মত্ততার প্রান্তে মানুষের চোখে যে বিস্ফারিত বিভ্রান্তি দেখা যায়—সেই উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি সুন্দরী মেয়েটির চোখে দেখে আমি নিজেও কেমন যেন অবাক হলাম।

এক-এক বার আর্ত চীৎকার করে উঠছে মেয়েটি—'বাবা—

আমার বাবা—আমার স্বামী—আমার স্বামী—আমার আদরের ভাই।' এক-দুই করে বারো অবধি গুণছে আপন-মনে। তার পর চুপটি করে যেন কি শুনছে। সাড়া না পেয়ে আবার সেই কান্না-ভাঙা চীৎকার—'বাবা—আমার বাবা—আমার স্বামী—আমার আদরের ভাই।' তার পর আবার সেই এক-দুই-তিন করে বারো অবধি বার বার গোনা। আবার সেই নিঃসাড়ে পড়ে কান পেতে শোনা। রোগীর পাশে বসে একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে লাগলাম।

'কখন থেকে এ রকম করছে?'

'কাল রাত এই সময় বরাবর সুরু হয়েছে।'

'মেয়েটির বাপ ভাই স্বামী—তারা সব এখানে আছে?'

'না, একটি ভাই আছে শুধু।'

'তার সঙ্গে কথা কইতে চাই আমি।'

পরম ঘৃণা ভরে উত্তর দিল এক ভাই—'সে হবে না।'

'তা হোক। কিন্তু এক-দুই করে বারো অবধি গোনার অর্থ কি? বারোর রহস্যটা কি?'

'বারো নয়—রাত বারোটা বলতে পারেন।'

তাদের আগ্রহহীন প্রত্যুত্তরে আমি নিরাশ হলাম। বললাম—'দেখুন, এই ভাবে নিরুপায়ের মত এখানে বসে আমি রোগিণীর রোগের কোন উপশম করতে পারব না। আমি নিজেও প্রস্তুত হয়ে আসিনি—এই নির্জন জায়গায় ওষুধপত্র পাওয়ারও কোন সুবিধা নেই। আমাকে ত একবার বাসায় ফিরতেই হবে।'

'কোন অসুবিধা হবে না আপনার'—বলে বড় ভাই আলমারী থেকে একটি বড় ওষুধের বাক্স এনে রাখলে আমার সামনে—'প্রয়োজন মত ওষুধ আশা করি এরই মধ্যে পাবেন।'

সেগুলি নিয়ে আমি ঘ্রাণে বর্ণে পরীক্ষা করছি দেখে ছোট ভাই

দর্পভরে বললে—'আমাদের কি আপনি সন্দেহ করেন ডাক্তার ম্যানেট ?'

'কিছু মাত্র নয়'—বলে আমি নিজের পরীক্ষা শেষ করে রোগিণীর মুখে এক মাত্রা ওষুধ ঢেলে দিলাম। তার পর তার বুকে হাত রেখে তেমনি ভাবেই বসে রইলাম।

রোগিণীর সেই আর্ত-কান্না আর শব্দের পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল। কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড যে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক লয়ে ফিরে আসছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। গভীর আগ্রহে আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। অব্যক্ত যন্ত্রণাকাতর সেই পাণ্ডুর মুখে একটা স্বস্তির ভাব ফিরে আসছে দেখে আমি নিজেও অনেকখানি আশ্বস্ত বোধ করলাম।

আধ ঘণ্টা এমনি ভাবে তার শয্যা পার্শ্বে কাটল। দুই ভাই ঠায় সাক্ষী হলে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে। মেয়েটির কষ্টের কিছুটা আরাম হয়েছে দেখে বড় ভাই আমায় বললে—'আরো একটি রোগী আপনাকে দেখতে হবে ডাক্তার।'

শুনে চমকিত হয়েছিলাম, এ স্বীকার করতে লজ্জা নেই।—'সেও কি জরুরী কেস নাকি ?'

'চলুন দেখবেন'—বলে আলো দেখিয়ে আমায় নিয়ে গেল সে।

'আরও একটি সিঁড়ি পার হয়ে বাড়ীর পিছন দিকে আস্তাবলেব ওপরে একটি টালির ঘরে আমায নিয়ে গেল সে। আজ দশ বছর এই জেলখানায় নির্জনে কাল কাটাচ্ছি। কিন্তু সে দৃশ্যের কোন সামান্য খুঁটিনাটি অবধি আমি ভুলিনি। ঘর-আসবাব-মানুষ কিছুরই বিস্মরণ হয়নি আমার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি সে-ছবি এঁকে দিতে পারি আমার এই বর্ণনায়। খড়ের গাদার ওপর একটি বছর সতের বয়সের ফুটফুটে ছেলে দাঁতে দাঁত চেপে ডান হাতে বুক ধরে মাথা উপরে বাঁকিযে

উপুড় হয়ে শুয়েছিল। দুটি চোখ তার জ্বল-জ্বল করছিল তামসী রাতের এক জোড়া নক্ষত্রের মত।

কোথায় তার ক্ষত দেখার জন্যে আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম তার পাশে। তীক্ষ্ণ কোন অস্ত্রের আঘাতে সে মরতে বসেছে তা তার চোখের স্থির তারকায় আর দৃঢ়বদ্ধ অধরোষ্ঠের চাপা কাতরতায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি।

'ভয় কি। আমি ডাক্তার। আমায় দেখতে দাও তোমার ক্ষত।'

'কোন দরকার নেই আমার ডাক্তারের।'

তবু আমি তাকে দেখলাম। অন্ততঃ বিশ ঘণ্টার বেশী এই ভাবে সে পড়ে আছে তীক্ষ্ণ তরবারিতে বিদ্ধ হয়ে। ক্ষতের মুখে শুধু হাত চাপা দিয়ে। তার সেই সুন্দর শরীর থেকে রক্তের সঙ্গে মাটীতে ঝরে পড়ছে প্রাণ-রস। জীবনের ধারা শুষ্ক শীর্ণ হয়ে এসেছে। এখন শুধু মুকুল ঝরে পড়ার অপেক্ষা!

সেই অবস্থায় তাকে দেখে আমার কেমন মনে হতে লাগল এ কোন মানুষ নয়। মানুষের সমাজের বাইরে এ বুঝি কোন জানোয়ারের রাজ্য। কোন গভীর অরণ্যে একটা আহত পশু কি পাখীকে বুঝি এর চেয়ে অসহায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয় না।

'কি হয়েছিল?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমি তাকালাম বড় ভাইয়ের দিকে।

'পথের নোংরা কুকুরটা আমার ভায়ের সঙ্গে বিবাদ করতে এসেছিল। তাই মুগুরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে।'

সে উত্তরে আহত প্রাণীর প্রতি কোন করুণা মমতার লেশ নেই। এই ভাবে তাদের বাগান-বাড়ীতে মরবে এ জন্যে যেন কত বিরক্ত ভাব তার। পথের কুকুর পথেই মরবে। তাদের জ্বালাতে এসেছে মিছিমিছি, এমনই তাচ্ছিল্য তার কণ্ঠে।

'একবার চকিতে তার দিকে তাকিয়েই ছেলেটি চোখ ফিরিয়ে

নিলে। আমার দিকে ফিরে বললে—'ডাক্তার! ওরা জমিদার বড়লোক—বনেদী ঘর। ওদের দেমাকের অবধি নেই। আমরা পথের শেয়াল-কুকুর—আমাদের শরীরেও ভগবান রক্ত-মাংস দিয়েছেন। যত খুশী অত্যাচার অনাচার করুক ওরা—পিষে মেরে ফেলুক যত বার, তবু গরীবের গর্ব ওরা ভাঙতে পারবে না। সে গর্ব মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দেবেই—আমার দিদি—আমাব দিদিকে আপনি দেখেছেন ডাক্তার বাবু?'

এতক্ষণে সেই আর্ত চীৎকার আর কান্না আমার মনে পড়ল। এখান থেকেও সেই চাপা আর্তনাদ কানে আসছিল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ দেখেছি ভাই।'

ঐ ওরা ভাবে যে পৃথিবীতে সব মেয়েই বুঝি ওদের ভোগ্য। অনেক মেয়েও তেমনি পায় ওরা। কিন্তু সব মেয়ে সমান নয়—ডাক্তার! আমার দিদির মত ভাল মেয়েও সংসারে ছিল। ভাল একটি পাত্রে বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেও আমাদের মত ওদের প্রজা। ঐ দুই ভায়ের। কিন্তু ওরা —' কথা কইতে তার অমানুবিক কষ্ট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথায় যেন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে ছেলেটি।

'ঐ ওরা, ওরা আমাদের শুষে নিচ্ছে কত কাল ধরে। খাজনা নিচ্ছে জোঁকের মত, মজুরী না দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে পশুর মত, মানুষেব মত বাঁচা ভুলিয়ে দিচ্ছে। বাবা কি বলেন জানেন ডাক্তার বাবু?—বলেন আর নয়—আর যেন গরীবের ঘরে ছেলে-মেয়ে না জন্মায়। এ পৃথিবী গরীবের নয়। গরীবের বংশ সব নির্বংশ হয়ে যাক।

দিদির আমার বিয়ে হল। কিন্তু কিছু দিন পরেই খুব শরীব খারাপ হল আমার ভগ্নীপতির। এই সময় ঐ ছোট কর্তার কুনজর পড়ল আমার দিদির ওপর। কত ছলে-কৌশলে ছোট কর্তা তাকে

বাগান-বাড়ীতে আনতে চাইলে। কিন্তু আমার দিদি বাঁ পায়ে সে সব ঠেলে ফেলে দিলে। তখন ঐ নারকী কি করলে জানেন? অত্যাচার করে করে মেরে ফেললে আমার ভগ্নীপতিকে। তারপর জোর করে ধরে নিয়ে গেল আমার দিদিকে।

বাড়ী ফেরার পথে দেখলাম দিদিকে নিয়ে পালাচ্ছে বড়লোক ঐ জমিদার ডাকাত। বাবাকে খবর দিতে তিনি সেই যে বুক চাপড়ে চুপ করে গেলেন আর কথা কইতে পারলেন না। তখন আমার ছোট বোনটিকে নিয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এ শয়তানের এলাকার বাইরে তাকে আমি লুকিয়ে রেখে দিয়ে এসেছি।

খুঁজে খুঁজে কাল রাতে আমি এই বাড়ীতে এসে ঢুকি। হাতে তরোয়াল নিয়ে জানালা টপকে আমি ভিতরে লাফিয়ে পড়ি। ছোট কর্তাকে আমি খুন করতে এসেছিলাম। ও আমার ফুলের মত নিষ্পাপ দিদিকে নষ্ট করে দিয়েছে—ওকে আমি খুন করতে এসেছিলাম। গরীবের অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি পারিনি ডাক্তার বাবু—এই আমার বুকে সে বিঁধিয়ে দিয়েছে·· কিন্তু সে কোথায়?'

ইতস্ততঃ খুঁজে দেখলে ছেলেটি তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে। তার পর পরম ঘৃণাভরে বললে—'সহ্য করতে পারে না—ওরা আমাদের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। পথের কুকুরের ভ্রূকুটিতে ওদের কাপুরুষ আত্মা শিউরে ওঠে। তাই টাকা দিয়ে সব কিছুর মুখ বন্ধ করতে চায়। আমাদেরও চেয়েছিল। কিন্তু এই আমার বুকের রক্ত ক্রশ করে দিচ্ছি ডাক্তার—একদিন এই রক্তের শপথে ওদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে—এক দিন এই সব অনাচারের শাস্তি ওদের মাথায় বাজের মত ভেঙে পড়বে। সেদিন ওদের নিস্তার থাকবে না। সেদিন এলো বলে।'

বুকে ঠেকিয়ে রক্তাক্ত আঙুলে শূন্যে দু'বার ক্রশ করলে ছেলেটি।

তারপর ক্লান্তিতে টলে পড়ল তার শরীর আমার দু'হাতের ওপর। টলে পড়ল—আর উঠল না।

ক্লান্ত পা টেনে আবার সেই মেয়েটির শয্যাপার্শ্বে এসে বসলাম। সেই একই রকম ব্যবস্থা চলেছে তার। সেই এক কথা, সেই এক চীৎকার—একই রকম নিঃশব্দে কান পেতে শোনা। এ কষ্ট আরো অনেক প্রহর সহ্য করতে হবে মেয়েটিকে, তবে মাটির নীচে গিয়ে শান্তি পাবে অভাগিনী!

আর একবার ওষুধ খাইয়ে প্রতীক্ষা করে বসে রইলাম। রাত গভীর হতে লাগল। এখানে প্রথম আসার পর ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার শুধু বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলাম আমি, নইলে সর্বক্ষণই আমার কাটল তার পাশে। ধীরে ধীরে তার জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়ে এল। গলার স্বর হল স্তিমিত—সর্বাঙ্গ বিবশ। সেই বিলম্বিত বিভীষিকাময় যন্ত্রণার অবসানে শিথিল দেহ তার লুটিয়ে পড়ল শান্ত মূর্ছায়। তখন আমার কাজ ফুরোল।

ঘরের আর একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে সেই সংজ্ঞাহীন দেহলতা আমি সযত্নে শয্যায় শুইয়ে দিলাম। আর সেই প্রথম আমি জানলাম যে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা।

'মরেছে?'—রোগিণীর অবস্থা দেখে বড় ভাই আমায় প্রশ্ন করতে শান্ত কণ্ঠে বললাম—'এখনো মরেনি—তবে মরবে বটে।'

'যোঝবার কি আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছে ভগবান এই সব ছোটলোকদের।'

'তার চোখের অগাধ বিস্ময় দেখে বললাম—'দুঃখে দুঃখে ওরা পাথর হয়ে যায় কিনা—তাই।'

একবার চকিত অবজ্ঞার হাসি ফুটল সেই মুখে। আবার তখুনি সেই হাসি কুটিল ভ্রূকুটিতে বদলে গেল।

'ভাই আমার নিতান্ত বিপদে পড়েছে বলেই আপনার শরণাপন্ন হতে হল ডাক্তার। আপনি বয়সে তরুণ—আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে যে এ দু'দিনে যা দেখলেন শুনলেন, তা মনে মনে রাখলেই ভাল করবেন।'

আমি সন্তর্পণে রোগিণীর লঘু নিঃশ্বাস পতন শোনার চেষ্টা করছি দেখে বিরক্ত কণ্ঠে সে বললে—'আমার কথাগুলো কি ডাক্তারের কানে গেল না?'

'মনে রাখবেন মঁসিয়ে আমি ডাক্তার। ডাক্তারের ইতি-কর্তব্য কতটুকু তা আমায় স্মরণ করিয়ে না দিলেও চলবে।'

আরো সাত দিন জীবন-মৃত্যুর জোয়ার ভাঁটায় জীবন-তরণী দোল খেল। তার পর মৃত্যুর সমুদ্রোচ্ছ্বাসে এক অন্ধকার রাত্রে অজানা গভীরতায় হারিয়ে গেল হতভাগিনী।

'নীচু তলার ঘরে দুই ভাই অপেক্ষা করছিল। আমায় দেখে সাগ্রহে বললে—'মরেছে?'

'আর সন্দেহ নেই।'

ভাঁয়ের দিকে তাকিয়ে বড় বললে—'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে ভাই এত দিনে।'

এর আগেই দু'জনে আমাকে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিল কিন্তু নেবো নেবো করে আমি ফেলে রেখেছিলাম। এখন আমার হাতে সোনা গুঁজে দিলে তারা। এই সবের পর আর টাকা নেবার ইচ্ছা ছিল না আমার। টেবিলের ওপর সেটি রেখে দিয়ে দুই ভাইকে অভিবাদন জানিয়ে আমি নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে এলাম সে রাত্রে।

কী যে ক্লান্তি লাগছে লিখতে। বড়ো কষ্ট হচ্ছে মনের ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে সেই পুরানো তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু লিখে আমায় রেখে যেতেই হবে।

পরের দিন ভোরে আমার দ্বারপ্রান্তে ছোট একটা বাক্সের মধ্যে সেই সোনা আমি পড়ে থাকতে দেখলাম। এই শোচনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মুহূর্ত থেকেই আমার মধ্যে একটা তীব্র বাসনা জেগেছিল যে এই কদিনের ঘটনা আমি গোপনে মন্ত্রিদপ্তরে পেশ করব। রাজ-দরবারে অভিজাত জমিদারদের প্রতিপত্তির কথা জানতে আমার বাকি ছিল না—তাদের গায়ে যে রাজ-রোষ লাগবে না তা জেনেই আমি মন স্থির করেছিলাম। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এই হত্যা ও মৃত্যুর কাহিনী নিবেদন করে আমি দায়মুক্ত হব ভেবে স্ত্রীর কাছে অবধি এ-সব কথা গোপন করেছিলাম। নিজের দিক থেকে কোন বিপদের ভাবনাই আমার ছিল না।

পরের দিন আমার নানা জরুরী কাজে কাটল। ভোরের বেলা উঠে মন্ত্রিদপ্তরের উদ্দিষ্ট চিঠিখানা সবে লিখে শেষ করেছি এমন সময় একটি অপরূপ তরুণী আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হয়ে উপস্থিত হলেন।

অত্যন্ত বিচলিত ভাবে এসেছেন দেখে সাগ্রহে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, তিনিই আত্ম-পরিচয় দিলেন। মারকুইস এভারমঁদির স্ত্রী। সর্বাঙ্গের আবরণে আভরণে জমিদার-বধূর সম্ভ্রম জাজ্বল্যমান।

নামটি শুনেই চিনতে বিলম্ব হল না আমার। বড় ভাই যেটি, মহিলা তারই পত্নী। তাদের পারিবারিক সুনাম ও কল্যাণ বিঘ্নিত খণ্ডিত হচ্ছে দেখে এবং আমি ডাক্তার হিসাবে সে সব কথা জানি বলে নারীজাতির স্বভাবসুলভ মমতায় চাষী-বৌয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে ছুটে এসেছে জমিদার-বধূ। তার সঙ্গে আমার আলাপের সব খুঁটিনাটি আজ বিস্মরণ হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামী ও দেবরের লুব্ধ দৃষ্টিতে পড়ে একটি নিষ্পাপ দরিদ্র বধূ যে অপরিসীম নির্যাতন ও লজ্জা ভোগ করেছে তার জন্যে তার চিত্তে শান্তি নেই। যে কোন ভাবে গোপনে এ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চায় সে—মুক্তি দিতে চায়। তা নইলে একটি হতভাগিনীর নিরুপায়

অভিশাপে তার সুখের সংসারে আগুন লাগবে। একেই ত বহু কাল ধরে এই পরিবারের পাপের বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে, তার উপর বিধাতার অভিশাপ লাগলে আর কি নিস্তার থাকবে ?

ভারী স্নেহময়ী মিষ্টি মেয়েটি। কিন্তু কি বিধাতার লিখন, অমন মেয়েও বিবাহে সুখী হল না। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা-স্নেহ লেশমাত্র নেই। আপন সংসারে প্রতিষ্ঠা পায়নি বধূ। সকলকে ভয়ই করতে হয় তাকে।

সদর অবধি তাকে পৌঁছে দিতে এলাম। গাড়ীতে বছর দুই-তিনের একটি ছেলে বসেছিল। তাকে দেখিয়ে বললে সে—'এই এর জন্যে আমি সকলের ঋণ পরিশোধ করে দিতে চাই ডাক্তার বাবু। তা যদি না করি ওর জীবনেও শান্তি-সুখ আসবে না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি আমরা না করে যাই, কি যেন আমার মায়ের মনে ভয় হয় যে এক দিন রুদ্র নিয়তি ওর কাছে হয়ত প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে নেবে, ওর জীবনে অভিশাপ লাগবে। যেমন করে হোক আপনি সেই অভাগিনীর বোনের খবর এনে দিন। তাকে সুখী করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।'

ছেলেটিকে আদর করে মা গদগদ কণ্ঠে বললে—'তোর জন্যে রে চার্লস ! তুই আমার ভাল ছেলে হবি ত বাবা ?'

'হব মা'—সেই আধ-মিষ্টি কথা কি যে মধু বর্ষণ করল আমার কানে। মায়ের মুখও হাসিতে ভরে উঠল। ছেলেকে কোলে করে আদর করতে করতে দুই জনে চলে গেল।

আর আমি তাকে কখনো দেখিনি।

পাছে যথাস্থানে না পৌঁছয় এই ভয়ে আমি স্বহস্তে চিঠিখানি দিয়ে এলাম। দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

সেই রাত্রে উপরের ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছি, আজ তার কথা

লিখতে চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে—আমার চাকর ত্যফর্জ এসে জানাল যে একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ত্যফর্জের পিছনে যে লোকটি এসে দাঁড়াল, সর্বাঙ্গ তার রাত্রির অন্ধকারের মত কালো পোষাকে ঢাকা। বললে—'বড় জরুরী কেস ডাক্তার বাবু। আপনার দেরী হবে না, সদরে গাড়ী এনেছি।'

বাড়ী থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে কে যেন মাফলার দিয়ে অতর্কিতে আমার মুখ বন্ধ করে দিলে। হাত বেঁধে ফেলল পিছনে। পথের অন্ধকার কোণে এতক্ষণ সেই দুই ভাই দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে হাতের ইংগিতে দেখিয়ে দিলে আমায়। তার পর আমার সেই চিঠিখানি বের করে আমায় দেখাল এক জন। দেশলাই জ্বালিয়ে সেই চিঠি পুড়িয়ে ঘৃণাভরে পা দিয়ে ছাই মাড়িয়ে আর এক অন্ধকারে সরে গেল।

কোন কথা নয়—সাড়া নয়। নিঃশব্দে ওরা আমায় এইখানে এনে ফেললে। জীবন্ত মৃত্যুর গুহায় বন্দী করে রেখে দিয়ে গেল।

শুধু একবার, শুধু একটি বারের জন্যে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর সংবাদের জন্যে আকুলি-বিকুলি করে মরেছি। মাথা কুটেছি কারাগারের নির্জন পাথরের দেয়ালে। ভগবান আমায় নয় শাস্তি দিলেন, তার জন্যে তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করব না। কিন্তু অত্যাচারী দুই ভাইয়ের কথা ভাবি। তাদের ঘরেও ত স্ত্রী-পুত্র আছে। তবে দয়া-মায়া তাদের শরীরে নেই কেন? কেন আমার স্ত্রীর একটি খবর তারা আনতে দেয়নি? তবে কি সে অভাগিনী আর বেঁচে নেই।

এ কষ্ট আর সহ্য হয় না ভগবান। তোমার পৃথিবীতে যারা গরীবের ওপর এত অত্যাচার করছে তুমি তাদের কসুর মাপ করো না ভগবান! তোমার রুদ্র অভিশাপে তাদের বংশে আগুন লাগুক। আমি ডাক্তার ম্যানেট—মানুষের কাছে—দেবতার কাছে এই প্রার্থনা রেখে গেলাম—

এই রইল আমার মিনতি। চরম শাস্তিতে তাদের প্রায়শ্চিত্ত হোক।'

এ দলিল পাঠে আদালতে যেন অপ্রত্যাশিত বজ্রপাত হল। যে গভীর মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ, তা শুনে সমবেত জনতার কণ্ঠে বাক্‌রোধ হয়ে এল। ডাক্তার ম্যানেট বিভ্রান্তের মত মুখে মুখে চেয়ে দেখতে লাগলেন। নিষ্ঠুর দ্যফর্জ এই জন্য বুঝি এতদিন গোপন করে রেখেছিল এই দলিল?

অবশেষে ডাক্তারকে সম্বোধন করে প্রেসিডেণ্ট বললেন, জাতীয়তার পবিত্র বেদীমূলে ঐ জমিদার-নন্দনকে বলি দিয়ে মাতৃভূমির চরম সেবা করার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার নিজের জীবন ধন্য করুন। আপন কন্যার বৈধব্যের দুঃখ দেশপ্রেমের অগ্নিতে সহিষ্ণু হয়ে উঠুক ডাক্তারের মনে। শুনে জনতা সোল্লাসে গর্জন করে উঠল।

'এই বার ডাক্তার বাঁচান ঐ নরকের কীটকে। নিজের জামাইকে।' তিক্ত কণ্ঠে বললে মাদাম দ্যফর্জ তার সঙ্গিনীর কানে।

এক জন জুরী উঠে মৃত্যুর রায় দিতেই সমগ্র আদালত পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করে উঠল। তার পর মুহুর্মুহু সেই কলরোল তরঙ্গে তরঙ্গে বিদীর্ণ হতে লাগল।

মৃত্যু! জনতার রায়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার্লস ডার্ণের শিরশ্ছেদ হবে গিলোটিনের তলায়।

প্রহরীরা বন্দীকে টেনে নিয়ে গেল কারাগারে।

১১

রায় দেবার পর বিচারক-মণ্ডলী কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। সেই সঙ্গে জনশূন্য আদালতে একটা ব্যাপ্তিহীন শূন্যতা মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইল।

গিলোটিনে স্বামীর মৃত্যু দণ্ডাদেশ শোনার পরেই লুসির সর্বাঙ্গ বিবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে শুনতে পেল না কেউ। অন্তরের নিভৃত অন্তঃস্থলে একটি পরম বাণী যেন তাকে উদ্বুদ্ধ করে রাখলে। এ বেদনার মধ্যে, সর্বনাশা বিপাকের মধ্যে তাকে মাথা তুলে রাখতেই হবে। অপার ধৈর্য দিয়ে পরাভূত করতেই হবে সকল পরাজয়কে।

তবু ঘর একটু নিরিবিলি হতেই বেদনাবিদ্ধা বিহগীর মত স্বামীর প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠল লুসি।

'একটি বার যদি ছুঁতে পারি ওঁকে। একটি বার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। ওগো তোমরা একটিবার দয়া কর আমায়—।'

লুসির কণ্ঠের মিনতিতে পাষাণ গলে গেল। বরসাদ বাকী কজনকে বল্লে—'দাও না অভাগিনীর সাধ মিটিযে। শেষবার ত'।'

বন্দীর ডেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল লুসি। দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে ডার্ণে তাকে স্পর্শ করল। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বল্লে—'দুঃখ কোরোনা লুসি। আমায হাসিমুখে বিদায় দাও। শান্তিময়ের রাজত্বে আবার আমাদের চির মিলন হবে।'

কান্নায় ভিজে এসেছিল গলা তবু স্বামীর দিকে নিমেষহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লুসি। বল্লে—'এ বিচ্ছেদ দুদিনের। আমিও আসছি প্রিয়তম—আমিও আসছি তোমার কাছে।'

এই শোকের মধ্যে ডাক্তারের দিকে তাকানো যায় না। প্রাণাধিকা কন্যার আসন্ন বৈধব্যের সম্ভাবনায় বৃদ্ধের সর্ব শরীর এলিয়ে আসছিল। মাথার শুভ্র বিপর্যস্ত চুলের ভিতর দিয়ে বিশীর্ণ আঙ্গুলগুলি দিয়ে তিনি যেন হৃৎপিণ্ডটিকেই টেনে নিঙড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিলেন।

একটু পরেই জেলারের পিছুপিছু অদৃশ্য হয়ে গেল ডার্ণে কারান্তরালে। তখন অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন কার্টন। তার দুটি চক্ষুতে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। কি একটা অনির্বচনীয় বিজয়ের গোপন উচ্ছ্বাসে দুটি চক্ষু উজ্জ্বল, দেখলেন লরি।

'অনুমতি করেন ত লুসিকে আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসতে পারি। ওর ভার আর কোনদিন আমি বইতে পাব না।'

মূর্চ্ছিতা লুসির গায়ে হাত দিতেই আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগল তার হাত। তার পাশে বসলেন ডাক্তার আর লরি। ড্রাইভারের পাশে বসলেন কার্টন।

বাড়ীর গেটে আর একবার হাতের পালঙ্কে তুলে নিলেন কার্টন। অন্ধকার সদর পথে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাল লাগল, এই পাথরের উপর দিয়ে এই মেয়েটি কত বার আসা-যাওয়া করেছে।

উপরে কোমল শয্যায় তাকে সযত্নে শুইয়ে দিলেন কার্টন। ছোট লুসি তাকে দেখে ছুটে এল। কান্নাভরা খুসী কণ্ঠে বললে—'আপনি এসেছেন মিঃ কার্টন। বাঁচলাম আমরা। আপনি আমার মাকে কাঁদতে দেবেন না।'

কার্টন তাকে কোলে তুলে নিলেন। পরম আদরে আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে কানে কানে বললেন—'ভয় কি মা! তুমি যাতে খুসী হও তাই হবে।'

সে কথার গভীর অর্থ বুঝলে না ছোট লুসি, কিন্তু সেই আশ্বাসে তার কচি মুখ আনন্দে ভরে উঠল।

পথের অন্ধকার কোণে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কার্টন। চিত্ত-প্রদীপের আলোয় দেখতে চাইলেন আগামী দু'-এক দিনে তার জীবনে কি অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটবে। কী এক অনিবার্যতার দিকে ছুটে চলেছেন তিনি সানন্দে, সাগ্রহে।

তবে তাই হোক ভাবলেন কার্টন। ওরা জানুক যে এই সহরেই আমার মত একজন লোক বাস করছে এই দুর্যোগ কালে।

কৃত সংকল্প হয়ে কার্টন সেণ্ট আঁতোয়ারের দিকে পা বাড়ালেন। দ্যফর্জের মদের দোকানে গিয়ে উঠবেন তিনি। সেই যথার্থ স্থান।

গতকাল রাত্রি থেকে এক প্রকার নিরাহারেই আছেন তিনি। তার মত সুরাসক্ত লোকও কাল রাত থেকে প্রায় মদ্য পান করেননি। এ ভালই হল, ছন্নছাড়া জীবনের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়ে কোন আচ্ছন্ন ভাব নেই তার চেতনলোকে।

পথের পাশের একটি দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সযত্নে বেশ-বাস ও বিপর্যস্ত কেশ বিন্যস্ত করে নিলেন কার্টন। তার পর আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করলেন দ্য ফর্জের মদের দোকানে।

মাদাম ও দ্যফর্জ ভিন্ন আর যে একটি রমণী কাউণ্টারের পাশে গল্প করছিল সে তাদের বিপ্লবসঙ্গিনী। অন্য খরিদ্দার ছিল না কেউ।

মদের অর্ডার দিয়ে কার্টন বসতেই মাদাম তার দিকে এগিয়ে এল, এক-জাহাজ বিস্ময় তার চোখে।

হুবহু চার্লস ডার্ণে'র মত দেখতে!—'আপনি কি ইংরেজ?'

মদের পাত্রে চুমুক দিয়ে রসনায় একটা তৃপ্তির শব্দ করে কার্টন সে কথায় সায় দিলেন।

মাদাম এসে বসল তার স্বামীর পাশে। বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনো মন থেকে।

দ্যফর্জও এই অদ্ভুত সাদৃশ্যে কম অভিভূত হয়নি। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে

বললে—'তোমার মনে ঐ মানুষটির কথা নিশিদিন আসা-যাওয়া করছে। ভয় কি, শেষ বারের মত কাল ত তাকে দেখতে পাবে।'

'ওদের বংশ যত দিন না নির্বংশ হচ্ছে তত দিন আমার স্বস্তি নেই—আত্মার তৃপ্তি নেই। বাস্তিলের সেই অন্ধকার ঘর থেকে যেদিন ডাক্তার ম্যানেটের হাতের লেখা সেই রক্তমাখা দলিল আমরা নিয়ে এসে পড়েছি—সেদিন থেকেই আমার মৃত্যুর খাতায় ওদের নাম লিখে রেখেছি। সেদিনও আমি এমনি করে বুক চাপড়ে মরেছিলাম। কিন্তু কেন তা শুধু জানে আমার স্বামী। আর কেউ নয়।'

ভৈরবীর মত মাদামের ভয়াল দৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিল সঙ্গিনী। আর অন্যমনস্কতার ভান করে শুনছিলেন কার্টন।

'সেদিনই ওঁকে আমি বলেছিলাম। সমুদ্র-তীরের জেলেপরিবারে যে মেয়েটি মানুষ হয়েছিল সে আর কেউ নয়, সে আমি, এই অভাগিনী মাদাম দ্যফর্জ। আমার বাবাকে ওরা তিলে তিলে হত্যা করেছিল। আমারই ভাইকে করেছিল খুন। ওদেব লাম্পট্যের আগুনে তিলে তিলে পুড়ে মরেছে আমার সতী সাধ্বী দিদি। চার্লস ডার্ণের বাবা জ্যাঠা আমাদের মত সহস্র পরিবারের সর্বনাশ করেছে। মৃত্যুই ওদের শাস্তি। ওদের রক্তে পথের ধূলো লাল না হলে আমার মনের আগুন নিববে না। কিছুতে না।'

নিঃশব্দে কার্টন দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন। প্রথম উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়েছে।

মন উধাও পাখা মেলে দিয়েছে। জীবনে কোন দিন এত প্রেরণা ছিল না কাজে, এত মধুময় বোধ হয়নি বেঁচে থাকা।

লরির ঘরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত গভীর হয়ে এলে লরি ফিরে এলেন। শেষ মুহূর্তের চেষ্টায় গেছেন ডাক্তার ম্যানেট। যদি কোন রকমে বিপ্লবীদের মনের পরিবর্তন ঘটে, যদি মুক্তি পায় তাঁর

প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জামাতা। ডার্ণে না বাঁচলে তাঁর লুসি মা বাঁচবে না। কি নিয়ে তবে বাঁচবেন বৃদ্ধ ?

তার নিজের পাসপোর্টটি লরির হাতে সমর্পণ করে কার্টন তাকে মিনতি করলেন যে প্রথম সুযোগেই তিনি যেন লুসি ও ডাক্তার ম্যানেটকে নিয়ে ফ্রান্স ত্যাগ করে চলে যাবার ব্যবস্থা করেন। টিকটিকি বারসাদের কাছে শুনেছেন, ডিফর্জরা জেনেছে যে লুসি তার স্বামীর সঙ্গে সংকেতে কথা কইত জেলের সামনের পথ থেকে। ওরা কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না। লুসি, তার মেয়ে, ডাক্তার ম্যানেট—সকলকে তারা খুন করবে। বিপ্লবের শত্রু জেনে কাউকে তারা মার্জনা করবে না।

'ভয় করবেন না মিঃ লরি। ঈশ্বরের করুণায় আপনি তাদের নিরাপদ বন্দরে পৌঁছে দিতে পারবেন।'

'বৃদ্ধ হয়েছি। তবু আমি চেষ্টার কার্পণ্য করব না মিঃ কার্টন। আপনি নিশ্চিন্ত হন।'

'তবে ব্যবস্থা সব পাকা করে রাখবেন মিঃ লরি। লুসিকে বলবেন যে তার স্বামীর ইচ্ছাতেই তাদের পলায়নের আয়োজন করা হয়েছে। শোকের প্রথম ধাক্কা সামলে উঠে বুদ্ধিমতী সে আপনার কথার যুক্তি বুঝবে। আর একটি কথা মিঃ লরি, যখন যে ভাবে আমি এসে পৌঁছই দয়া করে আপনার গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দেবেন। কোন প্রশ্ন করবেন না। বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে আপনিই সব কথার উত্তর দেবেন। কোন শঙ্কা রাখবেন না মনে। বাঁচা মরার জুয়ায় বাজী ধরেছি আমরা— দান আমাদের ফেলতেই হবে।'

বাইরে নির্জন প্রাঙ্গণে অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। চারি দিক নিঝুম নিঃশব্দ। শুধু উপরের একটি ঘরের বাতায়নে আলোর রেখা পড়েছে। সেখানে একটি মূর্ছিতা মেয়ের কোমল পাণ্ডুর মুখের স্মৃতিতে

মুহূর্তে সজল হয়ে এল কার্টনের চোখ। প্রাণের গভীর অন্তঃস্থল থেকে একটি বিদায়-বাণী উচ্চারণ করে ছায়ার মত সরে গেলেন কার্টন।

১২

পথের রক্তের দাগ শুকোবার আগেই আবার রক্তস্রোতে ভেসে যায় মেদিনী। দিনের পর দিন রক্ত-সমুদ্রে নব নব তরঙ্গোচ্ছাস ওঠে। রূপ-যৌবন ধন দৌলত আভিজাত্য কিছুতেই প্রাণের পরিত্রাণ নেই। গিলোটিনের খড়গের প্রাণ নেই, তাই তার মমতাও নেই।

মৃত্যুর প্রতীক্ষায় নির্জন কারাকক্ষে পাদচারণা করতে করতে হাজারো চিন্তায় ডার্ণের চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল। প্রিয়তমা স্ত্রী ও কন্যার বেদনা-নীল মুখ দুটির স্মৃতি তখনো ফুলের সুবাসের মত জড়িয়ে ছিল। নিদারুণ মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও তাদের কথা চিন্তা করে তার চিত্তে সুখ ছিল না।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রহর অতীত হচ্ছে। এখনি বেলা একটার ঘড়ি বাজল। তিনটের সময় তার ডাক পড়বে গিলোটিনের কাছে। জীবন-মৃত্যুর মোহনায় দাঁড়িয়ে চার্লস ডার্ণে অস্থির চিত্তে সেই অনিবার্যতার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

চিত্ত-সমুদ্র মন্থনে উঠে আসছে কত স্মৃতি। তার বাল্য কৈশোর যৌবনের কত দুঃখ-সুখের চিত্র। চলচ্ছবির মত মনের ভূমিকায় দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটছে। ডাক্তার ম্যানেটের সঙ্গে পরিচয়। লুসির সান্নিধ্য। তাকে ঘিরে তার নতুন জীবনের সূচনা! নিভৃত সুখী সংসারে তার প্রতিষ্ঠা। লরির সজাগ অভিভাবকত্ব। শুধু সিডনী কার্টনের কথা তার মনে পড়ল না।

তারই দরজায় চাবী ঘোরানোর শব্দে চকিত হয়ে ডার্ণে উৎকর্ণ হয়ে রইল। তবে কি তার সময় হয়ে এল!

'আমি ভেতরে যাব না। আপনি যান।'

বিদ্যুৎ ঝলকের মত দ্বার খুলেই আবার রুদ্ধ হয়ে গেল। আর সেই জনশূন্য আঁধা অন্ধকার কক্ষে যে মানুষটি তার সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে ডার্ণের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। সিডনী কার্টন ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বন্দীকে সংকেত করলেন।

'আপনি এ অবস্থায় এখানে? এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর?' যেন প্রেত মূর্তি দেখছে এই ভাবে ডার্ণে কম্পিত পায়ে সরে দাঁড়াতেই, কার্টন তার দুটি হাত নিজের সবল মুঠিতে ধরে নিলেন।

'অপচয় করার মত সময় আমার হাতে নেই। শুনুন, আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। যা বলি শুনুন, কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনব না।'

ডার্ণের বিস্ফারিত দৃষ্টিপাত অবজ্ঞা ক'রে কার্টন তাকে আদেশের সুরে বললেন—'পায়ের জুতো খুলে আমার এই জুতোটি পরে ফেলুন। দেরী করবেন না। এই নিন আমার জুতো।'

'কেন এ পাগলামি করছেন মিঃ কার্টন! এ ভাবে পালাতে আমি পারব না। আমি মরবই—আপনারও সমূহ বিপদ ঘটবে। আমাকে বাঁচাতে কেন আপনি মরতে এসেছেন?'

'মরতে আমি তোমায় দেব না ভাই! মরব আমি নিজে। এসো, দেরী করো না—জামা পোষাক বদলে নাও আমার সঙ্গে। আমি তোমার চুলটা ঠিক করে দি।'

ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত ডার্ণেকে শিশুর মত আপন হাতে সাজিয়ে দিলেন কার্টন। মৃত্যুপথযাত্রী বন্দীর কোন অসহায় প্রতিরোধই কার্যকরী হল না তাঁর কাছে।

সে কাজ সারা হলে বললেন—'ভয় কি ভাই! এই নাও কাগজ-কলম, যা বলছি লিখে ফেলত এই কাগজে। নাও, দেরী করো না। সময় বড় কম আমাদের হাতে।'

'কাকে কি লিখব?'

'কাউকে উদ্দেশ করে নয়। লিখে ফেল ভাই যা বলি।'

মাথা নীচু করে ডার্নে লিখতে সুরু করল কার্টনের কথা মত। কিন্তু তখুনি সে মাথা তুললে—'কিসের গন্ধ আসছে নাকে—আমার শরীর কেমন করছে যেন।'

'কিছু না'—বলে কার্টন তার মুখের আরো কাছে হাত নিয়ে আসতেই বন্দী এক ঝলকে শরীর ঝাঁকিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তার আগেই কার্টনের বজ্রবন্ধনে বাঁধা পড়ল তার শরীর। এক হাতে ডার্ণের নাক চেপে ধরে কার্টন তাকে অবলীলাক্রমে সংজ্ঞাহীন করে ধরাশায়ী করে দিলেন।

মহৎ আত্মবলিদানের দ্বিতীয় পর্যায়ে সফল আনন্দে কার্টনের মুখে অপূর্ব মাধুরী ফুটে উঠল।

তড়িৎগতিতে বন্দীর সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে নিলেন কার্টন। তার পর শান্ত কণ্ঠে ডাকলেন—'ভেতরে এস।'

বরসাদ আসতেই কার্টন বললেন—'একে নিয়ে বাইরে যাবার আর কোন অসুবিধা হবে?'

'যদি আপনি কথা রাখেন—'

'ভয় নেই। গিলোটিন অবধি আমি সত্যনিষ্ঠ থাকব। কিন্তু আর দেরী নয়। সিডনী কার্টনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।'

'কার্টন? কি বলছেন আপনি?'

'ঐ ত কার্টন। যখন নিয়ে এসেছিলে আমায় জেলের ভিতরে আমি ছিলাম দুর্বল, এখন আমার শরীর আরো ভেঙ্গে পড়েছে। মৃত্যুযাত্রী

প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্নায়ু একেবারে তচনচ হয়ে গেছে। এমন ত হামেশাই হচ্ছে তোমাদের জেলে। যাও, সাবধানে ওকে বাইরে নিয়ে যাও। ওর জীবনের সঙ্গে তোমার প্রাণও সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা সে কথা ভুলো না। আর লরির সঙ্গে দেখা করে যা বলে দিয়েছি সবিস্তারে সব জানাবে। বাকি তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। যাও যাও দেরী করো না।'

দু'জন প্রহরীর সাহায্যে ডার্ণেকে নিয়ে বিদায় হল বরসাদ। রুদ্ধ দ্বারেব পিছন থেকে কান পেতে শুনলেন বন্দী কার্টন পদচারণার ক্ষীণায়মাণ শব্দ। কোথাও কোন অস্বস্তিকর আওয়াজ তার কানে এল না দেখে শান্ত চিত্তে মহা পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন কার্টন।

১৩

বিচারকদের রায়ে মৃত্যু প্রতীক্ষমান বন্দীরা যখন কারান্তরালে মুহূর্ত গুনছিল, ঠিক সেই সময় মাদাম ডিফর্জ তার দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে গোপনে আলোচনা করছিল। অন্যদিনের মত আজ আর মদের দোকানে বসেনি তাদের মন্ত্রণা সভা। জেল প্রাচীরের কাছে ছুতোরের দোকানের অন্ধকার নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল তিনজনের।

মাদাম বলছিল—'আস্তে কথা কও বন্ধুরা। স্বামী আমার অবিসম্বাদী বিপ্লবী—সাহসের তার তুলনা নেই। বিপ্লবের বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনে কিছুমাত্র কুয়াশা নেই। কিন্তু আমার স্বামীর কি যেন এক মহৎ দুর্বলতা। ডাক্তার ম্যানেটের কোন রকম ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারেন না প্রাণভরে।'

'ভাল নয়—ভাল নয়'—হিংস্র ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে বলল জ্যাকুজ। 'বিপ্লবী সৈনিকের এসব দুর্বলতা মাপ করা চলে না।'

'আমি বলছি শোন'—মাদাম নির্মম গলায় বললে—'আমি

ডাক্তারের ভালমন্দ গ্রাহ্য করি না। তার মাথা যায় মাথা থাকে, কোন হিসেব রাখবার দরকার বোধ করি না আমি। কিন্তু ঐ জমিদার অভিজাত—ওদের একটি প্রাণীকেও বাঁচতে দেব না আমি। নির্বংশ করব ওদের—'

মাদামের কথায় হিংসার নীল আভা জ্বলে উঠল ওদের দু'জনের চোখে। দেখে মাদাম বললে—'স্বামীকে এবিষয়ে পূরো বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। সেই জন্যে আমাদের কর্তব্য কি সে-বিষয়ে তার সঙ্গে সুস্পষ্ট আলোচনা করতে চাইনা আমি। দেরী হয়ে গেছে আমাদের। আর বেশী দেরী করে ফেললে ওরা আমাদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যাবে।'

তারপর সঙ্গীদের আরো কাছে ডেকে নিয়ে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিলে তার প্ল্যান।

'স্বামীর মৃত্যু সংবাদের প্রতীক্ষায় থাকবে আজ অভাগিনী। কেঁদে কেটে অনর্থ বাধাবে বাড়ীতে। স্বামীশোকে মুহ্যমানার মন স্বভাবতঃই রিপাবলিকের বিরুদ্ধে তপ্ত হয়ে থাকবে। সেই সময় যাবো আমি। তোমরা সবাই যাও। গিলোটিনের সময় সব উপস্থিত থাকবে।'

সঙ্গীদের পিছনে রেখে চলে এল মাদাম।

ফ্রান্সে তখন যে কাল চলছে, সেই কালের বহ্নিতে অনেক মেয়ের মনেই হিংসা বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্যারিসের পথে যে মেয়েটি বিজয়িনীর গর্বিত ভঙ্গিমায় এগিয়ে যাচ্ছিল, তার চেয়ে ভয়ঙ্করী বুঝি আর কেউ ছিল না সারা ফ্রান্সে। শিশুকাল থেকেই একটা বিশেষ শ্রেণীর উপর ঘৃণার বীজ উপ্ত ছিল তার চিত্তভূমিতে। বয়স কালে তা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। নারী চিত্তের মমতাকে বাঘিনীর হিংস্রতায় বিবর্তিত করছে দিনে দিনে। আজ আর তার মনে দয়া মায়ার কোন লেশ নেই।

পিতৃপুরুষের পাপে যে একজন নিরাপরাধ মানুষ মরতে যাচ্ছে—তার জন্যে কোন বিকার নেই মাদামের মনের মরুতে। ও ত কোন একলা মানুষ নয়, একটা কলংকিত বংশের ধারা প্রবাহ—ওর মৃত্যুতে নিশ্চিহ্ন হবে। তাইতে ওর চিত্তের দাহ নির্বাপিত হবে। কোন্ স্ত্রীলোক বিধবা হবে, কোন্ শিশু হবে অনাথ—সে সব তার ভাবনা ধারণার অতীত বস্তু।

এমনি ধারা পাষাণ প্রাণ নিয়ে মাদাম পথের অন্ধকার পার হচ্ছিল। ভয় নেই প্রাণে। সর্বাঙ্গের বেশভূষায় একটা উদাসীন বেপরোয়া ভাব। বুকের কাছে একটা গুলিভরা পিস্তল লুকোনো—কোমরের বেল্টে লাগান ধারাল ছোরা।

আর সেই মুহূর্তে প্যারিসের মৃত ব্যূহ ভেদ করে যে গাড়ীটি সীমান্ত পার হয়ে চলে গেল তার মধ্যে লরির সযত্ন রচনায় একটি পরিবার নিরাপদে বাঁচবার জগতে ফিরে চলেছিল। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। গাড়ীর ভার যথা সম্ভব হাল্কা রাখার ব্যবস্থাই করেছিলেন লরি। তার জন্যে মিস প্রস ও জেরিকে গাড়ীতে তুলে নেননি। তার চেয়েও বড়ো কথা, লোক যত কম থাকে গাড়ীতে, জবাবদিহিতে সময় নষ্ট হবার সুযোগ হবে ততই কম। এই পলায়নের অধ্যায়ে একটি দুটি দুর্লভ মুহূর্তের দাম যে কত মূল্যবান—তা সংসারে অভিজ্ঞ মানুষ লরির চেয়ে কেউ বেশী ভাল বুঝতেন না। এদের নিয়ে নিরাপদে পৌছে দিতে না পারলে তার কথার খেলাপ হবে সে-কথাও মনে ছিল তার।

এদের গাড়ী চলে যাবার কিছু পরেই জেরি ও প্রস যাত্রা করবে এমনি উপদেশ দিয়ে গেছেন লরি। দুজন যাত্রীর হাল্কা গাড়ী অল্প পথ অতিক্রম করেই ওদের গাড়ীর নাগাল পাবে—তখন আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

'দেখ জেরি'—মিস প্রস সঙ্গীকে বললে—'এই বাড়ী থেকে গাড়ী

করে আমাদেরও যেতে দেখলে লোকে সন্দেহ করতে পারে। একটু আগেই ওরা এখান থেকে গেছেন।’

‘আমিও তাই ভাবছিলাম।’

‘কোন বুদ্ধি আসছে না আমার মাথায়। ওদের ভালমন্দের ভাবনায় আমার মন বড়ো উতলা হয়ে রয়েছে। কি করা উচিত তুমি বল না জেরি।’

সারা বাড়ীটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। রাত নিশুতি। অন্ধকার সহরে আতঙ্কের নিঃশব্দ সঞ্চার। গুপ্ত ঘাতকের পদধ্বনি। মন আশা আকাঙ্ক্ষায় কম্পমান। দু'জনের অনেক পরিকল্পনা হল। অবশেষে স্থির হল যে জেরি আগে বাসা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গাড়ী ভাড়া করে এগিয়ে যাবে। প্রস যাবে পিছন পিছন। পথ থেকে জেরি তাকে গাড়ীতে তুলে নেবে।

‘এই নিরালা বাড়ীতে একলা তোমায় ফেলে রেখে যেতে আমার মন সরছে না মিস প্রস। কি জানি কি হয়?’

‘নিয়তির যা ইচ্ছা তাই হবে।’ মিস প্রস সাগ্রহে জেরির দুটি হাত ধরলে। বললে—‘আমার জন্যে তুমি ভয় রেখো না মনে। রাত তিনটে নাগাদ আমি গীর্জার কাছে থাকব। আমায় তুমি তুলে নিও। নিজেদের জন্যে ভাবিনা আমি। তাঁরা নিরাপদে বেচে ফিরে যেতে পারলেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেবো’।

জেরিকে বিদায় দিয়ে সেই মস্ত বাড়ীতে একলা রয়ে গেল প্রস। ঘড়িতে দুটো বেজে কুড়ি। সাজ পোষাকটা ঠিক করে নিতে হবে যাতে লোকের চোখে না পড়তে হয় এই নিশীথ রাত্রে। হাতে সময় নেই। তাড়াতাড়ি করতে লাগল মিস প্রস।

কেঁদে কেঁদে দুটি চোখ ফুলে উঠেছিল। এক গামলা ঠাণ্ডা জল নিয়ে প্রস সারা মুখে চোখে তারই ঝাপটা দিতে লাগল। আতঙ্কগ্রস্ত

মনে কেবলি মনে হচ্ছে কারা যেন একোন ওকোন থেকে আড়ি পেতে সব দেখছে। ভয়ে বুকের ভেতর দুম দুম করে হাতুড়ি পিটছে। চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে ফিরে দেখতে দেখতেই হঠাৎ এক ঝলকে প্রসের চোখে পড়ল ঘরের ভিতর একটি মনুষ্য মূর্তি দাঁড়িয়ে।

হাত থেকে খসে জলের গামলাটা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। জলের ধারা ছিটকে গিয়ে মাদাম দ্যফর্জের পা অবধি ভিজিয়ে দিলে। যে পায়ে অনেক মানুষের গায়ের রক্ত মাড়িয়ে এসেছে মাদাম, নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে অবশেষে সেই পা জলে এসে পড়ল।

হিমচোখে চেয়ে শুধু একটি প্রশ্ন করলে মাদাম—'সে কোথায়? চার্লস ডার্নের বৌ?'

সারা বাড়ীতে দরজা সব হাট করে খোলা। সেই খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাবে কিনা, চকিতে একবার মনে ভাবলে প্রস। তার বদলে দ্রুত হাতে ঘরের চারটে দরজাই বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর লুসির ঘরের দরজার মুখে আড়াল করে দাঁড়াল।

নিঃশব্দ সতর্কতায় মাদাম এই মেয়েটির আচরণ লক্ষ্য করলে। দেখলে এই মেয়েটিকে। বয়স যার শরীর মনকে পোষ মানাতে পারেনি। সৌন্দর্য না থাক—সর্বাঙ্গে যার স্বচ্ছন্দ দৃঢ়তার কোন অভাব নেই।

সেই ভাবে দাঁড়িয়ে দুটি ভিন্ন ভাবনার স্ত্রীলোক পরস্পরকে অনু অনু করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

'তুমিই সেই।' উত্তেজনায় চাপা নিঃশ্বাস ফেললে প্রস—'আমিও ইংরেজের মেয়ে। সে কথাটা ভুলবে না আশা করি।'

এই অর্গলবদ্ধ ঘরের মধ্যে দুজনেই যে সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—প্রসের মত মাদামেরও তা বুঝতে বাকি ছিল না। প্রস যে এ সংসারের সবচেয়ে বড় বন্ধু মাদাম তা ভাল করেই জানত। আর ঐ

জিঘাংসা পরায়ণা যে তার প্রাণের প্রিয় লুসির সবচেয়ে বড়ো শত্রু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না প্রসের।

'গিলোটিনের সামনে আমার সিট রিজার্ভ করা আছে। সেই পথে যেতে যেতে ভাবলাম একবার তোমাদের জমিদার গিন্নীকে দেখেই যাই। তার সঙ্গেই আমার দরকার।'

'তোমার অসদুদ্দেশ্য বুঝতে আমার বাকি নেই। তবে আমায় ডিঙিয়ে তোমার সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।' শাবককে আড়াল করে বাঘিনী যেমন করে গর্জায় তেমন করে বললে মিস প্রস।

এদিকে ফরাসী। ওদিকে ইংরেজ। দুজনের ভাষাই দুজনের কাছে দুর্বোধ্য। সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দু'জনে। ভঙ্গীতে কথার রহস্য ভেদ করতে পারা যায় কিনা ভাবছে।

'তাকে খবর দাও যে আমি এসেছি। আমার কাছে আত্মগোপন করে তার লাভ নেই—বিপ্লবী জানতে পারবেই সব। তখন—। পথ ছাড়, আমায় ওঘরে যেতে দাও।'

সেই নিশীথ রাত্রে নির্জন বাড়ীর একটি বদ্ধদ্বার ঘরে দুটি স্ত্রীলোক পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মিস প্রসের অবিচল ভঙ্গী দেখে অবশেষে এক পা এগিয়ে এল মাদাম।

'আমি ইংরেজের মেয়ে। আমি সামনে থাকতে তোমায় আমি কিছু করতে দেব না। তোমার ঐ চুলের মুঠি ধ'রে আমি—'

প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণের সঙ্গে আগুনের ফুলকি ঠিকরে পড়তে লাগল মিস প্রসের চোখ দিয়ে। রুদ্ধ আক্রোশে মাথা ঝাঁকিয়ে কথার জবাব দিলে। জীবনে যে মেয়ে কখনো কারও গায়ে হাত দেয়নি সে যেন হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠল।

স্নেহপরায়ণ স্ত্রীলোকের মন। উত্তেজনায় দুটো চোখই তার ভরে উঠল জলে। তাকে দুর্বলতা বলে ভুল করলে মাদাম। অবহেলার হাসি

হেসে বললে—'এই মুরোদ তোমার। ঠিক আছে, আমিই তাদের সাড়া নিচ্ছি।' বলে উচ্চ কণ্ঠে নাম ধরে ডাকতে লাগল মাদাম।

কেউ কোথাও সাড়া দিল না। মিস প্রসের মুখের দিকে চেয়ে বিদ্যুৎ ঝলকের মত কি যেন একটা চিন্তা মাদামের মনে সরে গেল। তবে কি?

তিনটে দরজাই নিজের হাতে খুলে ফেললে মাদাম। অগোছালো সংসারের চেহারাটা চোখে পড়ল। তবে তারা পালিয়েছে। নীচে যাবার দরজার দিকে পা বাড়াতেই মিস প্রস তার মুখোমুখী দাঁড়াল।

'এই নির্জন বাড়ীর সব উঁচু তলায় আমরা দু'জন একলা। কেউ শুনতে পাবে না আমাদেব কথা। নীচে তোমায় আমি যেতে দেবো না। এখন এক একটা মিনিট আমাদের কাছে কত মূল্যবান তা তুমি কি বুঝবে?'

'ধরতেই হবে তাদের'—বলে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই প্রস সবলে মাদামের কোমর বাহু-বেষ্টনে বেঁধে ফেললে।'

বেপরোয়া ঘুঁসি মারতে লাগল মাদাম। হিংসার চরম আক্রোশে ছিন্ন ভিন্ন করতে চাইলে এই প্রতিরোধ। কিন্তু মানুষের ভালবাসার প্রতিরোধ, সে যে হত্যার চেয়ে, হিংসার চেয়ে সহস্র গুণ দৃঢ়—তা কি জানত মাদাম!

বিপর্যস্ত হয়ে অবশেষে কোমরের ছোড়ার দিকে হাত বাড়ালে মাদাম। তার ভঙ্গী দেখে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিম্ন কণ্ঠে বললে প্রস—'আমার হাত দিয়ে তোমার ঐ খুনে অস্ত্রটা ঢেকে রেখেছি। ভগবানকে ধন্যবাদ —তোমার চেয়ে আমার শরীর তিনি ঢের বেশী মজবুত করে গড়েছেন। একজন মরবে তবে আর একজন নিষ্কৃতি পাবে আমাদের। তার আগে তোমার আশা নেই।'

বুকের কাছে তুলে চকিতে জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলে মাদাম।

দখে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত মাদামের বুকে বজ্র মুষ্টি হানলে প্রস। একটা ভয়নক শব্দ হল। আগুনের একটা লেলিহান জিহ্বা যেন প্রাণ সেটুকু পরম আগ্রহে শুষে নিলে। ধোঁযার ধ্বাপসা কেটে যেতেই রথর শরীরে চেয়ে দেখলে প্রস কি ঘটে গেছে।

মাটিতে মুখ থুবরে পড়ে থাকা মাদামের মৃত দেহ দেখে আতঙ্কে পিছু টে এল প্রস। তার পর দিশাহারা হয়ে নীচে ছুটে গেল সিঁড়ি ভেঙে। কাউকে ডাকবার জন্তে চেঁচাতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিলে সে অজান্তে। ছঃ ছিঃ কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল সে। আবার তখুনি ফিরে এল।

থরথর কম্পিত দ্রুত হাতে বেশ প্রসাধনটুকু শেষ করে নিলে মিস প্রস। মাদামের বনেট আর পোষাক আর চুলের বিন্যাস কটি পরে নতেহ যতটুকু সময় লাগল ততটুকু সময় রইল সেই ঘরে। তার পর রজায় চাবি দিয়ে সিঁড়িতে এসে বসল।

সেই খানে অনেকক্ষণ বসে বসে কাঁদলে মিস প্রস। তার পর পথে ামল জেরির সন্ধানে।

১৪

তিনটের ঘড়িতে ঘা পড়ার আগেই মৃত্যুর মিছিলে যখন ডাক পড়ল ালস ডার্ণের, তখন লরির তত্ত্বাবধানে অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন ডার্ণে, সকন্যা লুসি মার ডাক্তার ম্যানেট প্যারিসের সীমান্ত পেরিয়ে গেছে।

সিডনী কার্টনের পাসপোর্টে যাচ্ছে ডার্ণে মৃত্যুর মঙ্গল পেরিয়ে আর এক নব জীবনের দেশে উত্তীর্ণ হয়ে।

বিপ্লবের প্রহরীরা নিয়ে গেল কার্টনকে গিলোটিনের খড়্গে বলি দিতে।

সে রাত্রে সারা প্যারিসের লোক কানাকানি করলে যে কোন বন্দীর খে অমন শান্ত জ্যোতি আজ অবধি কেউ দেখেনি। মৃত্যু-ভয়ের লেশ মাত্র নেই নয়নে বদনে। ভিতরের একটা অব্যক্ত আনন্দ প্রশান্তি যন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সেই প্রসন্নতায়।

অনুচ্চারিত তার বিদায়-বাণী শুনেছিল নিরবধি কাল আর বিপুল পৃথিবী।

ভালোয়-মন্দোয় মেশানো তোমাদের সবাইকে আজ দেখতে পাচ্ছি। ঐ তুমি বরসাদ, ত্যফর্জ। ঐ ত সারি দিয়ে বসে আছে বিচারক আর জুরীরা। মাটির কাছাকাছি থেকে উঠে এসেছ নতুন শাসকের দল। তোমাদের হাতে অত্যাচারের নূতন হাতিয়ার। কিন্তু এ-দিনও থাকবে না—আর এক অবলুপ্তির অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তোমরা।

তার পর সেই অতীতের কবর থেকে জেগে উঠবে এক নূতন পৃথিবীতে নূতন মানব-সমাজ। দীর্ঘকালের ঝড়-ঝাপটার সংঘাত পেরিয়ে অনেক জয়পরাজয়ের গৌরব-গ্লানি উত্তীর্ণ হয়ে তারা এক নূতন কালকে সৃষ্টি করবে। এমনি করে কাল থেকে কালান্তরে ভবিষ্যৎ প্রায়শ্চিত্ত করবে অতীতের—গত যুগের গ্লানি নিশ্চিহ্ন করে মুছে নেবে আগামী যুগ।

সুখী হোক তারা, যাদের জন্যে আমার এই তুচ্ছ আত্মবলিদান। সুখী হোক লুসি। তার কোলে যে শিশু তার মধ্যে আমার নাম বেঁচে থাকবে। মিঃ লরি, ডাক্তার ম্যানেট তাদের অকৃপণ আশীর্বাদ করুন ভগবান!

ওদের প্রাণের মন্দিরে একটি আসন রইল আমার। বৎসরে বৎসরে এই দিনটিকে নীরব অশ্রুজলে ভিজিয়ে দেবে যে নারী, তাকে আমি ভুলতে পারিনি। সেও আমায় ভুলতে পারবে না। আয়ুর দীর্ঘ পথশেষে এক দিন স্বামী-স্ত্রী ওরাও দু'জনে মাটির নীচে চির-বিশ্রাম পাবে। তবু জানি যত দিন বাঁচবে—ওদের চিত্ত-প্রদীপে আমার স্মৃতির আরতি চলবে।

আজ যা করছি, জীবনে এত-বড় কিছু করিনি কখনো। বিশ্রামে যে এত অমৃত তা আগে কখনো জানিনি।

তিনি বলেছেন—আমিই জীবন, আমিই পুনরুজ্জীবন। আমাতে যে চিত্ত স্থাপনা করেছে, মৃত্যু পার হয়ে সে জেগে উঠবে জ্যোতির্লোকে। আমাতে যার আশ্রয়, যার আস্থা—মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

শেষ